মেয়েরা সংস্কারে আটকে থাকে ভয়ে ? নাকি ভালবাসায় ?

এখন ডুয়ার্স

বিশেষ নববর্ষ সংখ্যা এপ্রিল ২০১৮। ২০ টাকা

ডুয়ার্সে পরিবহণ আজও কাঁদায়

ঘুরে দাঁড়িয়েছে
উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগম

তুষার প্রধানের কলম
হাংরি রিপোর্টার

পর্যটনে ঘুমন্ত
শালকুমার

পাঠক কোথায় ?

শতবর্ষে নিজভূমে উপেক্ষিত
অমিয়ভূষণ মজুমদার

অরণ্য মিত্রের বড় গল্প
রতি বিরতির মাঝখানে

স্বাগতম

জলপাইগুড়ি পুরবাসীর জন্য উপহার

এন ইউ এইচ এম— ইউ পি এইচ ১ (লাবণ্য মাতৃসদন) এবং ২ (৩ নং ঘুমটি) থেকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা ও ওষুধ প্রদান করা হয়।

স্বাস্থ্যসাথী— এই প্রকল্পে ৪০০০ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর পরিবারকে স্মার্ট কার্ড প্রদান করা হয়েছে। আরও ৩০০০ কার্ড প্রদান করা হবে। প্রতিটি পরিবারকে ১,৫০,০০০ টাকা স্বাস্থ্যবিমা প্রদান করা হবে।

সমব্যথী— ২৩৫টি পরিবারকে এককালীন ২০০০ টাকা করে পারলৌকিক ক্রিয়ার কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রদান করা হয়েছে।

সমাজসাথী— ৭০০০টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যাকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।

পথবাতি— শহরের সৌন্দার্য্যায়ন ও আলোকিত করার জন্য ২৫টি ওয়ার্ডে এলইডি লাইট প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

রাস্তা ও ড্রেন— ২৫টি ওয়ার্ডের সমস্ত রাস্তা ম্যাস্টিক ও ড্রেনকে কভার ড্রেনে পরিণত করার কাজ চলছে।

জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রীমতী পাপিয়া পাল
উপ-পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রী মোহন বোস
পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

এখন ডুয়ার্স

পঞ্চম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, এপ্রিল ২০১৮

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স ৫

বইপত্র সাহিত্য

পাঠক কোথায়? ৮

জন্ম শতবর্ষে অবহেলিত অমিয়ভূষণ মজুমদার ১১

সোনালী ডুয়ার্স ১২

খোলা মনের কলম

সরস্বতী সঙ্গে থাকুক লক্ষ্মী থাকুক স্বপনে ১০

হাংরি রিপোর্টার

পুলিশ চাইলে পাহাড়ের বন্‌ধ একবেলাও স্থায়ী হয় না! ১৩

প্রতিবেশি পিএনপিসি

কোন্ অজানা আশংকায় ত্রাসে থম মেরে আছে পাহাড়? ১৬

কোচবিহার চর্চা— নতুন তোর্সা বাঁধ সরণি ১৭

ইকো পর্যটনে যথেষ্ট সম্ভাবনাময় দুই দিনাজপুর ১৮

মুকুলে ছেয়ে যাওয়া মালদহ ২০

উত্তরপক্ষ ২১

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ডুয়ার্সের পরিবহণ আজও কাঁদায় ২৪

আরো বহু পথ চলতে হবে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণকে ২৬

বেসরকারি পরিবহণে কড়া সরকারি লাগাম অত্যন্ত জরুরি ৩২

ডুয়ার্সের চা-বাগান চিনুন ৬৯

পর্যটন

নদী-জঙ্গল-চা বাগানের কোলে ঘুমন্ত শালকুমার ৩৬

ভরা শ্রাবণের সেই শালকুমার কি ভোলা যায়? ৩৯

শ্রীমতি ডুয়ার্স

উওমানিয়া ৪২

মেয়েরা সংস্কারে আটকে থাকে ভয়ে? নাকি ভালবাসায়? ৪৩

ডুয়ার্সের ডিশ ৪৩

সেই রেললাইন ধরেই হারিয়ে যেতে চেয়েছিলাম ৬৩

বড় গল্প

রতি বিরতির মাঝখানে ৪৬

ধারাবাহিক ডুয়ার্স

ডুয়ার্স থেকে শুরু ৬৬

শালবনে রক্তের দাগ ৫৯

ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস ৭২

নিয়মিত বিভাগ

খুচরো ডুয়ার্স ৬

ডুয়ার্সের হেথা হোথা— অপর্যটকে মন্ডলঘাট ৩৪

প্রচ্ছদ ছবি: শৌভনিক চক্রবর্তী

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস

মুক্তা ভবনের দোতলায়। মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি

ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে। এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

পাঁচে পা দিলাম আমরা

২০১৪ সালে পত্রিকার শুরুতে আমরা অনেক শুভেচ্ছা পেয়েছিলাম, খানিক আশান্বিত ছিলাম, শিল্প না থাকলেও বা বিজ্ঞাপনের বাজার না থাকলেও উত্তরের পৌরসভা বা পঞ্চায়েত সমিতিগুলির কাছ থেকে খানিক আর্থিক সহায়তা পাব। কারণ উত্তরে এই ধরনের প্রচেষ্টা খুব একটা নেই। শুরুতে হয়েছিলও তাই। অনেকেই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, যা কোনওদিনই ভুলব না। কিন্তু গত চার বছরের শেষে দেখা গেল নানা পুরসভা ও পঞ্চায়েত সমিতির কাছে ‘অনুমোদিত’ দুই লক্ষেরও বেশি টাকা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করবার পরেও পাওয়া গেল না। এই অঙ্ক বলাই বাহুল্য আমাদের মতো ছোট উদ্যোগের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু এই চার বছরে তাঁদের দরজায় দরজায় ঘুরে ঘুরে আমরা ক্লান্ত।

‘এখন ডুয়ার্স’ একটি সংখ্যা প্রকাশ করতে কত টাকা খরচ হয় আপনারা জানেন? পাঠকের অবগতির জন্য জানাই, সব খরচ খরচা ধরে সেটা ছাপতে খরচ হয় আনুমানিক চব্বিশ টাকা প্রতি কপি। পত্রিকার দাম কত? বারো টাকা! ডেলিভারি ডিস্ট্রিবিউশন হকারের কমিশন বাদ দিলে ঘরে কত আসে জানেন? ছয় টাকা পঁচাত্তর পয়সা। ২৪ টাকা খরচ আর আয় পৌনে সাত টাকা! মাঝখানের সওয়া সতের টাকার ঘাটতি কে মেটাবে? অতএব বিজ্ঞাপন ছাড়া গতি আছে?

কারণ প্রশ্ন একটাই, আপনারা ২৪ খরচ করে কাগজ কিনবেন কি?

অথচ বাংলাদেশের মতো ছোট দেশেও কাগজের দাম এই বাংলার প্রায় দ্বিগুণ। বিলেত-আমেরিকার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।

এবারের ‘এখন ডুয়ার্স’ আকারে কলেবরে দ্বিগুণ করা হল, বিজ্ঞাপন নেই বলে দাম করা হল কুড়ি টাকা। এখন আমরা সিগারেট ফুঁকতে বা কোল্ড ড্রিংক খেতে যে খরচা করি, মাসে এক দু’বার ভুল করে সেই টাকায় পত্রিকা কিনে ফেললে খুব অসুবিধা হবে কি?

যদি অসুবিধে না হয় তাহলে আমাদের আর বিজ্ঞাপনের পিছনে ছুটতে হয় না!

সম্পাদনা ও প্রকাশনা প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদনা শ্বেতা সরখেল

অলংকরণ শান্তনু সরকার

সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া

ইমেল ekhonduars@yahoo.com

মুদ্রণ অ্যালবাট্রস

ডুয়ার্সের ইকো রিসর্টে এই প্রথম অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস

DHUPJHORA SOUTH PARK

Murti, Gorumara NP
Jalpaiguri, West Bengal

Accommodation: Super Delux Room (DBR) 4 nos, Delux Ethnic Rooms (DBR) 4 nos, Standard Family Rooms (4-6 BR) 5 nos.

Facilities: Tea Maker, Cold/Hot running water, attached toilet in every room;
Common Dine-in place for breakfast-lunch- evening snacks-dinner, Conference Hall;
Cycling, Angling, Adventure sports like Burma Bridge, Cylinder Walk, Bosun Chair, Commando Walk and Zip Line.

Marketing & Booking Contact:
Kolkata 9903832123, 9830410808
Siliguri 9434442866, 9002772928

মোহিনী মূর্তির পাড়ে আয়েশের সঙ্গে মেশে রোমাঞ্চ

বিধি আসলে বাম ?

যে সব কথা মনে প্রাণে বহুদিন ধরে সত্য হিসেবে বিশ্বাস করে আসছিলাম, আজকাল সেসব রোজই একে একে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হচ্ছে। যেমন অ্যাদ্দিন জানতাম মাটনের চাইতে চিকেন স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল, কিন্তু ইদানীং শরীর সচেতন ডাক্তাররা নাকি বলছেন, 'খবোদ্দার' চিকেন খাবেন না, কারণ মুরগির গু-তে নাকি বাস করে ভয়ানক এক পোকা, যা দোকানে ঝুড়িতে আবদ্ধ মুরগিদের গায়ে লেপ্টে যায়, তারপর ছুরিতে বা হাতে লেগেটেগে তা ছড়িয়ে পড়ে মাংসে বাসনপত্রে, হাজার জলে ধুলেও বা সেদ্ধ-ভাজা করলেও যায় না বা মরে না। এসব পোকা পেটে গেলে একসঙ্গে একশ কঠিন রোগের কারণ হতে পারে। মাটন সেদিক থেকে অনেকটাই নিরাপদ। বোঝো কান্ড তবে!

বামপন্থীদের সঙ্গে ডানপন্থীদের লড়াই অতি স্বাভাবিক একটি পুরাতন সত্য। কিন্তু এতদিনে নাকি জানা গিয়েছে, বামপন্থা বা ডানপন্থা বলে বইপত্রে কিছু ধারণা বা ভাবনা থাকতে পারে, বাস্তবে সেসবের অস্তিত্ব নিয়ে বৈজ্ঞানিক কোনও প্রমাণ মেলেনি। এযাবৎ যেসমস্ত উদ্দীপনা লাফালাফি বিপ্লব বলিদান ইত্যাদি হয়েছে তা সবটাই নাকি মাঠে মারা গিয়েছে একদিন যখন তার অসারশূন্যতা প্রমাণিত হয়েছে। কারণ মানুষ নাকি আদপেই মধ্যপন্থী জীব, ইতিহাস সাক্ষী যখনই তার মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজনে সমস্যা বা ত্রুটি থাকে না তখনই তার মধ্যপ্রদেশ স্ফীত হতে শুরু করে, যা তার শরীর ও মস্তিষ্কের অকারণ আস্ফালনকে কাবু করে দেয়। কেবল ইতিহাসই নয়, বিজ্ঞানও বলে মানুষ তখন সমতলীয় মধ্যপন্থার আশ্রয় নেয়, সেটাই যুগে যুগে উৎকৃষ্ট পথ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

‘মিছিলে স্ফীত মধ্যকায়দের আধিক্য কিন্তু জানান দিচ্ছিল সেই মধ্যপন্থার অস্তিত্বকেই। এরা বছর পাঁচ-ছয় আগে ভোট দিয়েছিল সাদা-নীল হাওয়াই চটিতে, তারও পাঁচ-দশ বছর আগে সাদা চুল-ধুতি-পাঞ্জাবিতে, পাঁচ বছর বাদে জানি এরাই হয়ত নিশ্চিত আস্থাজ্ঞাপন করবে গেরুয়া ল্যাঙটে।’

সেদিন বিকেলে শহরের বড় রাস্তায় চোখে পড়ল প্রবল ঢাকঢোলের ছন্দে ধেই ধেই নৃত্যরত আবীরে অন্ধকার এক মিছিল। দেখলে শুনলে প্রথমেই মনে হতে পারে বুঝি বা কোনও প্রতিমা ভাসানের আয়োজন। ফুর্তির কারণ বোঝা যায় ঝান্ডার রং দেখে। প্রতিবেশি রাজ্যে (অ)প্রত্যাশিত পালাবদলে উদ্বেলিত একগুচ্ছ লোক লাফাতে লাফাতে চলেছে নিরুদ্বিগ্ন নির্বিকার নগরীর নিস্তরঙ্গ জীবনের মধ্য দিয়ে, কেউ কেউ অবশ্য ঘাড় ঘুরিয়ে মিটি মিটি মজাও নিচ্ছিল। মিছিলে স্ফীত মধ্যকায়দের আধিক্য কিন্তু জানান দিচ্ছিল সেই মধ্যপন্থার অস্তিত্বকেই। এরা বছর পাঁচ-ছয় আগে ভোট দিয়েছিল সাদা-নীল হাওয়াই চটিতে, তারও পাঁচ-দশ বছর আগে সাদা চুল-ধুতি-পাঞ্জাবিতে, পাঁচ বছর বাদে জানি এরাই হয়ত নিশ্চিত আস্থাজ্ঞাপন করবে গেরুয়া ল্যাঙটে। পরিবর্তনশীল প্রতিবাদী হিসেবে এদের আবার ভুল বুঝবেন না, না-পাওয়ার হিসেবই এদের ঘনঘন শিবির ত্যাগের 'উসুল', সে হিসেব মেনেই এরা ঘুটির আদান প্রদান করে, বামকে ডানের সঙ্গে গুলিয়ে দিতে এরাই অনুঘটক বা 'ব্রোকার' হিসেবে 'সদাসক্রিয়'। ইতিহাসের নিয়ম মেনে এরা অনিয়ন্ত্রিত, প্রকৃতির নিয়ম মেনে এরা অবিনশ্বর, মুরগি-বিষ্ঠার সেই পোকার মতই দুর্দম। পশ্চিমী দুনিয়ায় এদের 'হিরো' বানিয়ে পেপারব্যাক নভেল বিক্রি হয়, আমাদের দেশ সে তুলনায় বেশ খানিক পিছিয়ে ঠিকই, কিন্তু এদের নেতৃত্বেই এদেশে মানুষ তার মত ও পথ হারিয়ে ফেলে, এক গাড্ডা থেকে বেরিয়ে গিয়ে পড়ে আরেক নরক গাড্ডায়।

সবুজে সবুজ গ্রাম, কালো মসৃণ পিচ রাস্তার বাঁকে সাইকেল চালিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রজাপতির মতো উড়ে যায় স্কুল বালিকার দল, কৃষক বাড়ির জোয়ান প্রজন্ম গেছে পশ্চিমে মজুরগিরি করতে, মাঝেমধ্যে ফিরে আসে পকেট ভরে, তাই নিশ্চিন্তে ভাতঘুম দেয় ভাতা-পুষ্ট পেটমোটা চাষি পরিবার। চাষবাস করি অ্যালাও আর কৎটুক আগায় ভাইও? নীল আকাশের গায়ে বিলবোর্ডে উদার হাসছেন উদ্‌গাতা বিশ্বশ্রী। আঁধার নামলে তাঁর নজর এড়িয়ে গঞ্জের নীলচে চৈনিক আলোতে লটারি-টুকরোয় ভাগ্যান্বেষণ আর মদিরায় ভাসমান চাষি দার্শনিক হাসে, পাইসা কুত্তি রাখিম ক'ন তো শাখাই? মরি গেইলে কাঁয় খাইবে পাইসা? অ্যাত্তো সুখের বন্যা, তবু গাঁয়ে কেন নির্বাচন আসে বলতে পারেন? আসলে ক্যালেন্ডারের অমোঘ নিয়ম মেনে তেনারা আসেন গণতন্ত্রের বিবর্ণ ধ্বজায় নতুন সীলমোহর দিতে। আর টাকার গাড়ি আসে ঝিমিয়ে পড়া সব বঞ্চিত বাঞ্চোতদের চাঙ্গা করতে! বিরোধী নির্মূল জানি, তবু পাছে পায়ে কোনও কাঁটা ফুটে যায়! শাসক সহুংকারে জারি রাখে মার্চপাস্ট, তাদের কি খানিক দুশ্চিন্তায় রাখে মধ্যপন্থীদের অজানা দুরভিসন্ধি? কারণ নধর মোরগা-রোস্টের জিভে-জল-আনা স্বাদের আড়ালে লুকিয়ে থাকতেই পারে কোনও মহামারীর গভীর চক্রান্ত!

শিব্রাম চক্কোত্তি থাকলে অবশ্য এসব শুনেটুনে বকুনি দিয়ে উঠতেন নির্ঘাৎ, আরে ওসব মদ্য (মধ্য) যুগীয় বর্বর (বড়বড়) ভাট ছাড়ুন তো মশাই, বাঙ্গালীর বিধি আসলে হল গে 'বাম'! হে হে!!

খুচরো ডুয়ার্স

আর্টে কমপ্লেক্স ফ্র্যাকচার

চোরেরা সবে ফিসফিসিয়ে জড়ো হতে শুরু করেছে। অন্ধকার থেকে তাঁদের মন দিয়ে দেখছে লোকজন। কী হয় কী হয় ভাব— এমন সময় বিনা ভূকম্পে পায়ের তলা ফাঁকা। দেখা গেল তিন চোরের অর্ধেকটা মাটির, থুড়ি, কাঠের

নিচে! কাঠ? কী সব বলচো কাকা! লোকজনের সামনে চুরি করছে চোর আর তাঁদের পায়ের নিচে সরে যাচ্ছে মাটি? আজকাল ম্যাজিক মাশরুম নিচ্ছ নাকি বস? আরে না না! এই সেদিন জলপাইগুড়ি আর্ট কমপ্লেক্সের মঞ্চে চোরের অ্যাক্টিং করতে করতে তিনজনের অর্ধ পাতাল প্রবেশ হলো কি না! স্টেজের পাটাতন ভেঙে তাঁরা নিচের দিকে ঢুকে গিয়েছিলেন। মরেও যেতে পারতেন। স্টেজের তলায় তীক্ষ্ণ সব শলাকা ওয়েট করে ছিল তাঁদের ভবলীলা সাঙ্গ করে দেওয়ার জন্য। তবে যাই বলুন কত্তা! এ সব বিরোধীদের ফুসুর ফুসুর! আর্ট কমপ্লেক্সের দায়িত্ব নেওয়া কলকাতার বাবুমশাই তো কত্তবার বলেছেন যে তাঁরা মঞ্চটিকে রাজার হালে রেখেছেন। ক-দিন আগেই তো ইঞ্চি ইঞ্চি মেপে যত্ন নেওয়া হলো। এই রকম তুলনাহীন যত্নের পর পাটাতন ভেঙে তিনজন মরতে মরতে আহত হয়েছেন জেনে বাবুমশাই-এর আর বিস্ময়ের সীমা নেই। কী করে ভাঙলো গো? আমরা যখন সিনেমা দেখাই তখন তো ভাঙে না! সিনেমায় কত্ত বোমা ফাটে, প্লেন-হেলিকপ্টার নামে, হিরো হিরোইনরা দুমদাম পড়ে— কই তখন ভাঙে না তো! ঠিক ঠিক। বাবুমশাই-এর বক্তব্যে দম আছে!

বাঁয়াত্মা

ঝিঁ ঝিঁ ডাকা ছায়াময় শুক্লা অষ্টমীর রাত। এক পাব্লিক ফিরছে জঙ্গলভেদি পথে। হঠাৎ পথে ওটা কী রে মামা! এ যে সেই! কুলোর মত কান, থামের মত পা, অজগরের মত শুঁড় আর সেই সিঙ্গল দাঁত! বাঁ-য়া-গ-ণে-শ!!! তবে যে সেদিনই কাগজ জুড়ে খবর বের হলো বাঁয়াবাবু পরলোক গমন করেছেন! খবরটা মিথ্যে নাকি সামনেরটা ভূত? বলেন কি কত্তা! হাতির ভূত?

তবে তো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বিপদ হলো! জ্যান্ত হাতি নিয়েই তাঁরা অস্থির, পরলোকগত হাতিরা এলে চাপ হয়ে যাবে না? কী বললেন? ডুয়ার্সের ফরেস্টের ইতিউতি অনেকেই দেখছেন বাঁয়ার আত্মা? সব্বোনাশ! এবার তো তবলার আত্মাও দেখা যাবে। আসলে ভূত টুত নয়। বাঁয়া গণেশ নামে কি আর একটা হাতি আছে ডুয়ার্সে? বাঁয়া হলো হাতির বিশেষ দশা। একটা মরেছে। বাকিগুলো তো আছে। মনে হয় রামের মিছিলে রাম দা নিয়ে যায় নি। সেই অনুশোচনায় সাইকোলজি মেনে হাতির ভূত দেখেছে।

বাটোসটো

জমজমাট পথ। স্টেট বাসে চালিয়ে পালাচ্ছে ভিলেন। টোটো নিয়ে ধাওয়া করছে নায়ক। সঙ্গে আরো আরো টোটোসাথি। তারপর ধরে ফেলল তাঁরা ভিলেনকে।

দুম-দাম-ঠাস-ঠাস। ঝনাৎ। শেষ শব্দটা বাসের কাচ ভাঙার। কাট। এক কথায় রোমহর্ষক সিন রায়গঞ্জের রাজপথে। সে শহরে টোটো বনাম এনবিএসটিসি-র ধুন্ধুমার ডায়লেকটিক্সের ফল। তা কী পচা ফল বলুন তো কত্তামশাই? কোথায় রায়গঞ্জে বাস থেকে নেমে টোটো চেপে বাড়ি ফিরব— সেটুকু সুখেও বালি? বাসের সঙ্গে বাসের ক্যাচাল মানা যায়, টোটো তো তার সতীন নয়। সে কি বাসের যাত্রী ভাঙায়? তবে? কে জানে কত্তা! শুনছি রাস্তা নিয়ে মারপিট, মানে রাস্তার স্পেস কে কী ভাবে কখন কতটা কোনদিক থেকে ব্যবহার করবে, তা নিয়েই কাজিয়া! কোথায় এক বাস-টোটো মিলেমিশে বাটোসটো হয়ে চলবি তা না, কেবল দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধাস! রাস্তায় বাস থামলে টোটো এসে তাঁকে কানাইয়ার চারপাশে থাকা গোপীদের মতো ঘিরে ধরবে, এটা তো অসাংবিধানিক মৌলিক অধিকার! বাকি থাকল রাস্তা আর পাব্লিক। তাদের কথা কে ভাবে কত্তা?

বক্সার আঁধার কার্ড

বক্সা পাহাড়ের সেই গ্রামগুলো আবার আঁধার লিঙ্ক করে ফেলেছে। বছর খানেক আগে প্রথমবার সেখানে বিদ্যুৎ ঢুকেছিল। ফলে আজন্ম আঁধারে থাকার লিঙ্ক হারিয়ে গিয়েছিল সেখানে। বিদ্যুৎ পেয়ে জীবন নতুন ভাবে সাজাচ্ছিলেন পাব্লিকগণ। তারপর আবার 'ইওর আঁধার লিঙ্কড সাকসেসফুলি' গোছের বার্তা। আবার সেই প্রাচীন অন্ধকার। তার বেয়ে বক্সায় পৌঁছোতে প্রায়ই তীব্র আপত্তি জানাচ্ছে বিদ্যুৎ। তার যাওয়ার পথে নাকি বাধা-ই বাধা! কোথাও পথ ছিঁড়ে পড়ে আছে। কোথাও যাওয়া মাত্র আগুন লেগে যাচ্ছে। বেচারা বিদ্যুৎ বেজায় সমস্যায়! ফলে বক্সা পাহাড়ের গ্রামে 'আবার এসেছে আঁধার'। সব শুনে গম্মেন্টের লোক বলছেন যে কী জানি একটা যন্ত্র এত খারাপ মানের দিয়েছিল যে কথায় কথায় 'দুম' করছে। শুনে গম্মেন্টের কর্তালোক বলছে, বাজে কথা! মূল সমস্যা হলো পাহাড়ি পথ। পাহাড় বলেই এত ঝামেলা! হুম! পাহাড়ি গ্রামে 'আঁধার লিঙ্ক'-এর কারণ তবে পাহাড়? বক্সার যে পাহাড় সেটা সমস্যা শুরু হওয়ার পর জানা গেছে বোধহয়। ঠিক হ্যায়! ভুল তো হতেই পারে, তাই না?

একটি গাছ

ভর সন্ধেয় শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম ঘেঁসা পেল্লায় গাছের মগডাল থেকে ছেলেটা নামছে কেন? অত উঁচুতেই বা উঠতে কে বলেছে তাঁকে? সুইসাইড করার নামে ব্ল্যাকমেইল করার ফন্দি ছিল নাকি? পাব্লিক ভারি চিন্তিত হয়ে উর্দ্ধমুখি। হেনকালে তিনি মাটিতে নিরাপদে অবতরণ করলেন। তারপর জানা গেল কাণ্ড। সারাদিন বেজায় গরম ছিল। রোদ্দুরে কাজ করতে করতে হঠাৎ দেখা গেল স্টেডিয়ামের গেট খোলা। ছায়ায় বসে রেস্ট নেওয়ার আশায় বেচারা স্টেডিয়ামের ছায়ামাখা সিঁড়িতে বসে

টের পেল ফুরফুরে হাওয়া ওপরের দিকে। আহা! কী শান্তি! চোখ বুঁজতেই ঘুম। চোখ মেলতেই অন্ধকার। মানে সন্ধে। গেট বন্ধ। কেউ কোথাও নেই। এবার বাড়ি যাবে কী করে? শেষে চোখে পড়ল স্টেডিয়াম লাগোয়া পেল্লায় গাছখানা। পেশা আবার হোর্ডিং-ব্যানার লাগানো বলে কোনওমতে গাছ বেয়ে নেমে এসেছিলেন সেই সন্ধেয়। ভাবুন তো! গাছ না থাকলে কী হত? একটি গাছের জন্যই কি গোটা রাত না খেয়ে স্টেডিয়ামে কাটানর হাত থেকে রক্ষা পেল না একটা প্রাণ?

বাদামাৎ

জঙ্গল লাগোয়া খেতে আলু-ভুট্টা-কুমড়ো-তরমুজ চাষ করা মানে হাতির দলকে দাওয়াৎ দেওয়া। এক খেত আলু কি দু'-বিঘে তরমুজ সাফ করতে হাতিদের আর কতটুকু সময় লাগে। তাই রামশাই-পানবাড়ি এলাকায় জঙ্গল লাগোয়া গ্রামে চাষবাস লাটে উঠেছিল বলতে গেলে। মানুষের অর্থনীতিতে হাতিদের বিশ্বাস নেই বলে বিনে পয়সায় কষ্টের ফসল খাওয়াতে হত। এ অবস্থায় চাষের কথা ভাবে কোন পাগল? ইদানিং বাদাম লাগিয়ে নাকি ফল পাওয়া যাচ্ছে। আলুর মতো জমি থেকে বাদাম তুলে খাওয়ার ব্যাপারে হাতিদের তেমন প্রতিভা নেই বলে বাদাম ফলিয়ে দাম পাওয়ার আশা জাগছে সেখানে। এখন আশঙ্কা হলো হাতিরা বাদাম তোলা শিখতে কতটা সময় নিতে পারে! চাষ বিভাগের তীব্র আশা যে হাতিরা এটা শিখতে পারবে না। সুতরাং গজবাবুরা আপাততঃ বাদামি চালে মাৎ বলে ধরে নেওয়া যায়।

সম্বরম

জয়গাঁতে সেদিন পথ ভুলে চলে এসেছিলেন সম্বরবাবু। চোখের সামনে তাকে দেখে এলাকায় উত্তেজনার শেষ নেই। পাব্লিকের উৎসাহে সম্বরের আত্মা অম্বরের দিকে চলে যেতে পারে আশঙ্কায় পুলিশ সময় মতো হাজির। কিন্তু সম্বরকে যারা বনে নিয়ে যাবে সেই বনকর্মিরা আর আসে না। এদিকে সম্বর ক্রমেই ঘাবড়ে যাচ্ছে। যে কোনও সময় ইহলোক ছেড়ে মাংস হয়ে যাবে। বাধ্য হয়ে পুলিশ সিদ্ধান্ত নিল 'সম্বর গ্রেপ্তার'। খুব কায়দা করে তাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে ডাক্তার ডাকা হলো। ততক্ষণে গুজবের পাল ফুলে আকাশ দিয়েছে ঢেকে। সম্বরকে নাকি লক আপে ঢোকান হয়েছে! শেষে পুলিশ খুব করে পাব্লিককে বকে দিয়ে বলেছে, ইয়ার্কি নাকি? সম্বরকে কখনও লক আপে রাখা যায়? আপনাদের হাতে রাখলে এতক্ষণে পোস্টমর্টেমের আয়োজন করতে হত বলে গ্রেপ্তার করেছি। নীলপাড়া রেঞ্জের লোক এলে জামিন দিয়ে দেব সম্বরকে। —ব্যস! পাব্লিক চুপ। সম্বর সেফ।

টুক্রাণু

জঙ্গল শুকনো বলে গেরস্থের বাড়িতে জল খেতে আসছে বাইসনেরা অরণ্য ঘেঁষা আলিপুরদুয়ার-কোচবিহারে। মৌলানিতে বাছুর বধ করে গোহত্যায় অভিযুক্ত এক চিতা। পাড়াডুবিতে ঘুম পাড়ানি গুলি খেয়ে পটল তুলল একজোড়া বেচারা বাইসন। ধূপগুড়িতে মাঝরাতে টানা বাজল ব্যাঙ্কের সাইরেন। ন্যাওড়া ভ্যালিতে ২০০ প্রজাতির পাখি পেয়ে আঁখি কপালে গম্মেন্টের। উদ্বোধনের আগেই ফেটে যাচ্ছে এশিয়ান হাইওয়ে, উদ্বোধনের পর থাকবে না। চালসায় কারা জানি পাইপ ফাটিয়ে খাওয়ার জল নদীতে ফেলে দিচ্ছিল। নিশিগঞ্জের মাছ বাজার থেকে ৭০ হাজার টাকার মাছ চুরি—বেড়ালদের সন্দেহ করা হচ্ছে না। বালুরঘাটে দানাহীন ভুট্টা জন্মে চাষির মাথায় বাজ ফেলেছে। দিনহাটার কৃষ্ণবাবু স্রেফ সব্জি সেদ্ধ খেয়েই দিন কাটিয়ে থাকেন।

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি
৯৪৩৪৩২৭৩৪২

শিবমন্দির
অনুপ দাস ৯৮৩২০২৯৫১৪

জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
বিজয় ঝা ৮৫৩৮৮২২৪০৪

মালবাজার
সম্রাট (হোম ডেলিভারি) ৯৩৩২০০৫৮৬৫

চালসা
দিলীপ সরকার ৯৭৭৫৪১৫১৪৪

বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল
৯৪৩৪৮০৯৫৯০

বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২

মাদারিহাট
জগৎ চৌধুরী ৯৭৪৯৭২৫৭৮১

লাটাগুড়ি
সৌমেন (হোম ডেলিভারি) ৯০০২৪০৯৮৯৩

ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮

ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৪৩৪৪১২৬৪৯

আলিপুরদুয়ার
শ্যামলি বুক ডিপো (০৩৫৬৪-২৫৫৪১৮)

কোচবিহার
সার্থক পণ্ডিত (হোম ডেলিভারি)
৭০০১২৬৩২৮৬
জয়ন্ত দাস ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
৯৮৫১২৩৪৮৮৯

মাথাভাঙা
বরুণ সাহা ০৩৫৮৩ ২৫৫৫৭৭

মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি
৯৯৩২৯৬৭৯৯১

রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার ৯৪৩৪৪২৩৫২২

বালুরঘাট
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩
ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক বিশাল বুক সেন্টার ৪০৬৪৪০৯৭

বইপত্র সাহিত্য

পাঠক কোথায় ?

পাঠ্য বই না হয়ে গল্প-কবিতা-উপন্যাসের বই হলে আজ ছোট বা মাঝারি প্রকাশক উদ্বিগ্ন, বই পাঠক সারা পৃথিবীতে যখন বাড়ছে তখন বাংলা বইয়ের পাঠক সংখ্যা নিম্নমুখী এ নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। উত্তরে তেমন কোনও প্রকাশনা সংস্থা গড়ে ওঠেনি, স্থানীয় একমাত্র বহুল প্রচারিত দৈনিক কাগজটি তাদের চার দশকের অস্তিত্বে বই প্রকাশনার মাধ্যমে লেখক তৈরি করবার নৈতিক দায়িত্বটুকু পালন করবার প্রয়োজন বোধ করেনি, ফলে লিটল ম্যাগাজিনের মহান উদ্যোগগুলি আজও খর্বাকৃতিই রয়ে গিয়েছে। বাৎসরিক বইমেলা এখন বই বিক্রির একমাত্র জানালা, কিন্তু রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত না থাকায় বইমেলা নিয়েও মানুষের আগ্রহ কমতে বাধ্য।

২৪ মার্চ ২০১৮ শনিবার। বাসন্তী অষ্টমীর বিকেল, দূরাগত ঢাকের আওয়াজ এসে মিশেছে শহরের কোলাহলের সঙ্গে। আর তখন জল-শহরের 'আড্ডাঘর ক্লাবের' উদ্যোগে আড্ডাঘরে জমে উঠল একটু অন্যরকম সাহিত্য আড্ডা। এ ক্লাবের আন্তরিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে এ সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি ও কোচবিহারের বিশিষ্ট লেখক, পাঠক ও আলোচকরা।

সভার সূচনা হল আড্ডাঘর ক্লাবের সভাপতি প্রশান্ত নাথ চৌধুরীর স্বাগত ভাষণে। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন শুভ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শ্বেতা সরখেল। শুভ্রবাবু প্রথমেই আহ্বান জানালেন 'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকা ও প্রকাশনার প্রধান প্রদোষ রঞ্জন সাহাকে, আজকের আড্ডার পূর্বঘোষিত এবং এই সময়কালের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক 'পাঠক কোথায়' শীর্ষক আলোচ্য বিষয়ে আলোকপাত করে বিতর্কের ধরতাইটুকু ধরিয়ে দেবার জন্য। প্রদোষ বলেন, 'সোশ্যাল, ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়া পরস্পরের পরিপূরক, সুতরাং পারস্পরিক সহযোগিতা দরকার। অতএব বই পাঠক কমছে তার দায় সোশ্যাল মিডিয়া প্রীতির উপরে চাপালে চলবে না। প্রিন্ট মিডিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাঙ্খিত বিষয় হল ধারণ করে রাখার ক্ষমতা। গঙ্গার ওপারে 'আনন্দবাজার' সংস্থা প্রকাশনার জগতে বিপুল একটি বাজার তৈরিতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার এত বছর পরেও গঙ্গার এপারে তার ন্যুনতম উদ্যোগ আজ অবধি দেখা যায়নি। তিনি আরও বলেন, উত্তর বাংলায় প্রয়োজন খুব ভাল প্রকাশনা ব্যবস্থা সঙ্গে ভাল লেখাও। সোস্যাল মিডিয়াতেও লেখকেরা শুধু নিজেকে নয়, পরস্পরকে প্রমোট করুক।'

এরপর 'পাঠক কোথায়' এই বিতর্কিত বিষয়টি নিয়ে খোলা মনে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করলেন; গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, প্রবীর রায়, রণজিৎ মিত্র, বিপুল দাস, অমিত কুমার দে, মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য, সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, অরবিন্দ

ডুয়ার্সের দুই মহারথী গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ও দেবপ্রসাদ রায়

আড্ডাঘরে 'পাঠক কোথায়?' আলোচনা চক্রে উপস্থিত শ্রোতারা

বইপত্র সাহিত্য

ভট্টাচার্য, গৌতম চক্রবর্তী প্রমুখ এবং সর্বশেষ বক্তা ছিলেন দেবপ্রসাদ রায় মহাশয়।

গৌতম চক্রবর্তী

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

দেবপ্রসাদ রায়

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

'পাঠক কোথায়' শীর্ষক আলোচনায় উঠে এসেছে নানা তথ্য, সমস্যাটির গভীরে যাওয়ার চেষ্টা ও সমাধানের পথ অনুসন্ধানের আন্তরিক ইচ্ছাও। বিভিন্ন বক্তার মতামত ছিল এই রকম—

(ক) পাঠক-লেখক সামীপ্যের অভাব রয়েছে। পাঠ-অভ্যাস একেবারে বাল্যকাল থেকেই গড়ে দিতে হবে। সেক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়টুকু নিতে হবে অভিভাবক, বিদ্যালয়, শিক্ষক ও সমাজকেই।

অমিত কুমার দে

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

বিপুল দাস

সুকান্ত গাঙ্গুলী

(খ) গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে আরও পরিশ্রম করতে হবে লেখককেই। ঘরে বসে নয়, ময়দানে নেমে ক্ষেত্রসমীক্ষা করেই এ ধরনের গ্রন্থ রচনা করা উচিত।

(গ) বিপণন ব্যবস্থা আরও সুপরিকল্পিত হওয়া চাই। প্রকাশিত গ্রন্থের প্রচারে ও বিপণনে বিভিন্ন মিডিয়ার যথাযথ ব্যবহার হওয়া দরকার।

(ঘ) পাঠক সর্বদাই সংখ্যালঘু; বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলি বিপণনের অত্যাধুনিক কৌশল জানে। তাঁদের পুঁজিও বিপুল, এমন কথা জানালেন এক বক্তা।

(ঙ) ইংরেজি বইয়ের প্রোডাকশন অসাধারণ উন্নত, বিপণনও অত্যাধুনিক— বললেন এক আলোচক। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে বাংলাতেও কেউ কেউ উচ্চ মানের বই ছাপছেন। ভালো কাগজ, সুদৃশ্য ডিজাইন, ঝকঝকে ছবি সম্বলিত একটা বই নিষ্ক্রিয় পাঠককে প্ররোচিত করে নিয়মিত পাঠাভ্যাস গড়ে দিতে পারে। প্রচার ছাড়াও সেইধরণের প্রোডাকশন পরিকল্পনা গ্রহণ করা চাই।

রণজিৎ মিত্র

প্রদোষ রঞ্জন সাহা

(চ) পাঠক বিভিন্ন ধারার হ'ন। মূলত রিক্রিয়েশন রিডিং, ইনফর্মেশন রিডিং ও নলেজিয়াস— এমনই পাঠ অভ্যাস পাঠকের। সাহিত্য থেকেও অনেকে চিরায়ত বিষয়কে আশা করেন। সব ধরনের পাঠক যাতে কাঙ্খিত উচ্চমানের বইটি সংগ্রহ করতে পারেন, প্রকাশককে সে দিকেও নজর দিতে হবে। লেখককেও অত্যন্ত যত্নশীল হতে হবে নিজ সৃষ্টির ক্ষেত্রটিতে। অর্থাৎ প্রকাশক, লেখক, পাঠক সবাইকেই নিজের কাজটি করতে হবে সযত্নে শ্রদ্ধায়।

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

প্রবীর রায়

প্রশান্ত নাথ চৌধুরী

(ছ) অত্যন্ত আশাবাদী এক বক্তা জানান— সাহিত্য পাঠ আগেও ছিল এখনও আছে। ভাল বই হলে বিক্রি তার হবেই। এ সমকালেই বাংলাদেশে একমাস ধরে চলে একুশের বইমেলা, সেখানে বিক্রি হয় লক্ষ লক্ষ টাকার বাংলা বই। তাহলে 'পাঠক কোথায়' এই প্রশ্ন কতটা সঠিক?

(জ) 'ভোগবাদী, ব্যক্তিকেন্দ্রিক এ শূন্যকাল গ্রন্থপাঠে উদ্বুদ্ধ করছে না। এ অবস্থার পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরি' —জানালেন এক আলোচক। 'পাঠক তৈরি করতে হবে। দায় সবারই; সবাইকেই সে দায় ভাগ করে নিতে হবে। তবে আমরা প্রত্যুষের স্বপ্নই দেখব। 'এখন ডুয়ার্স' প্রকাশনা যে ভাবে উত্তরবঙ্গের প্রকাশনা জগতে দায়বদ্ধতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ শুরু করেছে, সচেতন লেখক ও পাঠকের উচিত হবে সর্বান্তকরণে তাঁর শ্রম ও মেধা নিয়ে সঙ্গে থাকা।'

(ঝ) আর এক বক্তা জানান, বাংলা বইয়ের জনপ্রিয়তা কমেছে এ কথা মানতে রাজি নই। পুরনো প্রকাশনা সংস্থাগুলি সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে এমনটা তো নয়ই বহু নতুন প্রকাশনা সংস্থা দেখা যাচ্ছে।

সাহিত্য আড্ডার দ্বিতীয় পর্বে ছিল গল্পকার সুকান্ত গাঙ্গুলীর 'কুন্থলিয়াদের দেশে' ছোট গল্প সংকলনটির প্রকাশ অনুষ্ঠান। প্রকাশ করলেন অরবিন্দ ভট্টাচার্য। এরপর 'এখন ডুয়ার্স' প্রকাশনা থেকে সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের আটজন লেখককে স্মারক দিয়ে সম্মাননা জানানো হল 'এখন ডুয়ার্স' প্রকাশনার পক্ষ থেকে। এরপর ভ্রমণরসিক ও লেখক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য মহাশয়কে বিশেষ সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। নানা আলাপচারিতা, আড্ডায় চা ও টা সহযোগে চলতে চলতে সন্ধে গড়িয়ে গিয়েছে কখন; আর কখন যে রাত বেড়েছে টেরই পাওয়া গেল না।

'এখন ডুয়ার্স' এর পক্ষে
তনুশ্রী পালের সৌজন্য প্রতিবেদন

সরস্বতী সঙ্গে থাকুক লক্ষ্মী থাকুক স্বপনে

পাঠক-লেখক, এ সম্পর্ক বড় অম্লমধুর। সে শুধু কি একালে? কাল ছাড়িয়ে কালান্তরেও ছিল মধুর কথায় সম্পর্ক টান। পাঠক কাকে হাত বাড়িয়ে নেবে আর কাকে ফেলে দেবে মহাকাল জানে। কারও লেখা কোনও পাঠকের খুব পছন্দ হল আর কেউ বা সেই লেখা থেকে মুখ (চোখ!) ফিরিয়ে নিল। আসলে প্রচার বা বিজ্ঞাপন বিশেষ জরুরি। সেটা কীভাবে হচ্ছে সেটাও বড় ব্যাপার। নামকরা বিখ্যাত প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশকের নাম থাকলে সেই বই বিকোয় বেশি। লেখককেও প্রাণপাত টেনশন নিয়ে পরিচিতদের বলতে হয় না— আমার এ বইটা একটু দেখ। কিন্তু সবাই তো প্রাতিষ্ঠানিক কল্কে পাবে এমন কথা নেই। তার জন্য লেখার মান, ধারাবাহিকতা সবটাই জরুরি। আর সেখানে অর্থ লগ্নির ব্যাপার আসেই না।

উত্তর বা মহানগরীর আশপাশ থেকে যাঁরাই সাহিত্যচর্চা করেন বা করে চলেছেন এ যাবৎকাল, যোগ্যতার বিচারে সে সব লেখার মধ্যে ৫০ শতাংশ বা তার বেশি লেখাই উন্নতমানের অবশ্যই, কিন্তু প্রথমেই পাণ্ডুলিপি গুছিয়ে নিয়ে প্রকাশকের দরজায় দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তাঁকে দাঁড়াতে হয়, অবশ্য অনেকক্ষেত্রে যে লেখক কাগজপত্রে লিখতে লিখেতে পরিচিত নাম হয়ে যান তাঁদের বোধহয় দৌড়ানো একটু কম। তবে টাকার অংক নিয়ে কবি বা নতুন লেখকদের প্রকাশ্যে ছাপার অক্ষরে অনেককেই নামতে হয়। খুব কম প্রকাশকই সৌজন্য বা বদান্যতায় লেখক তুলে ধরা বা তৈরি করার চেষ্টা করেন। ফলত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রত্যন্ত অঞ্চলের লেখকদের লেখার সঙ্গে নির্ধারিত অর্থটি তাঁরা আদায় করলেন, কিন্তু বিক্রির ক্ষেত্রে অনীহা। কে কিনবে! এই ধারণায় ২০০ বা ৩০০ কপি লেখকের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। এবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব লেখকের। তিনি সে সব জমিয়ে রাখবেন না দোকানে দেবেন, নাকি প্রিয়জনকে বিলোবেন সেটা তাঁর ব্যাপার। অর্থাৎ জীবৎকালে দু'-একটি পত্রিকা বা সংবাদপত্রে বড় জোর আলোচনা সমালোচনা বেরল, ব্যক্তিগত উদ্যোগে কয়েক হাজার টাকা এল, বেশিটাই লস। তবু... হ্যাঁ তবু নিজের লেখাকে ভালবেসেই লেখকদের উচিত তাকে মলাটস্থ করা। নয়তো কালের অতলে কোথায় তলিয়ে যাবে, নয়তো হলুদ মড়মড়ে পৃষ্ঠাগুলো একদিন কাগজওলার চটের ব্যাগে নয়তো কোনও নদী বিধৌত আবর্জনা স্তূপে নিক্ষিপ্ত হবে কে জানে!

'এখন ডুয়ার্স' যখন এই আড্ডাঘরে তাদের পরিপূর্ণভাবে গুছিয়ে বসার, দাঁড়াবার, বই দেখার জায়গা করে দিয়েছিল, আমি বেশ খানিকটা আলো দেখেছিলাম, স্বস্তিও পেয়েছিলাম। প্রথম দিকেই ছুটে গিয়ে সদস্যপদ নিয়েছি, যখন অনেকেই সদস্য হয়নি। যদিও কর্মস্থান ভিন্ন হওয়ায় সবসময় যোগাযোগ সম্ভব হত না। তবু আশা ছিল, আমার বইগুলো যেগুলো অনেকগুলোই দশ-বারো বছর থেকে আমার সঙ্গী সেগুলো তো থাকছে! আলোচনা হোক পত্রিকায়। আর অন্ততঃ আলমারি বা টেবিলে ডিসপ্লে হোক। এটা চেয়েছিলাম। অর্থাৎ সেই প্রচার। ক'টা বিক্রি হল তার হিসেব এখনও কোনওভাবেই কোথাও চাইতেই শিখিনি আমরা, আর শহরের নামকরা বইয়ের দোকানগুলো বই রাখে, বিক্রিও করে জানি, কিন্তু জিজ্ঞেস করলেই একগাল হেসে বলবে... 'ওই আছে। বই কেনেই না কেউ, ...পড়ার বই ছাড়া।' অসহ্য লাগে এ উত্তর। তাই জিজ্ঞেস করি না। আসলে বই বিরাজ করে, সাজানো থাকে কিছুদিন তারপর মুখ লুকোয় পাঠক্রমের সহায়িকা বইয়ের পিছনে। যে ক'টা বিক্রি হয় তার টাকাও ক'জন লেখক পায় আমার জানা নেই। অর্থাৎ সে গুড়ে বালি। সে ক্ষেত্রে জলপাইগুড়ি আড্ডাঘরে অন্ততঃ কয়েকটা বই সুন্দর সাজানো থাক, লোকজন নাড়াচাড়া করুক, মলাট উল্টে দেখুক, সেটুকুই চেয়েছিলাম।

> 'আসলে বই বিরাজ করে, সাজানো থাকে কিছুদিন তারপর মুখ লুকোয় পাঠক্রমের সহায়িকা বইয়ের পিছনে। যে ক'টা বিক্রি হয় তার টাকাও ক'জন লেখক পায় আমার জানা নেই।'

অবাক হলাম যেদিন সিদ্ধান্ত শুনলাম 'এখন ডুয়ার্স' প্রকাশনায় প্রকাশিত বই ছাড়া অন্য বই রাখা হবে না। সে সব বইগুলো আর চোখে দেখিনি, ফেরতও পাইনি, পত্রিকায় আলোচনাও পাইনি। কলকাতায় বাসস্থান বা কর্মস্থান হলে না হয় পাতিরাম বা কলেজ স্ট্রিটে কোনও পরিচিত দোকানে দিয়ে রাখলে ফিডব্যাক পাওয়া যেত, সেটা কখনওই সম্ভব নয়। সুতরাং বইমেলাগুলোর দিকে আমি অন্ততঃ তাকিয়ে থাকি। সত্যি বলতে কী আমার বইয়ের এক শ্রেণির পাঠক তো তৈরি হয়েছে, সেটা বইমেলা এলে টের পাই। অথচ সতীর্থরা অনেকে উল্টেও দেখে না। হয়ত বা অল্প পরিচিত বা স্থানীয় জনপ্রিয় কোনও লেখকের বই আমি কিনে পড়ে ফেলেছি, সে কিন্তু পাঁচবার ভাবছে, কিনব! ধুর্, পড়ব না। এর চেয়ে যাই নাম অতি পরিচিতদেরটাই কিনি। পড়া হয় না বাপু! এই হল নানা ধরনের পাঠক।

আর কবিতার এক বিশেষ পাঠক আছে, যারা কবিতা লিখতে শুরু করেছে, কিছু কিছু পড়ছে, কিন্তু কোন দিকে যাবে দিশা পাচ্ছে না। শহরের অমুকে যে ধারায় লেখে ওটা চলবে না, ব্যস চল অমুক পাড়ায় ওর মতো লিখতে হবে। ফলত কতগুলো শব্দের পাশাপাশি চাষ হয়, কবিতা হয় না সব। বুকের ভিতর জোয়ার নেমে এলেই তো হবে কবিতা, সেই স্বতঃস্ফূর্ততা কোথায়!

যাই হোক, এক শ্রেণির পাগল লেখক, আমি, আমার পরবর্তী প্রজন্ম আমার বই ছুঁয়ে দেখল কি দেখল না তা না জেনেই প্রচুর বুকের কথা, সামান্য অভিজ্ঞতার কথার ঝুলি নিয়ে অক্ষরশিল্পী তৈরি হয়েছি। বিরাট কোনও আশার স্বপ্নে বাস করি না তবু দু'হাত বাড়িয়ে পাঠক যখন এগিয়ে এসে আমাকে না চিনেই পাঁচখানা বিভিন্ন বই কিনে নেয়, তখন আবার মনের ভিতর ঝকঝকে হয়ে ওঠে তারাগুলো। আবার ছুটতে থাকি ঠিক এখনকার গতিময়তায়, এ শহর ছেড়ে অন্য শহর, তারপর নগরের দিকে। চাকার সঙ্গে ট্রেন অথবা বাসে। শ্রম আর মেধা যখন মিলেমিশে মননের ধারেকাছে মনের পাশে দাঁড়ায় তখন সত্যিই ভুলে যাই আমার ক'টা বই বিক্রি হল। একজন পাঠকের উজ্জ্বল মুখকেও ঈশ্বরী মনে হয়।

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

বইপত্র সাহিত্য

জন্মশতবর্ষে নিজভূমে অবহেলিত উপেক্ষিত

অমিয়ভূষণ মজুমদার !

কোচবিহার ছিল তাঁর নিজের বাসভুমি, যে বাসভুমি ছেড়ে তিনি কখনই কলকাতাবাসী হওয়ার কথা ভাবেন নি, যে ঐতিহ্যনগরীর রাজবাড়ি বাদ দিলে অমিয়ভূষণ ছাড়া আর কেউ নেই, সেই কোচবিহারের জনগণ এরই মধ্যে তাঁকে ভুলে গেল? সাংস্কৃতিক দেউলিয়া না হলে এও কি কখনও সম্ভব?

সরকারি উদাসীনতা ও অবহেলায় কেটে গেল কথা সাহিত্যিক অমিয়ভূষণের জন্মশতবর্ষ। অথচ সবারই জানা, দীর্ঘ ছয় দশকের সাহিত্য সাধনায় তিনি লিখে গেছেন ২৯টি উপন্যাস, অসংখ্য ছোট গল্প, প্রবন্ধ, এঁকেছেন বেশ কিছু ছবিও। ১৯৭১ এ পেয়েছেন ত্রিবৃত্ত পুরস্কার, ১৯৮০ তে কলকাতার সমতট সংস্থার তরফ থেকে তাঁকে দেওয়া হয় সমতট সম্মান। ১৯৮৪ তে তাঁকে দেওয়া হয়েছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ সাহিত্য পুরস্কার। ১৯৮৬ তে তাঁর 'রাজনগর' উপন্যাসের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে বঙ্কিম পুরস্কার দেন। সে বছরই ভারত সরকার তাঁর হাতে তুলে দেন সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার।

বাংলা সাহিত্যে অমিয়ভূষণ ছিলেন ব্যতিক্রমী ঘরানার লোক। তার উপন্যসগুলোর মধ্যে রাজনগর, গড় শ্রীখণ্ড, মহিষকুরার উপকথা, নীল ভুঁইঞা, বিলাস বিনয় বন্দনা, ফ্রাইডে আইল্যান্ড অথবা নরমাংস ভক্ষণ, নয়নতারা, ছোট গল্পের মধ্যে দীপিতার ঘরে রাত্রী, প্রমিলার বিয়ে একশ্রেণির পাঠক মহলে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। নিজের অজান্তেই তিনি হয়ে গিয়েছিলেন ভাবী প্রজন্মের গবেষণার বিষয়।

প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি, পুরস্কার এ সবের প্রতি তার কোনও আসক্তি ছিল না। তাই বঙ্কিম পুরস্কার পাওয়ার পর এই প্রতিবেদকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি সোজা সাপটা জানিয়েছিলেন, পুরস্কার লেখাকে ভালও করে না, মন্দ করে না। তিনি বলতেন, লেখকের মর্যাদা পাঠকের কাছে। আমার যে মর্যাদা বিশেষ এক শ্রেণির পাঠকের কাছে চিরদিনই ছিল ও আছে তার কোনও তারতম্য এই পুরস্কারে হয়নি। তিনি বলতেন, লেখাটা হয় নিভৃতে। যেখানে লেখা আর লেখক ছাড়া আর কিছু থাকে বা প্রবেশ করতে পারে এমনটা মনে করি না। সুতরাং পুরস্কার বা অবহেলা কিছুই সেখানে ঢুকতে পারে না।

> ‘রবীন্দ্রনাথের উপমা দিয়ে তিনি বলতেন, মজা দেখো, রবীন্দ্রনাথ কলকাতার ছেলে, অথচ তাঁর লেখায় কলকাতা প্রায় অনুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথ যেন কোনও এক অদ্ভুত উপায়ে বুঝতে পেয়েছিলেন, বাঙালির জীবন ও মন কলকাতায় যতটুকু কলকাতার বাইরেও তার চাইতে কম নয়। এই অদ্ভুত উপায়টিই হচ্ছে মনীষা বা প্রতিভা। তাই কলকাতাকে বাংলার চাইতে বড় করে দেখা উচিত নয়।’

লেখকের প্রকৃত স্বীকৃতি কী? এই প্রশ্নের উত্তরে দার্শনিক অমিয়ভূষণ বলেছিলেন, এক সময়ে এই স্বীকৃতি অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। সভাকবি বা চারণ কবিদের জীবিকার সঙ্গে যুক্ত ছিল। এখনও এই রকম স্বীকৃতি কাজে লাগছে বলে শুনেছি। যেমন, বছরে লাখ টাকা উপার্জন হয়, আমাদের দেশেই এমন পাঠক স্বীকৃতি পেয়েছেন কেউ কেউ। আবার অন্যরকমও আছে। মিল্টন তাঁর জীবদ্দশায় 'প্যারাডাইস লস্ট'-এর জন্য মাত্র ছয় পাউন্ড পেয়েছিলেন। হপকিনসকে কেউ কবি বলে স্বীকার করেননি। অথচ তার মৃত্যুর ত্রিশ বছর পর তার লেখা কবিতাগুলো বই হয়ে বের হলে তাঁকে আধুনিক যুগের অন্যতম বড় কবি বলা হল।

অমিয়ভূষণও লিখতেন চল্লিশের দশক থেকে। আশির দশক পর্যন্ত তাঁর স্বীকৃতি

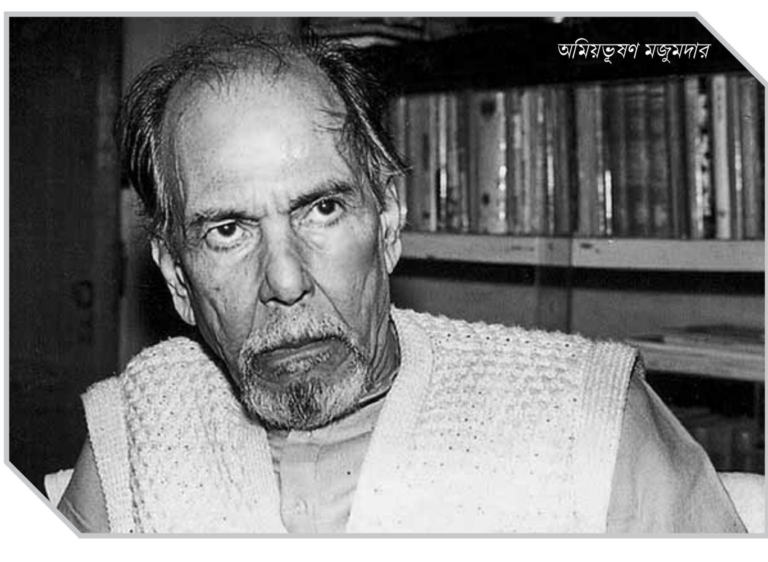
অমিয়ভূষণ মজুমদার

জোটেনি। তাতে কিন্তু তার কলম রুদ্ধ হয়ে যায়নি। তিনি লিখে গিয়েছেন নিয়ত বহমান ঝরনাধারার মতো। তাঁর লেখনিতে উঠে এসেছে বাংলার উত্তরেরএই প্রান্তদেশের অবহেলিত জনজাতির জীবনের রোজনামচা। এক সময় প্রবাসী, চতুরঙ্গী, পরিচয় প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হত। এছাড়াও তিনি লিখে গিয়েছেন অজস্র লিটিল ম্যাগাজিনে। লিখেছেন গণদাবি পত্রিকায়। বৃহৎ সংবাদপত্র গোষ্ঠীর হাতছানিতে তাঁর আসক্তি ছিল না। তাই রাজধানী কলকাতা থেকে অনেক দূরে বাংলার উত্তরপ্রান্তের সীমান্ত শহর রাজনগরে বসেই চলেছে তাঁর নিয়ত সাহিত্য সাধনা। তিনি বরাবরই ছিলেন কলকাতা বিমুখ। কলকাতাকে বাংলার চাইতে বড় করে দেখতে তিনি রাজি ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের উপমা দিয়ে তিনি বলতেন, মজা দেখো, রবীন্দ্রনাথ কলকাতার ছেলে, অথচ তাঁর লেখায় কলকাতা প্রায় অনুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথ যেন কোনও এক অদ্ভুত উপায়ে বুঝতে পেয়েছিলেন, বাঙালির জীবন ও মন কলকাতায় যতটুকু কলকাতার বাইরেও তার চাইতে কম নয়। এই অদ্ভুত উপায়টিই হচ্ছে মনীষা বা প্রতিভা। তাই কলকাতাকে বাংলার চাইতে বড় করে দেখা উচিত নয়।

আজকের দিনেও বিরল ব্যতিক্রমী লেখক অমিয়ভূষণ বাংলা সাহিত্যে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আজ তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় দেড় যুগ অতিক্রান্ত। দুই বাংলায় তাঁকে নিয়ে গবেষণা হচ্ছে বিস্তর। কোনও প্রলোভন বা অনুদানের কাছে আত্মসমর্পন না করে মাথা উঁচু করে চলতে শিখিয়ে গেছেন তিনি। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে এমন একটা মানুষের জন্মশতবর্ষ কেটে গেল নীরবে নিভৃতে। মা-মাটি-মানুষের সরকারের যুগে প্রায় প্রতিদিনই ঘটা করে আয়োজিত হচ্ছে কত মেলা কত অনুষ্ঠান কত মনীষীর জন্ম-মৃত্যুদিন। বইমেলা, শিল্প মেলা, ফুল মেলা, শ্রমিক মেলা, স্বাস্থ্য মেলা, সবলা অবলা নানা রকমের মেলা উৎসব। বাম আসলে ঘটা করে পালিত হয়েছে আব্বাসউদ্দিন শতবর্ষ। তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ও মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষের ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতি বছরই তাঁর নির্বাচনী ক্ষেত্রে ধুমধাম করে পালিত হয় অবহেলিত আনাদৃত প্রথিতযশা লোকশিল্পী নায়েব আলি টেপুর জন্ম জয়ন্তী। লোকসংস্কৃতির প্রসারে এ উদ্যোগ স্বাগত এবং যথোচিত। কিন্তু কী দোষ করেছিলেন অমিয়ভূষণ, যে তাঁর জন্ম শতবর্ষে সংস্কৃতিমনস্ক মা-মাটি-মানুষের সরকারের তরফ থেকে একগুচ্ছ ফুল অথবা একটি মালা দিতেও কেউ এগিয়ে এলেন না? তাঁর প্রতিকৃতি বা স্মারক স্থাপন তো দূর অস্ত!

কেবল তাঁর পারিবারিক উদ্যোগে গত ২২ মার্চ তাঁর নিজের বাড়িতে অনাড়ম্বর ভাবে পালিত হয়েছে তাঁর জন্ম শতবর্ষ। নিন্দুকেরা বোধহয় ঠিকই বলেন, আসলে বিরল প্রজাতির এই উন্নতশির লেখক ব্যক্তিত্ব অমিয়ভূষণের হয়ত কোনও সংগঠিত ভোট ব্যাঙ্ক নেই! তাই নির্বাচনী প্রচারের ঢক্কা নিনাদে আর উৎসব-মেলার অরণ্যে বেমালুম হারিয়ে গিয়েছেন তিনি। এসময় এ নিয়ে আক্ষেপ করাটাই হয়ত বৃথা। কিন্তু উত্তরের এই ভূমিপুত্র বাংলা সাহিত্যের অন্যতম উজ্জ্বল অহংকার, তিনি ধুয়ে মুছে যেতে পারেন না, আজ না হলেও কালকের প্রজন্ম তাঁকে স্মরণ করতে বাধ্য।

> “কিন্তু কী দোষ করেছিলেন অমিয়ভূষণ, যে তাঁর জন্ম শতবর্ষে সংস্কৃতিমনস্ক মা-মাটি-মানুষের সরকারের তরফ থেকে একগুচ্ছ ফুল অথবা একটি মালা দিতেও কেউ এগিয়ে এলেন না? তাঁর প্রতিকৃতি বা স্মারক স্থাপন তো দূর অস্ত!”

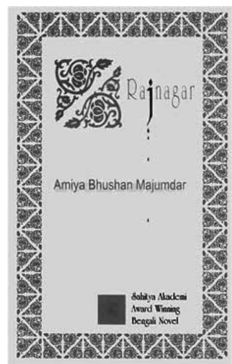

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

বই পত্রের ডুয়ার্স

সোনালী ডুয়ার্স

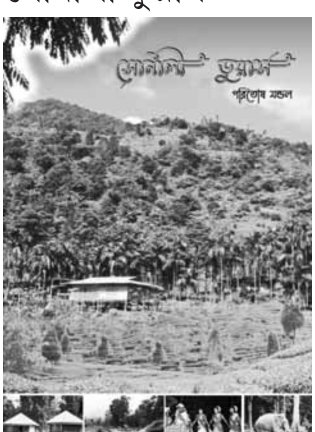

দক্ষিণবঙ্গের ছেলে ডুয়ার্সের প্রেমে পড়ে রয়ে গেলেন, বাসা বাঁধলেন এখানেই, এমন উদাহরণ কম নেই। কিন্তু নিজের কাজকম্মের ফাঁকে কবিতায় ও ছবিতে ফুটিয়ে তুলছেন ডুয়ার্সকে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল। নৈহাটির ছেলে পরিতোষ মন্ডল এখন শিলিগুড়ি নিবাসী, বিজ্ঞাপন বাণিজ্যের ফাঁকে পদ্য লেখেন। ডুয়ার্স নিয়ে তাঁর একগুচ্ছ কবিতার সংকলন ‘সোনালী ডুয়ার্স’ প্রকাশিত হয়েছে শিলিগুড়ি বইমেলায়, প্রত্যেক কবিতার সঙ্গে রঙিন ফটোগ্রাফ, ভাবনায় ও কলেবরে অভিনবত্বের দাবি রাখে। বইটি কিনতে পাওয়া যাবে আড্ডাঘর কাউন্টার থেকেও।

পুলিশ চাইলে পাহাড়ের বন্‌ধ একবেলাও স্থায়ী হয় না !

হাংরি রিপোর্টার

গত আশির দশকের গোড়া থেকেই শুরু হয় উত্তরবঙ্গের নিজস্ব দৈনিক পত্রিকা। একে একে বাংলা, হিন্দি এবং নেপালি। আজ সবকটিই সুপ্রতিষ্ঠিত। তবে শুরুটা সহজ ছিল না মোটেই। আর শুরুর আগের প্রস্তুতিপর্ব ছিল সত্যিই আরও কঠিন। সেই মোক্ষম সময়ে ডুয়ার্সের সংবাদ-সংগ্রাহক যে তরুণটি জান লড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর ক্লান্তিহীন পরিশ্রম বিফলে যায়নি। তিনিই ছিলেন উত্তরের সাংবাদিকতার প্রধান মুখ। **তুষার প্রধান**। ওরফে মনোজ রাউত। গত চার দশক ধরে তাঁর ঝুলি ভরতি হয়েছে অভিজ্ঞতায়, বহু নামী মানুষের সান্নিধ্যে-সাক্ষাৎকারে। উত্তরের নতুন প্রজন্মের সাংবাদিকরা তাঁর নাম ও কাজের সঙ্গে সম্যক পরিচিত নন। 'এখন ডুয়ার্স'-এর পাতায় শুরু হল সেই অনাদৃত কলমচির সাংবাদিক জীবনের অজানা কাহিনি। সঙ্গে থাকছে অনেক দুর্মূল্য ছবি।

তেনজিং নোরগের মতো জ্যোতি বসুও একটা সময় আমাকে নেপালিই ভাবতেন। দার্জিলিঙে সুবাস ঘিসিঙের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের মোকাবিলায় ঘিসিং-ঘনিষ্ঠ যাদের গ্রেপ্তারের তালিকা করিয়েছিলেন বসু, তাতে আমারও নাম ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত গ্রেপ্তার হতে হয়নি।

বন্ধুদের মধ্যে গৌতমেন্দু রায় বিশ্বাস করে সংবাদ মূলত খাদ্য। খুব বিশ্বাস করে। আমার সেই কবি বন্ধু গৌতমেন্দু রায় পরবর্তীতে সরকারি চাকরি পেয়ে যাওয়ায় ওকে আর সেভাবে খবরকে খাদ্য হিসেবে পরিবেশন করার কাজ করতে হয়নি। কিন্তু আমি যে সাংবাদিকই থেকে যাব— এ জ্বালা যে কী জ্বালা! লিভারের প্রতিটি মোচড়েই অনুভব করে চলেছি তা। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। জীবন দিয়ে এ কথার মর্মার্থ অনুধাবন করে চলেছি পায়ে পায়ে। এই মিঁয়ার ওই চক্কর থেকে আর মুক্তি নেই। তাই নিজের সংবাদপত্র যাপনকথা লিখতে গেলেও প্রতি পদক্ষেপে দুর্নীতির মামণিরা পা টেনে ধরবেই, ধরবে। বলবে, হেথা নয় হেথা নয়, অন্য কোনওখানে।

যেমন ক'দিন আগে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে খুব হাসছিল দেশ। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভোটের মাধ্যমে জনমত যাচাই হওয়াকে ঘিরে এত হাসাহাসি, বক্রোক্তির কারণ অনুসন্ধানে নামা গেল। দেখা গেল, একটি রাজ্যের আমজনতাকে ঘিরে সারা দেশ জুড়ে ঔৎসুক্য। হাতে হাতে যে তথ্য পেলাম, তা এইরকম— এই রাজ্যে পুরনো দল ছেড়ে নতুন দলে আসা বিধায়কেরা একেকজন ভোটের ফল বেরনোর অনেক আগেই নাকি দু' কোটি টাকা করে পেয়ে গিয়েছিলেন। তারপর শোনা গেল, এরকমই একজন বিধায়কের বাবা ভোটে দাঁড়াবেন ঘোষণা দিতেই রাতারাতি ৫০ লাখ টাকা পেয়ে গেলেন। নোটবন্দী হয়ে গেলেন ভোট-কাঙাল সেই 'জ্যেঠু'। অন্য আর এক জনের কথা বলি। গতবার বিধায়ক ছিলেন, এবারও তাঁর বিধায়ক হওয়া ছিল অবধারিত। কিন্তু ঘরবন্দী হয়ে গেলেন সেই গোপালকাকা। পেয়ে গেলেন তিন কোটি। তবে গোপাল যেহেতু সুবোধ ব্যক্তি, তাই নিজের জন্য শুধু নয়, আরও একশো কর্মীর প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। দল ছেড়ে আসা বিধায়করা আরও অনেক কিছু পেয়েছেন। যেমন ফুল ফোটাতে হলে যত গাড়ি চাই, যত ফ্লেক্স, ব্যানার, পোস্টার চাই— সব।

জলপাইগুড়িতে সুবাস ঘিসিঙের সঙ্গে তুষার প্রধান

কালিম্পঙে ছত্রে সুব্বার (মাঝখানে) সঙ্গে তুষার প্রধান

হাজার মানুষকে খাওয়ানোর জন্য যত মাংস কাটার দরকার, তত কাটতে বলা হয়। এলাকার সব মানুষকে নিমন্ত্রণ করতে বলা হয়। বিয়েতে নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়ন সারতেই নাকি পাঁচ লাখ টাকার মতো খরচ করে ফেলে সেই রাজনৈতিক দল। বিয়েতে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে সপার্ষদ হাজির হয়ে যান স্বয়ং মসীহাও।

এসব তথ্য হাওয়ায় ছুটেছিল। পরে জানা গেল, ভোট উৎসবের সুবাদে নাকি রাজ্যের দুটি বাংলা সংবাদপত্রের একটি তিন কোটি, অন্য একটি দু কোটি টাকা কামিয়ে নিয়েছে। ভোটের দিন পর্যন্ত বহু সাপ্তাহিক, দৈনিক কাগজ প্রতিটি ইস্যুতে অন্তত ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা করে বিজ্ঞাপন পেয়েছে। রাজ্যের রাজধানী শহরে ১০ ফুট বাই ১৫ ফুট ঘরের মধ্যে বসে দলীয় প্রচারকরা সাধারণ মানুষের মোবাইল ফোনকে হোয়াটস অ্যাপ, ফেসবুক সহ রকমারি বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত করে কেল্লা ফতে করে দিয়েছেন। রিকশা শ্রমিক, গৃহ পরিচারিকা, স্বামী পরিত্যক্তা, নির্মাণ শ্রমিক— এরকম ঘর বেছে বেছে ভোটার বাছাই করে মাসে মাসে পাঁচ হাজার টাকা করে দিয়ে গিয়েছে একটি রাজনৈতিক দল। এভাবে তাদের পাঁচ মাস টাকা দিয়ে যাওয়া হয়েছে। নতুন নতুন মোবাইল ফোন কিনে দেওয়া হয়েছে। আর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, নতুন সরকার এলে রাজ্যে চালু ৩৩টি ভাতার ক্ষেত্রে প্রতিটি ৭০০ টাকার জায়গায় ২০০০ টাকা করে দেওয়া হবে। হাইটেক প্রচার বলে কথা! তহবিলের নোটবন্দী টাকা ফিনিশ, অন্য সব দলের সব ভোটও ভ্যানিশ!

যুবকদের মোবাইল কিনে দেওয়া ছাড়াও মাসে মাসে দশ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়। টানা পাঁচ মাস, সাত মাস, কোনও কোনও ক্ষেত্রে দশ মাস। কয়েক হাজার মোটর বাইক দেওয়া হয়। কোথাও কোনও ঘটনা ঘটলেই বাইক বাহিনী পৌঁছে যাচ্ছিল ঘটনাস্থলে। এই বাহিনীর দাপটের কাছে সাধারণ মানুষ ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে থাকত। রা কাড়তে পারত না। বাইক বাহিনীর অধিকাংশ সদস্যই অঢেল মদের বোতল পেয়েছে। যত খেয়েছে, তত বিলিও করেছে। হাজার পঞ্চাশেক লোক দু'বছর ধরে এইভাবে গাছে ফল ধরানোর ফুল ফোটানোর কাজ করে গিয়েছে। ভোটের একমাস আগে ওই বাহিনীর সঙ্গে আরও দশ হাজার যুবক যুক্ত হয়। এই লোকেরা বিস্তারক, পৃষ্ঠা প্রমুখ হিসেবে কাজ করেন। পৃষ্ঠা প্রমুখ মানে ভোটার তালিকার একেক পৃষ্ঠায় যে ক'জন মানুষের নাম রয়েছে, তাঁদের জন্য একজন করে পৃষ্ঠা প্রমুখ নিয়োগ করা হয়েছিল। তাকে কেন্দ্র করেই বহিরাগতরা কাজ করছিলেন। কিছু মানুষকে টার্গেট করে প্রতিদিন যোগাযোগ রাখতেন। যার জেরে কার মেয়ে অসুস্থ, কার মেয়ের বিয়ে, কে সমস্যায় আছেন তাঁরা জেনে যেতেন। অসুস্থ মানুষের বাড়িতে অথবা হাসপাতালে গিয়ে পাঁচ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত পৌঁছে দিতেন। আর এই সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার ঘটনাকে ফেসবুক এবং সংবাদ বানিয়ে প্রচার করার মাধ্যমে প্রচার চালাতেন ঢালাওভাবে।

হাসপাতালে গিয়ে কোনও রোগীকে সাহায্য করার সময় আশপাশের শয্যার রোগীদের মুঠোভরে ৮-১০ হাজার টাকা দিয়ে আসতেন। এই ধরনের সাহায্য দেওয়ার ছবিকে প্রচারে তুলে ধরার সময় বুঝিয়ে দিতেন, এইরকম অসহায় অবস্থাতেও সরকার এঁদের কোনও সাহায্য করেনি। এভাবেই ভাবী মুখ্যমন্ত্রীকে জনতা জনার্দনের মসীহা বানানো হয়। আন্তর্জাতিক সীমানা ঘেঁষা এই রাজ্যের রাজধানী এলাকায় মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্য এক অসহায় বাবা সাহায্য তুলে বেড়াচ্ছিলেন। মেয়ের বাবা এভাবে অর্থ সংগ্রহে নেমেছেন শুনে কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা সেই বাড়ির কর্তার কাছে পৌঁছে যান। কত টাকা লাগবে মেয়ের বাবার কাছে জানতে চান ওঁরা। কয়েক

> এই রাজ্যে ভোটের মুখে পুরনো দল ছেড়ে আসার জন্য দলত্যাগী বিধায়করা পেয়েছিলেন ২ কোটি টাকা করে। এ তথ্য হাওয়ায় ছুটেছিল। পরে জানা গেল, ভোট উৎসবের সুবাদে রাজ্যের দুটি বাংলা সংবাদপত্রের একটি ৩ কোটি, অন্য একটি ২ কোটি টাকা কামিয়ে নিয়েছে। ভোটের দিন পর্যন্ত বহু সাপ্তাহিক, দৈনিক কাগজ প্রতিটি ইস্যুতে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা করে দিনে বিজ্ঞাপন পেয়েছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যে ছোট্ট রাজ্যে এবারকার ভোটদানে কোটি কোটি টাকা উড়ে গিয়েছে সেই কোটি কোটি টাকার হিসেব যাঁরা টাকা বিলি করেছেন, তাঁরাই মেলাতে পারছেন না। আর আমি তো সেখানে হরিদাস। এই হিসেব মেলানো নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন বনমন্ত্রী প্রয়াত পরিমল মিত্রের বাঘ গণনা সম্পর্কিত রসিকতার প্রসঙ্গ টানতেই পারি। বিধানসভায় তিনি বাঘের হিসেব দিচ্ছিলেন। ওই সময় কোনও এক বিধায়ক প্রশ্ন করেছিলেন, বাঘের সংখ্যা কীভাবে গোনা হয়। পরিমল মিত্র রসিকতা করে জবাব দিয়েছিলেন, 'একেকটা করে বাঘকে ডেকে ডেকে আনা হয়। তারপর ল্যাজ তুলে তুলে বনবিভাগের ছাপ্পা দেওয়া হয়।' বাঘেদের ক্ষেত্রে লেজ তুলে ছাপ্পা মারার এই বর্ণনাতে মন্ত্রীর উপস্থিত বুদ্ধি তারিফ পেয়েছিল ব্যাপক। কারণ, ছাপ্পা মারার পর বাঘেরা সব হাওয়া হয়ে গিয়েছিল। হিসেব মেলাতে কষ্ট হয়নি। বাঘেরা মন্ত্রীর কষ্ট লাঘব করার বিষয়ে একমত ছিল। আর এই রাজনীতিকরা টাকা রোজগার করার তাগিদে যদি সংশ্লিষ্ট অঙ্গে ছাপ্পা মারতে দিয়েও

থাকেন, তাঁদের ওই গোপন প্রদেশে ছাপ্পা খুঁজে বেড়ানোর দায় কে নেবে?

২

বয়স মাত্র ৫৯। তাই ষাটে বুড়িয়ে যাওয়া সাংবাদিক নই মোটেও। গত বছর অর্থাৎ ২০১৭ সালে পাহাড়ে, যখন বিমল গুরুংরা স্রেফ আস্ফালনকে খিল্লি করে বাংলা কাঁপাচ্ছিলেন, তখনও কিন্তু আমি 'আজকাল' কাগজের নিউজ এডিটর হিসেবে কার্শিয়াং, দার্জিলিং এবং গ্যাংটক চলে গিয়েছি। ২০১৪ সালের শেষ দিকে যেহেতু ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছিলাম, তারপর মাথা কেটে শান্ট অপারেশন হয়েছে, তাতে মাথায় বসা মেশিন বিগড়ে গিয়ে পথেঘাটে শারীরিক সর্বনাশ হতেই পারে। হ্যাঁ, এসব জানা সত্ত্বেও আমি পাহাড়ে ছুটে যাওয়ার ব্যাপারে নিজেকে নিবৃত্ত করতে পারিনি।

কার্শিয়াং আর কালিম্পং গিয়েছি মোটর সাইকেলে সওয়ার হয়ে। সমস্ত রাস্তায় আন্দোলনকারীরা যেখানে যেখানে দাঁড় করিয়েছে, সব জায়গায় নিজেকে সবজি বিক্রেতা হিসাবে পরিচয় দিয়েছি। কার্শিয়াঙের দিকে যাত্রা শুরুর পর পথে বহুবার আমাদের বাধা দিয়েছে তথাকথিত রাজনৈতিক দলের দুষ্কৃতীরা। কিন্তু থামাতে পারেনি। যেখানে খুকরি খোলা তরোয়ালের মতো হয়ে নামার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, সেখানে জেরার মুখে দার্জিলিঙে বন্ধ-বন্দি বাবার অসুস্থতার কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছি। কার্শিয়াঙে ঢোকার কিছুটা আগে এরকম এক জেরার মুখে আমি মাটিতে গড়াগড়ি করে কাঁদতেও বাকি রাখিনি। সহকর্মী সাংবাদিক গিরিশ মজুমদার সেদিন আমাকে মোটর সাইকেল চালিয়ে পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিল। গিরিশ ছিল গাড়ির 'চালক'। আর আমি ছিলাম ওর 'সাহস'। গিরিশ পরে শিলিগুড়ি ফেরার পর আমার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে জানতে চেয়েছিল, ওইভাবে করে মাটিতে গড়াগড়ি খাওয়া, বুক ফাটানো আর্তনাদের মতো কান্না পাওয়ানোর জন্য আমার মনের মধ্যে কী ধরনের অভিনয়-ইচ্ছে জাগাতে হয়েছিল।

এর একদিন বাদেই সিকিম যাব সিদ্ধান্ত নিয়ে সিকিমের নম্বর প্লেটযুক্ত একটা গাড়ি যাতায়াতের জন্য ছ' হাজার টাকা ভাড়ায় ঠিক করে ফেললাম। বন্ধের বাজারে সিকিম নম্বরের গাড়ি মানে ব্যাপারটা হল গিয়ে, এই গাড়ির লোকজন সিকিম রাজ্যেরই কোথাও না কোথাও থাকেন। কোনও কারণে শিলিগুড়ি, কালিম্পং, দার্জিলিং— এরকম কোথাও গিয়ে আটকে পড়েছিলেন। এখন সুযোগ মিলেছে। তাই নিজস্ব ডেরায় ফেরার পথে। তবে এদিন গাড়ি যেহেতু হাকিমপাড়ার বাড়ি পর্যন্ত এসেছিল, তাই স্ত্রীর বুঝতে সুবিধে হয়েছিল আমি ফের পাহাড়ি পথেই পাড়ি জমাতে চলেছি। স্বপ্না আমার গিন্নির নাম। ও আমার সঙ্গে এর আগে বহুবারই পাহাড়ে গেছে, কিন্তু সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার মতো এরকম পরিস্থিতিতে কখনও যায়নি। এমনিতেই টোকা মারলে পড়ে যেতে পারি, এরকম যখন আমার শারীরিক হাল, তখন স্বপ্না কিছুতেই আমাকে একা যেতে দেবে না বলে তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তারপর সেবক হয়ে তিস্তাকে ধারে ধারে রেখে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। তিস্তা বাজারের কাছাকাছি যাওয়ার পর একদল যুবক তেড়ে এল গাড়ি থামাতে বলে। গাড়ি থামার আগেই আমি ব্যাগ থেকে স্টেথোস্কোপ বের করে গলায় ঝুলিয়ে নিয়েছি। নেপালি ভাষায় ওদের বোঝালাম, গ্যাংটকে

"কার্শিয়াং আর কালিম্পং গিয়েছি মোটর সাইকেলে সওয়ার হয়ে। সমস্ত রাস্তায় আন্দোলনকারীরা যেখানে যেখানে দাঁড় করিয়েছে, সব জায়গায় নিজেকে সবজি বিক্রেতা হিসাবে পরিচয় দিয়েছি। কার্শিয়াঙের দিকে যাত্রা শুরুর পর পথে বহুবার আমাদের বাধা দিয়েছে তথাকথিত রাজনৈতিক দলের দুষ্কৃতীরা। কিন্তু থামাতে পারেনি। যেখানে খুকরি খোলা তরোয়ালের মতো হয়ে নামার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, সেখানে জেরার মুখে দার্জিলিঙে বন্ধ-বন্দি বাবার অসুস্থতার কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছি।"

একটি শিশুর খুব সিরিয়াস অবস্থা। স্বপ্নাকে দেখিয়ে বললাম, এই হল সেই শিশুর মা। শিশুটির বাবা হাসিমারায় ফৌজে রয়েছেন। সেরকম হলে এই মহিলা তার সন্তানকে নিয়ে এই গাড়িতেই শিলিগুড়ি ফিরবেন। হয়ত আমার স্টেথো ঝোলানো অভিনয় আমাকে অনেকটাই সুবিধে দিয়েছিল। কয়েক মাইল যাওয়ার পর ফের গোর্খাল্যান্ডীদের মিছিল। মিছিল এমনভাবে চলছিল, যেন পুরো রাস্তাটাই ওদের কিনে রাখা। এরকম দুটো মিছিলকে দেখলাম, পুলিশও খুব সমীহ করে চলছে। ফৌজের গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু মিছিল চলছে তো চলছেই। অ্যাম্বুলেন্সের পর অ্যাম্বুলেন্স এবং আরও বহু গাড়ি রাস্তায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছিল।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের আর সিকিম পুলিশের লোকজন যদি সে সময় ঠিক মতো রাস্তা তদারকির কাজ করতেন এবং রাস্তা খোলা থাকুক চাইতেন, তাহলে পাহাড়ে বন্ধ একবেলাও করা সম্ভব হত না। কিন্তু পাহাড়ি রাস্তায় বেরিয়ে কয়েকটা দিন ঘোরাফেরা করার পর আমাদের অভিজ্ঞতা হল, পশ্চিমবঙ্গ পুলিস গোর্খাল্যান্ডীদের জুজুর মতো ভয় পায়। আর সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী পবন চামলিং যেহেতু গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের সমর্থক তাই সিকিমে গোর্খাল্যান্ডীদের একটা অন্য ধরনের খাতির। সেদিন গ্যাংটক গিয়ে বিভিন্ন রাস্তা ঘুরেটুরে সরাসরি পৌঁছে গেলাম মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় যেখানে, সেই মিন্টোকগাঙে। মুখ্যমন্ত্রী দেখা করতে রাজি হবেন না, এরকম একটা আন্দাজ ছিলই। ভিজিটিং কার্ড পাওয়ার পর সিকিউরিটি মারফত বার্তা দিলেন, রাত ন'টার আগে সময় দিতে পারবেন না। রাতের মধ্যেই ফিরে আসার ব্যাপার ছিল আমাদের। তাই চিন সীমান্ত লাগোয়া একটা এলাকায় চক্কর কেটে শিলিগুড়ি ফেরার জন্য রওনা হয়ে গিয়েছিলাম।

তখন সায়েন্স সেকশনে ভরতির ব্যাপারটা ছিল ব্যাপক কড়াকড়ির। বাড়াবাড়ির! ক্লাস এইটে পড়ার সময় অঙ্কের টিচার ছিলেন পূর্ণেন্দশেখর রায়। তাঁর ঘোষণা ছিল, ৫০ শতাংশের নিচে নম্বর পেলে সায়েন্স বিভাগে ঢুকতে দেওয়ার কোনও সুযোগ থাকবে না। নাইন-টেন-ইলেভেনের অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন গুলে খাওয়া একজন টিচার বলতে যা বোঝায়, পূর্ণেন্দুশেখর রায় ছিলেন সেরকম একজন। আলিপুরদুয়ার এলাকায় যদি বাছাই শিক্ষকদের নিয়ে একটা আবক্ষমূর্তির প্রাঙ্গণ গড়ার কথা হয়, তাহলে পূর্ণেন্দুশেখর রায়ের মূর্তিটিকে প্রথম সারিতে বসানোর অনুরোধ থাকবে আমার। তো যেটা বলছিলাম, অষ্টম শ্রেণির চূড়ান্ত পরীক্ষা অঙ্কে সর্বোচ্চ ৭৩ পেলাম। অতএব সায়েন্স পড়া কে আটকায়? কিন্তু মুশকিল হল, ৫০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়ে যাওয়া বহু ছেলেই সায়েন্স বিভাগে ভরতি হয়ে গেল। অত ছেলে একসঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল করবে কোথায়, শিক্ষক কম থাকায় আরও নানা সমস্যা। তাই সায়েন্স বিভাগ থেকে ছাত্র ছাঁটাইয়ের জন্য ক্লাসে অঙ্ক, বিজ্ঞান বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়ার একটা ব্যবস্থা করেছিলেন পূর্ণেন্দুশেখর রায়। সেই পরীক্ষায় আমি বাদে সমস্ত ছাত্র ফেল করে গেল। একমাত্র আমি ৩৪ পেয়ে পাশ করলাম। পূর্ণেন্দুশেখর স্যার আমার হাতে খাতা তুলে দেওয়ার পর খাতাটা খানিকটা উল্টেপাল্টে নিয়ে ক্লাসের বেঞ্চে মাথা গুঁজে কাঁদতে শুরু করে দিলাম। স্যার, আমাকে বুঝিয়ে পারেন না, আমি তবু তো পাশ করেছি, কিন্তু বাকি একটি ছেলেও যে পাশ করেনি। বাকিদের অনেকের জন্য ৪, ৫ গ্রেস নম্বর দিয়ে দিয়ে সায়েন্সে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল।

ছবি: লেখকের সংগ্রহ থেকে

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

কোন্ অজানা আশংকায় ত্রাসে থম মেরে আছে পাহাড় ?

'দার্জিলিংয়ের ম্যালে বসে পুরো পাহাড়ের ছবি মেলে না।' বহু বছর আগে, সম্ভবত ঘিসিংয়ের আমলেই, এই ধরনের একটি আপ্তবাক্য শুনেছিলাম এক আন্তর্জাতিক সাংবাদিকের কাছে। সে সময় পাহাড়ে সদ্য সদ্য জ্বলে উঠেছে বিক্ষোভের আগুন, সমতলীদের হাত থেকে মুক্তির উদগ্র বাসনায় গোর্খাল্যান্ড নামের স্বায়ত্ত শাসন আন্দোলন। আজ যখন বাংলা দৈনিকের পাতায় দার্জিলিং ম্যালে টাট্টু ঘোড়ার পিঠে চেপে পর্যটকের হাসিমুখ ছবিসহ রিপোর্ট ছাপা হয়, 'দার্জিলিং-এ আবার পর্যটকের ঢল', তখন পাঠকের যদি মনে হয় পাহাড় আবার 'ডান্ডায় ঠান্ডা' হয়েছে, সেটাই গোটা পাহাড়ের সঠিক চিত্র তা বোধহয় ঠিক নয়। তার ওপর যখন কালিম্পং পাহাড় আজ পৃথক একটি জেলা, আলাদা একটি সত্ত্বা হিসেবে দ্রুত উঠে আসছে, সেখানে পাহাড় মানেই দার্জিলিং এমন ভাববার সত্যিই কোনও কারণ নেই। সেই সাংবাদিককে বহুদিন বাদে ফোনে ধরতে পেরেছিলাম গত মাসে, তিনি এখন পৃথিবীর অন্য প্রান্তে থাকেন, কিন্তু আমার প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন এইভাবেই।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা গাড়িতে চেপে রওনা হয়ে চলুন শুকনা, তিনধারিয়া, গিদ্দা পাহাড় হয়ে কার্শিয়াং। পথে ছবি তোলার জন্য দাঁড়ান, চায়ের দোকানে আলাপ জমান ড্রাইভারদের সঙ্গে। ঢুকে পড়ুন বাজারে টুকটাক জিনিস কেনার অছিলায়। ঘুপচি মোমোর দোকানে নির্বিকার কোনও মধ্যবয়সীকে চেপে ধরুন, প্রশ্ন করুন পাহাড়ে কি শান্তি ফিরেছে? বা ফিরবে মনে হয়? দিলারাম, টুং, সোনাদা, ঘুম যে কোনও জায়গাতেই দাঁড়াতে পারেন, বাজারেই পাবেন গ্রামীণ পাহাড়িদের। বুঝে নিতে চেষ্টা করুন তাদের চোখের ভাষা, অসুবিধা হবে না। জোড়বাংলো থেকে ডাইনে চলুন তাগদা, পেশক হয়ে মংপু, নেমে আসুন কার্শিয়াংয়ের পথে। দেখবেন সূর্য তখন তিস্তার ওপারে অস্ত যাচ্ছে। যে পাহাড়ে একটা চক্কর মারতে লাগে একটা গোটা দিন, অসংখ্য গ্রামীণ অন্তঃপুরের কথা ছেড়েই দিলাম, সেখানে দার্জিলিং ম্যালে বসে গোটা পাহাড়ের নাড়ি বোঝার চেষ্টা যে মুর্খামি ছাড়া আর কিছু নয় সে নিশ্চয়ই আর আলাদা করে বলে দিতে হবে না। তা সে পোড় খাওয়া সাংবাদিকই হোন কিংবা মানুষের মন পড়তে পারা কোনও দুঁদে গ্রাসরুট নেতা, কেউই আপাতত সেই অন্তঃপুরের খোঁজ করতে পারছেন না।

প্রতিবেশি
পি এনপিসি

'গোর্খাল্যান্ড' নামক শব্দবন্ধ বা ভাবনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে 'গুরুং' নাম। বাহিনী পাঠিয়ে নয়, এর জন্য চাই রাজনৈতিক মোকাবিলা।

সম্প্রতি দার্জিলিং পাহাড়েই এক চা-বাগানের ঝোপে লুকিয়ে রাখা একটি গাড়ি আবিষ্কার করেছে পুলিশ। তিরিশ লাখ টাকা দামের সেই বিদেশি গাড়ি নাকি যে কোনও পাহাড়ি দুর্গম রাস্তায় চলতে পারে অনায়াসে। গুরুং সাহেবকেও এক সময় কেউ কেউ দেখেছে সেই গাড়িতে চাপতে। যে গুরুংকে আজ কিছুতেই ধরতে পারছি না, সেদিন মদন তামাং হত্যার পরেও ধরতে পারিনি, সেই গুরুং সাহেব যে এই গাড়ি তাঁর গোপন চলাফেরায় ব্যবহার করেন সেটাই স্বাভাবিকভাবে প্রাথমিক অনুমান হবে সক্রিয় গোয়েন্দা পুলিশের। যদিও তাঁর চলাফেরার কোনও হদিশই নাকি পাচ্ছেন না তারা। ঘিসিং দমনে জ্যোতিবাবুর ঘনিষ্ঠ এক প্রাক্তন পুলিশ কর্তা তুলেছেন এক অদ্ভুত প্রশ্ন? অনেকেই এর পেছনে কোনও অদৃশ্য অঙ্গুলিহেলন দেখতে পাচ্ছেন, সে নিয়ে আগামীতে চাপানউতোর অবশ্যই জারি রাখবে মিডিয়া, কিন্তু সেইসব বিশেষজ্ঞরা কি একটু আন্দাজ করতে পারছেন যে দিনের পর দিন অধরা থেকে থেকে এই গুরুং-ই বছর কয়েক বাদে একদিন হঠাৎ 'পাহাড়ি ইঁদুর' জাতীয় গ্ল্যামারাস কোনও বিদ্রোহীর সম্মান পেতে শুরু করবেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আঙ্গিনায়? গোয়েন্দা বাহিনীর দক্ষতার যে করুণ নমুনা এখনই দেখতে পায় মানুষ, তাতে সেই দিন তৎকালীন বঙ্গ শাসকের ল্যাজেগোবরে দৃশ্য কি সমতলের বঙ্গবাসীর কাছে খুব একটা সুখকর হবে?

কালিম্পং ও দার্জিলিংয়ের শহুরে বুদ্ধিজীবীরা যে অভিমত ব্যক্ত করেন তার সুর মোটামুটি একই। পাহাড়ে প্রথম ব্যাটিংয়ে বিরাট কোহলিদের মতই খেলেছিলেন নতুন সরকার। পাহাড়ি সাধারণ মানুষ শান্তি ফিরে পেয়ে যখন সেই দুর্দান্ত ইনিংসকে কুর্নিশ জানাতে শুরু করেছিলেন, তখনই একান্ত ছোট্ট ভুলে প্রকাণ্ড ধাক্কা খেল শাসকের কনফিডেন্স। কোনও 'শুভাকাঙ্খী' পরামর্শদাতার অনভিজ্ঞ প্রস্তাবে সমতলের ঘাসফুল ফোটাতে চাইল পাহাড়ে। যার ফলে গোর্খাল্যান্ড-সেন্টিমেন্টে ফের সুড়সুড়ি লাগতে দেরি হল না, সেই সুযোগেই সশস্ত্র পথে সূচনা করবার মওকা ছাড়লেন না প্রায় ব্রাত্য-ফেকলু-অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাওয়া গুরুং। অর্থাৎ তাঁকে এইভাবে ফিরে আসার সুযোগ দেওয়ার ভুল হল আরও একবার। এবারের জোড়াফুলের ভুলের জোড়া কুফল— আবার ত্রাসের সঞ্চার হল পাহাড় জুড়ে এবং ত্রস্ত পাহাড়িদের শাসকের উপর ক্রমশ জন্মানো আস্থার স্তরে ক্ষয় ঘটল। পালিয়ে যাওয়া গব্বর সিং ফিরে এসেছে— এই ভয়ের ছায়া আজ সাধারণ পাহাড়িদের চোখে অতি স্পষ্ট ধরা পড়ছে, অস্বীকার করতে পারবেন না কেউ। দলনেত্রী মানতে বাধ্য হয়েছেন এই ভুল, যদিও তা সংশোধনের কোনও লক্ষণ এখনও চোখে পড়েনি।

পাহাড়ে সুবিধাবাদী মধ্যপন্থীদের হাতে ক্ষমতা ও অর্থের রাশ তুলে দেওয়ার অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা আপাতত ক'দিন উৎরে দেবে সরকারকে, রাজনৈতিক মহল তাই মনে করেন, যদিও সেটা পাহাড়ে অনুপ্রবেশের ব্যাকডোর ভাবলে আবার ভুল হবে। আর পাহাড়ের এই সুবিধাভোগী নেতারা জনসমর্থন যেমন পাবেন না, আর তেমনই শিবির বদলাতে এদের একবেলাও লাগবে না। কিন্তু আগামীকালের কথা ভাবতে হলে, পাহাড়ের দখল কায়েম রাখতে হলে গুরুংকে 'গুড়ুম' হতেই হবে, সেটা যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল। 'গোর্খাল্যান্ড' নামক শব্দবন্ধ বা ভাবনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে 'গুরুং' নাম। বাহিনী পাঠিয়ে নয়, এর জন্য চাই রাজনৈতিক মোকাবিলা। এ কাজের জন্য প্রয়োজন কোনও চাণক্যের, সঙ্গে গোয়েন্দা-আমলার অভিজ্ঞ ব্রিগেড। কলকাতা বা শিলিগুড়ির কোনও 'ছোকরা' নেতার কম্ম যে নয় সেটা, একথা মেনে নেওয়াটাই বোধ হয় বিজ্ঞতা হবে।

উত্তরায়ণ সমাজদার

নতুন তোর্সা বাঁধ-সরণি কি অবরুদ্ধ রাজনগরের হৃদযন্ত্র চালু রাখার প্রচেষ্টা?

প্রতিবেশি পিএনপিসি

গত তিন দশকে কোচবিহার শহর তথা পৌর এলাকা আয়তনে বাড়ে নি, কোনও উদ্যোগ চোখে পড়ে নি বা শোনা যায় নি। অথচ লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে জন সংখ্যা, ঘরবাড়ি, গাড়িঘোড়া। তার ওপর টোটো-র নিঃশব্দ বিপ্লব তো আছেই। শোনা যায় কেউ কেউ আওয়াজ তুললেও তা নাকি রে রে করে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। অবশেষে নাকি টনক নড়েছে, এক সময়কার 'সিটি অব বিউটি'কে বাঁচিয়ে তোলার প্রচেষ্টা 'ক্ষীণ হলেও' শুরু হয়েছে। তোর্সা বাঁধের উপর নয়া নির্মিত রাস্তা কি তারই প্রথম দৃশ্যমান উদাহরণ?

তোর্সা বাঁধ-সড়ক

কোচবিহারের কড়চা

দেবপ্রসাদ চাকী

সাড়ে সাত কিলোমিটার দীর্ঘ, প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত রাস্তার কাজ প্রায় সম্পূর্ণ। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন এখন সময়ের অপেক্ষা। এই সড়কপথ ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই সড়কের পশ্চিমদিকে প্রবাহিত তোর্সা নদী বর্ষাকালে ভয়ঙ্কর আকৃতি ধারণ করলেও বর্তমানে মজবুতভাবে নির্মিত এই বাঁধ-সড়ক ভবিষ্যতে শহরকে যে যথেষ্টই আগলে রাখবে তা হলফ করেই বলা যায়। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের অপেক্ষা না করেই কোচবিহার শহরের দক্ষিণাংশে তোর্সা সেতু অতিক্রম করে অনেক মানুষজনই আলিপুরদুয়ার, পুন্ডিবাড়ি কিংবা নিউ- কোচবিহারে যাবার লক্ষ্যে এই সড়ক ব্যবহার করতে শুরু করেছে। পক্ষান্তরে উত্তর দিকের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত মানুষজন খাগড়াবাড়ি, চৌপথী হয়ে এই পথ ধরে শহরের দক্ষিণে তোর্সা সেতু অতিক্রম করে গন্তব্যে পৌঁছাচ্ছেন। শহরের প্রাতঃভ্রমণকারীদের অত্যন্ত পছন্দ এই সড়কটি। বরিষ্ঠ নাগরিকদের কাছেও এই বাঁধ-সড়কটি জনপ্রিয়।

রাজতন্ত্রের অবসানে প্রজাতন্ত্রের আবহে সাতটি দশক অতিক্রান্ত হতে চলল। একদা রাজনগরী কোচবিহার ছিল শান্ত কোলাহলমুক্ত নিরিবিলি পরিবেশে বসবাসযোগ্য এক শহর বিশেষ। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের হাত ধরে আধুনিক শহরে রূপান্তরিত হওয়া কোচবিহার আজ বয়সের ভারে মাত্রাধিক জনসংখ্যার চাপে অনেকটাই ন্যুব্জ। অথচ শহরের বিস্তার সে অর্থে নাই বললেই চলে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে ও মাত্রাধিক পরিবহণের দাপটে শহরে পথচলা দায়। ঘুঘুমারি, শীলতোর্ষা এবং শেষে পুন্ডিবাড়ি — একে একে তোর্ষার উপর এই তিন সেতু কোচবিহার শহরকে বাকি দুনিয়ার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিল। কিন্তু কোচবিহার শহরের ওপর পরিবহণের চাপ ঊর্দ্ধমুখী, এমতাবস্থায় শহরের মধ্যে বিকল্প সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার ভাবনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে দেখা দেয়। বর্তমান নিবন্ধকার বিষয়টি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে তোর্সা নদীর বাঁধকে ব্যবহার করে বিকল্প সড়ক যোগাযোগ ভাবনা জন-সমক্ষে তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়।

অগস্ট ২০১৩, তৎকালীন পৌরপতি প্রয়াত বীরেন কুন্ডু তৃণমূলে যোগদানের অব্যবহিত পরেই স্থানীয় 'সিকন' কেবল নিউজ চ্যানেলে তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে এই কলমচি শহরের যানজট মোকাবিলায় পৌরপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিকল্প যোগাযোগ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কোচবিহার শহরের নিকটবর্তী হরিণচওড়া থেকে তোর্সা নদীর বাঁধের ওপর দিয়ে খাগড়াবাড়ি চৌপথী পর্যন্ত হালকা যানবাহন চলাচলের উপযোগী সড়ক নির্মাণের বিষয়টি উত্থাপন করেন। পৌরপতি উৎসাহের সঙ্গে প্রস্তাবটিতে সাড়া দেন। বিষয়টি বিবেচনার আশ্বাস দেন। পরের মাসে একই চ্যানেলে বিধায়ক তথা জেলার দন্ডমুন্ডের কর্তা বর্তমান মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষের সাক্ষাৎকারেও একইভাবে বাঁধের ওপর সড়ক নির্মাণের প্রস্তাবটির প্রতি তৎকালীন পরিষদীয় সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এরপর জানুয়ারি ২০১৪তে প্রাক্তন সাংসদ তথা বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী প্রসেনজিৎ বর্মণের বাসভবনে এক সন্ধ্যায় জেলার সেচ ও জলপথ দপ্তরের নির্বাহী বাস্তুকার সঞ্জিত সরকারের সঙ্গে আকস্মিকভাবে দেখা হয়ে যাওয়ায় কথায় কথায় বিষয়টি উত্থাপন করে বাঁধের ওপর সড়ক নির্মাণের প্রকৌশলগত দিকটি জানবার চেষ্টা করি। উনি এ বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাবই পোষণ করেন। হরিণচওড়া থেকে খাগড়াবাড়ি পর্যন্ত হালকা যানবাহন চলাচলের উপযোগী সড়ক নির্মাণে নির্বাহী বাস্তুকার সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেন।

জল গড়াতে শুরু করে। ওই বছর কোচবিহারের শেষ মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের শতবর্ষ উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে 'দি কুচবিহার ক্ষত্রিয় সোসাইটির' উদ্যোগে 'জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ জন্ম শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি' গঠিত হয়। ওই কমিটির সভায় তোর্সা নদী বাঁধের ওপর বিকল্প সড়ক গড়ে তুলে তা মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের নামে উৎসর্গ করার লক্ষ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার নিমিত্তে স্মারকপত্র প্রদানের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ১৫ ডিসেম্বর ২০১৪ শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির সভাপতি প্রসেনজিৎ বর্মণ মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে পাঠানো এক স্মারকপত্রে বিষয়টির উল্লেখ করেন। স্মারকপত্রের প্রতিলিপি আরও অনেকের সঙ্গে জেলাশাসককেও দেওয়া হয়। জেলার সেচ ও জলপথ দপ্তরে বিষয়টি নিয়ে শুরু হয় জোর তৎপরতা। এক্ষেত্রে নির্বাহী বাস্তুকারের ভূমিকা প্রশংসনীয়।

এসব সম্মিলিত প্রয়াসের ফল মিলেছে অবশেষে, তোর্ষার বাঁধ-সড়ক আজ কল্পনা নয় বাস্তব। শহরের বাঁধ সংলগ্ন হাজরাপাড়া, পাটাকুড়া, দেবীবাড়ি, মান্টুদাস পল্লী, গুঞ্জবাড়ি কিংবা শহর ঘেঁষা টাকাগাছ এলাকা এই সড়কের সৌজন্যে যথেষ্ট কৌলিন্য লাভ করেছে। এই সড়কের পাশে কোচবিহার রাজপরিবারের স্মৃতি বিজরিত কেশব আশ্রম (পড়ুন রাণিবাগান) শহরের উল্লেখযোগ্য পর্যটন ক্ষেত্র বিশেষ শহর সংলগ্ন তোর্সা নদীর ফেরিঘাট অর্থাৎ ফাঁসিরঘাট হয়ে শহরে আগত মানুষজনও এই পথকে ব্যবহার করে শহরের গুরুত্বপূর্ণ অনেক স্থানেই সহজে পৌঁছে যাচ্ছেন। সামগ্রিকভাবে রাজনগর কোচবিহারের যানজট মোকাবিলা ও বিকল্প সড়ক যোগাযোগ গড়ে তুলতে এই বাঁধ-সড়ক নির্মাণ ধরে নেওয়া যায় সময়ের দাবি। ভবিষ্যতে এই সড়ককে কেন্দ্র করে আরও নতুন নতুন পরিকল্পনা শহরের শ্রীবৃদ্ধিতে যে সহায়ক হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সাড়ে তিনশ বছরের রাজনগর কোচবিহারের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া তোর্সা এই সময়কালে গ্যালন গ্যালন জলরাশি বহন করেছে। বহু কিছুর সাক্ষী হয়ে আজও আপন গতিতে বয়ে চলেছে। তোর্সা দেখেছে রাজতন্ত্রের উত্থান-পতন, স্বাধীনতা হারিয়ে ইংরেজদের করদ মিত্র রাজ্য হতে, ভারতবর্ষের দ্বি-খণ্ডিত স্বাধীনতা পর্বে রাজ্যের নৃপতি মহারাজ জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ-বাহাদুরের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কোচবিহার রাজ্যকে ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে অঙ্গীভূত হতে। অতঃপর রাজতন্ত্রের অবসানে প্রজাতন্ত্রের হাত ধরে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে।

না, কোনও কৃতিত্বের দাবি করি না, একটি সম্মিলিত ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার এক ক্ষুদ্র অংশীদার হিসেবে ভেবে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি।

ইকো পর্যটনে যথেষ্ট সম্ভাবনাময় দুই দিনাজপুর

গৌড়কে পাহাড়-ডুয়ার্সের সঙ্গে জুড়ে দিতে পারত না?

প্রতিবেশি পি এনপিসি

দেশ ভাগের আগে ছিল অবিভক্ত দিনাজপুর জেলা। দেশ ভাগের পর তা হল পশ্চিম দিনাজপুর জেলা। তারও অনেক পরে পশ্চিম দিনাজপুর জেলা দুই ভাগে ভাগ হয়ে হল উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা। এই দুই জেলায় দীর্ঘ দিন থেকে পর্যটনের যে সম্ভাবনা সুপ্ত আকারে রয়েছে তা আজও সঠিক ভাবে প্রচারের আলোয় আসেনি। একই সঙ্গে এই দুই জেলার পর্যটন কেন্দ্রগুলির সংস্কার রক্ষণাবেক্ষণ সঠিকভাবে হয়নি। ফলে প্রচুর পরিমাণে পর্যটক এখনও এই দুই জেলার পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে তেমনভাবে ভিড় জমায় না। অথচ, আমার ধারণা, বিদেশ হলে উত্তরবঙ্গের অন্যান্য পর্যটন কেন্দ্রগুলির পাশাপাশি এই দুই জেলার পুরাণ ও ইতিহাস-বন্দিত পর্যটন কেন্দ্রগুলিতেও মানুষের ঢল নামত। আমরা আমাদের ইতিহাস সমৃদ্ধ স্থানগুলিকে খুব যত্ন করে যে সামলে রাখি না সে বদনাম আমাদের রয়েছে। ফলে আমাদের পর্যটকরাও যে খুব বেশি ইতিহাস সচেতন বা ঐতিহাসিক স্থানের প্রতি খুব বেশি পরিমাণে আগ্রহী, এমনটা একেবারেই নয়। কিন্তু এই দুই জেলার মোট সতেরোটি ব্লকের এমন একটি ব্লকও পাওয়া যাবে না, যেখানে ইতিহাস সমৃদ্ধ বা দর্শনীয় কোনও জায়গা নেই। দুই জেলার দিঘি, কালী পুজো, বিভিন্ন হস্তশিল্প, জমিদার বাড়ি প্রভৃতি নিয়েও আলাদা আলাদা করে পর্যটন বা প্যাকেজ টুর আগামী দিনে গড়ে উঠতে পারে বলে মনে হয়।

এই তালিকায় উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার ব্লকের দুর্গাপুর রাজবাড়ি থেকে শুরু করে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন ব্লকের তপন দিঘি যেমন রয়েছে তেমনই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর ব্লকের শমী বৃক্ষ থেকে আরম্ভ করে রায়গঞ্জের বাহিন গ্রাম পঞ্চায়েতের বাহিন জমিদার বাড়ি, পাঁচ ভাইয়া প্রভৃতি জায়গাও রয়েছে। গঙ্গারামপুরের বানগড় তো সকলেরই জানা। তার ইতিহাসও প্রসিদ্ধ। এখানে নিয়মিতই কিছু পর্যটক আসেন। সেখান থেকে কিছুটা দূরে, কুশমন্ডী ব্লকে মহিষ বাথান গ্রামের বিখ্যাত মুখা শিল্প বা খন গানের সুপ্রাচীন ইতিহাস, সেই গ্রামের পাশ দিয়ে মরে যাওয়া শ্রীমতি নদী, সেখানে প্রতিবছর আসা নানা জাতের পরিযায়ী পাখির ভিড় দর্শকদের টানতেই পারে। গড়ে উঠতেই পারে পর্যটন কেন্দ্র। তা স্থানীয় উদ্যোগে হলেও বা ক্ষতি কি? এতে তো স্থানীয়দেরও উপার্জন বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু এসবের তেমন প্রচার কোথায় হল। ওদিকে, গঙ্গারামপুরের পিরপাল গ্রামে ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির সমাধি আজও রয়েছে। ইতিহাসকে মাথায় রেখে এখানে শিক্ষামূলক ভ্রমণও তো হতে পারে। এমনকি

ধলদিঘি, গঙ্গারামপুর

স্থানীয় স্কুল কলেজগুলিও তো এখানে নিয়মিত শিক্ষামূলক ভ্রমণে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যেতে পারে। সেই উদ্যোগই বা কোথায়? আবার এই দুই জেলার প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য বড় বড় দিঘি। যা উত্তরবঙ্গের অন্য কোনও জেলাতেই সম্ভবত নেই। সম্প্রতি এই দিঘিগুলির কয়েকটিকে সংস্কার করা হচ্ছে। কিন্তু এই দুই জেলার দিঘি, তাদের ইতিহাস, দিঘিতে মৎস্য শিকার, বোটিং প্রভৃতির মাধ্যমেও একটা আলাদা ধরনের পর্যটনের মাত্রা যোগ করা যায়। যা অভিনবও হয়ে উঠতে পারে।

দুই জেলার পর্যটন নিয়ে কথা বলতে গেলে কুলিক পক্ষী নিবাসের কথা বলতেই হবে। কারণ দুই জেলার পর্যটন কেন্দ্রগুলির সম্পর্কে সব থেকে জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র এটিই। কিন্তু বহুল আলোচিত বলেই এর আলোচনায় পরে আসা হল। কুলিক পক্ষী নিবাসটি রায়গঞ্জ শহর ঘেঁষা। কুলিক নদীর ধারে মোট ছত্রিশ হেক্টর এলাকা জুড়ে এই পক্ষী নিবাসটি গড়ে উঠেছে। এখানে প্রতিবছর জুলাই মাস থেকে ইগ্রেট, নাইট হেরন, কর্মোনেন্ট, ওপেনবিল স্টর্ক প্রভৃতি প্রজাতির পরিযায়ী পাখি আসে। গত বছর এখানে প্রায় এক লক্ষ পরিযায়ী পাখি এসেছিল। ওপেন বিল স্টর্ক প্রচুর পরিমাণে আসায় ওই পরিযায়ী পাখির সংখ্যার বিচারে এটি এশিয়ার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। সম্প্রতি পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে, রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এখানে আরও উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুরেও বেশ কয়েকটি দিঘিতে প্রতি বছর পরিযায়ী পাখি আসে। সেখানেও পর্যটক টানার উদ্যোগ নেওয়া যেতেই পারে।

আবার ফিরে আসি ঐতিহাসিক ও প্রাচীনতার স্মৃতিমেদুর কিছু সম্ভাব্য পর্যটনের জায়গায়। অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার ইতিহাস যে বহু প্রাচীন তা সকলেরই জানা। পৌরাণিক কাল থেকেই এই এলাকার বেশ কিছু জায়গা যে বেশ সমৃদ্ধ ছিল তার বহু প্রমাণ ইতিহাসে রয়েছে। এখনও উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বহু এলাকায় পুকুর খুঁড়তে গিয়ে বা মাটি খুঁড়তে গেলে প্রাচীন মূর্তি উঠে আসে। এই মূর্তিগুলির মধ্যে বিষ্ণু, শিব, হর-পার্বতী, মনসা, লক্ষ্মী, সরস্বতী সহ আরও নানান দেবদেবী রয়েছে। অধিকাংশ মূর্তিগুলির শিল্প নৈপুণ্য অসাধারণ। এই সমস্ত উদ্ধার হওয়া মূর্তির বেশ কিছু রয়েছে বালুরঘাট মিউজিয়াম, বালুরঘাট কলেজ মিউজিয়ামে। এছাড়াও জেলার বেশ কিছু থানায় এই ধরনের উদ্ধার হওয়া মূর্তি রয়েছে। যা এই ভূ-খণ্ডের প্রাচীনতা, ইতিহাস সমৃদ্ধতা, শৈল্পিক উৎকর্ষতার উজ্জ্বল প্রমাণ। কোনও ইতিহাস সচেতন ব্যক্তি বা পর্যটক একবার ওই দুই মিউজিয়ামে ঢুকলে সহজে বের হয়ে আসতে পারবেন না। এই অঞ্চলের সুপ্রাচীন ইতিহাসের অনেকটাই যেন এখানে লুকিয়ে রয়েছে। কিন্তু সঠিক প্রচারের আলোয় না আসা ও পর্যটকদের মধ্যে নিজেদের ইতিহাসের প্রতি তেমন টান না থাকার কারণেই ওই জায়গাগুলি আজও তেমন পর্যটক টানতে সক্ষম হয় না।

উদ্ধার হওয়া প্রাচীন মূর্তি

"একা গৌড় পর্যটনে খুব একটা কিছু করে উঠতে পারছে না, চেষ্টা যদিও চলেছে। যেমন পাহাড় ছাড়া ডুয়ার্স একা পেরে উঠবে না, ঠিক তেমনই গৌড়কেও জুড়ে দিতে হবে উত্তরের পাহাড়-ডুয়ার্সের সঙ্গে। আর এই জুড়ে দেওয়ার কাজটি করতে পারে দুই দিনাজপুর তার অব্যবহৃত পর্যটন সম্ভাবনা দিয়ে। খুব কঠিন কাজ বলে মনে হয়? নিঃশব্দে সবার অলক্ষ্যে উত্তরের রূপকার হওয়ার এই সুযোগ কি ছেড়ে দেবেন স্যর?"

দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি ব্লকের ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক চেক পোস্টও একটি দর্শনীয় স্থান। যেখান দিয়ে প্রতিদিন কয়েক হাজার লরি পণ্য নিয়ে যাতায়াত করে। আবার দুই দেশের মানুষ ইমিগ্রেশন চেক পোস্ট পার হয়ে দুই দেশে যাতায়াত করে। এদিকে, উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ, হেমতাবাদ, করণদিঘি, গোয়ালপোখর, ইসলামপুরেও বেশ কিছু পুরানো মন্দির, মসজিদ, জমিদারবাড়ি সহ আরও বেশ কিছু দর্শনীয় স্থান রয়েছে। যেগুলির সঠিক সংরক্ষণ, প্রচার হলে আগামী দিনে এই সব জায়গাতেও অনেক দর্শক টানা সম্ভব।

এছাড়াও এই দুই জেলা জুড়ে বেশ কয়েক জায়গায় বিখ্যাত কিছু কালী পুজো হয়। তার মধ্যে কয়েকটি কালী প্রতিমা তার বিরাট বড় আকারের জন্য বিখ্যাত। যার মধ্যে দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট ব্লকের বোল্লা কালী, কুমারগঞ্জ ব্লকের চাঁদগঞ্জের সাড়ে চোদ্দ হাত কালী, হিলির চোদ্দ হাত কালী প্রভৃতি রয়েছে। রয়েছে বালুরঘাটের সুপ্রাচীন বুড়া কালী মাতার মন্দির, চক ভবানী মন্দির। আবার রায়গঞ্জের বন্দর আদি কালীবাড়ির কালী মন্দির, কালিয়াগঞ্জের বয়রা কালী মন্দির। বিদেশ ছেড়ে দিন, অন্য কোনও রাজ্য হলেই এই দুই জেলার কালী পুজো, কালী মন্দির, তার ইতিহাস প্রভৃতি নিয়েও আলাদা করে প্যাকেজ টুর গড়ে উঠত। কিন্তু আমরা কেন তেমন করে ভাবতে পারি না? কিন্তু আগামী দিনে, আগামী প্রজন্মে এমনটা যে ভাবা হবে না তা-ই বা কে বলতে পারে?

পর্যটন মন্ত্রী সাহেব, আপনি এমন কিছু করে দেখাতে পারেন না? গঙ্গা পেরিয়ে এপারে এলেই যে এলাকা শুরু হয়ে যায়, যা আপনার জ্ঞান হওয়া ইস্তক পিছিয়ে থাকা দেখে আসছেন, সেখানে পর্যটন ছাড়া অন্য শিল্প হতে পারে না এই কঠিন বাস্তব আপনার চেয়ে ভাল কে জানে? শুনেছি সরকার আপনাকে কিছু আর্থিক বরাদ্দও দেয়। একা গৌড় পর্যটনে খুব একটা কিছু করে উঠতে পারছে না, চেষ্টা যদিও চলেছে। যেমন পাহাড় ছাড়া ডুয়ার্স একা পেরে উঠবে না, ঠিক তেমনই গৌড়কেও জুড়ে দিতে হবে উত্তরের পাহাড়-ডুয়ার্সের সঙ্গে। আর এই জুড়ে দেওয়ার কাজটি করতে পারে দুই দিনাজপুর তার অব্যবহৃত পর্যটন সম্ভাবনা দিয়ে। খুব কঠিন কাজ বলে মনে হয়? নিঃশব্দে সবার অলক্ষ্যে উত্তরের রূপকার হওয়ার এই সুযোগ কি ছেড়ে দেবেন স্যর?

আত্রেয়ী সান্যাল

মুকুলে ছেয়ে যাওয়া মালদহ

এবার রেকর্ডের আশায়

প্রতিবেশি পি এন পি সি

মালদহ জেলার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ঐতিহ্যমোড়া এক সোনালি ইতিহাস। সেই ইতিহাসের ঘ্রাণ আজও পাওয়া যায় গৌড় বা আদিনায় গেলে। সেসব ছাড়াও মালদার আর এক দর্শনীয় জায়গা হল সাগরদিঘি। মালদায় গিয়ে প্রথমবার বল্লাল সেনের আমলের প্রকাণ্ড আকারের সাগরদিঘি দেখে রীতমত মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলাম। সেদিন কাগজে পড়লাম, সেই সুবিশাল দিঘির চারপাশে পর্যটকদের বসার জায়গার পাশাপাশি তৈরি করা হবে অতিথি নিবাস। দিঘির পাড়ে হবে বিদ্যুতায়নের কাজ।

যাঁরা সাগরদিঘিতে কখনও এসেছেন তাঁরা জানেন, ইংলিশবাজার থেকে কিমি সাতেক দূরেই এশিয়ার বৃহত্তম মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র এই সাগরদিঘির অবস্থান। সেখানে একটি ইকো টুরিজম পার্ক তৈরির প্রস্তাব ইতিমধ্যেই নাকি সিলমোহর দিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের মৎস্যমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বড় সাগরদিঘি সরেজমিনে দেখে গিয়েছেন। তাঁর দপ্তর থেকেও মিলে গিয়েছে ছাড়পত্র। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

বিশ্ব পর্যটন মানচিত্রে প্রাচীন বাংলার রাজধানী গৌড়, পান্ডুয়া ও জগজ্জীবনপুরের বৌদ্ধবিহারকে তুলে ধরতে সোশাল সাইটে একটি ডকুমেন্টরি ফিল্ম প্রকাশ করেছেন মালদহ জেলা প্রশাসন। সেখানে এশিয়ার বৃহত্তম এই সাগরদিঘি মৎস্য প্রকল্পের কথাও বলা হয়েছে। জানান হয়েছে, দেশ ও বিদেশের পর্যটকদের মালদহমুখী করতে পুরো সাগরদিঘি চত্বর সাজিয়ে তোলা হবে। করা হবে সৌন্দর্যায়ন। উন্নত করা হবে যোগাযোগ ব্যবস্থা। সেই সঙ্গে পর্যটকদের স্বাচ্ছন্দ্যে আরও বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছে মালদহ জেলা প্রশাসন।

শুধু সাগরদিঘির সৌন্দর্যকরণই নয়, পর্যটকদের মালদহে আসার উপকরণ বাড়াতে অন্য কিছু প্রকল্পও নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে গঙ্গা ও ফুলহার নদীর ভূতনি সমেত একাধিক চর ঘিরেও পর্যটন সার্কিট গড়ে তোলা। এই প্রকল্প বাস্তবের মুখ দেখলে লঞ্চ বা নৌকায় চড়ে ফারাক্কা থেকে মানিকচক, ভূতনি চর, নারায়ণপুর চর, গদাই চরের মতো বিভিন্ন নদীচর ঘুরে দেখতে পারবেন মালদায় বেড়াতে আসা পর্যটকেরা। এই চরগুলির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেমন মুগ্ধ করবে মানুষকে পাশাপাশি সুযোগ হবে এই চরের বাসিন্দাদের জীবনযাত্রা সচক্ষে দেখার।

এই চরগুলির মধ্যে একটি হল গদাইয়ের চর। সেই চরে শুধু প্রকৃতির সমাহারই যে একমাত্র আকর্ষণ তা নয়, রয়েছে ঐতিহাসিক নিদর্শনও। গদাইয়ের চর ঝাড়খন্ডের রাজমহল সংলগ্ন। সম্রাট আকবরের আমলে বাংলার রাজধানী ছিল এই রাজমহল। সেই সময়ের বহু প্রাচীন নিদর্শনও রয়েছে এখানে। শুধু তাই নয় এখানে আছে আকাশে ডানা মেলে উড়ে আসা পরিযায়ী পাখির অবর্ণনীয় দৃশ্যসুষমা। রংবেরঙের পরিযায়ী পাখির ছবি তুলতেও প্রচুর পর্যটক আসেন এখানে। মানিকচকে গঙ্গায় শুশুক, ঘড়িয়ালেরও দেখা পাওয়া যায়। ভ্রমণবিলাসী মানুষ যে এমন জায়গায় এসে হাতে চাঁদ পাবেন তাতে সন্দেহ নেই।

এই সমস্ত কারণে পর্যটন দপ্তর মনে করছে গঙ্গার চরগুলি নিয়ে একটি পর্যটন সার্কিট করা যেতেই পারে। ইতিমধ্যেই এ নিয়ে জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের মধ্যে বৈঠক হয়েছে। সেই বৈঠকে সদর্থক বার্তা পাওয়ার পর গঙ্গার চরগুলি নিয়ে একটি প্রস্তাব পর্যটন দপ্তরে পাঠিয়েছে জেলা প্রশাসন। কাজেই অনুমান করে নিতে অসুবিধে হয় না, এই সাগরদিঘি ও গঙ্গার চরগুলি নিয়ে পর্যটন সার্কিটের কাজ

মালদার আমবাগান

হলে রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে মালদার গুরুত্ব বেড়ে যাবে আরও।

মালদহ নিয়ে যখন কথা হচ্ছে তখন আমের প্রসঙ্গ আসবে না সেটা হতে পারে না। মালদহের অনুষঙ্গে আমের কথাই তো মনে পড়ে প্রথমে। আর আমের সময় তো এসেই গেল প্রায়। কেননা শীত গিয়ে গরম আসছে। যথারীতি মুকুলে মুকুলে ছেয়ে গিয়েছে আমগাছ। তবুও সংশয়ে দীর্ণ হচ্ছেন মালদার আম চাষিরা। কেননা বৃষ্টি নেই। রোদের দাপটে গুটি বেরোবার আগেই যদি গাছে পুড়ে যায় মুকুল? কেননা চৈত্র আসতে না আসতেই রোদের তাপে বাদামি হয়ে গিয়েছে মুকুলের রং। তাঁদের আশঙ্কা বৃষ্টি না হলে ঝরে পড়ে যাবে সমস্ত মুকুল। কাজেই বরুণদেবের কৃপা ছাড়া উপায় নেই। এ বছর মালদার প্রায় নব্বই থেকে পঁচানব্বই শতাংশ গাছে মুকুল এসেছে যা সাম্প্রতিক অতীতে হয়নি। আম রসিকরা আশায় বুক বাঁধছেন এবার বুঝি সস্তায় মিলতে পারে আম। যা মুকুল এসেছে তার চল্লিশ শতাংশ টিঁকে থাকলেই রেকর্ড ফলন হবে এবার।

এবার শীত পড়েছিল জব্বর। কাজেই শীতের দাপট আর ঘন কুয়াশার প্রলম্বিত ঘনঘটার পর আশংকার একটা মেঘ তৈরি হয়েছিল এবছর। কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়া সরে যেতেই মুকুলে ভরেছে মালদহের আমবাগান। তবে গরমও পড়েছে জোর। এই চৈত্রেই ঠা ঠা পড়া রোদে ক্রমশ পুড়ে যাচ্ছে সেই মুকুল। মুকুলে জল স্প্রে করতে প্রচুর খরচ হয়ে যাচ্ছে গরিব চাষিদের। সকলের তো সেই সামর্থ্য নেই। তাই আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন এখানকার আম চাষিরা। দু'-একটা বৃষ্টি দরকার। একটু বৃষ্টি হলেই আমের গুটির ডগা শক্ত হয়ে উঠবে। মুকুল ঝরে পড়ার ভয় তখন আর থাকবে না।

এই প্রসঙ্গে মালদহের জেলা উদ্যান পালন দফতরের বিশেষজ্ঞরা দেখলাম বলেছেন, অতিরিক্ত গুটি ঝরে না পড়লে আমের আকার ছোট হয়। আমের গুণগত মান ও ফলন কমে যায়। তবে প্রতিটি মুকুলে একটি করে গুটি থাকলেও আমের ব্যাপক ফলন হবে। আর একটা ব্যাপার আছে। আম বাগানের মাটিতে রসের অভাব হলেও আমের গুটি ঝরে যায়। এ জন্য গাছের চারপাশে নিয়মিত জল দিতে হবে। বৃষ্টিপাত না হওয়া পর্যন্ত ১৫ দিন অন্তর জল দিলেই সমস্যা থাকবে না। সেই সঙ্গে দরকার আমবাগান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও খোলামেলা অবস্থায় রাখা। তাহলেই এবার রেকর্ড ফলন হবে আমের। তা-ই যেন হয়। আমরা, যারা আমবিলাসী ও আমরসিক, তারা এখন সেই সোনালি দিনের প্রতীক্ষায়।

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

জলপাইগুড়ি থেকে জমতে পারে না দেবস্থান পর্যটন?

উত্তরপক্ষ

প্রশান্ত নাথ চৌধুরী

মার্চ ২০১৮ সংখ্যায় বাপি ঘোষ 'দেবী চৌধুরানি মন্দির আজও উন্নয়নের অপেক্ষায়' শিরোনামে এক তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করেছিলেন। সেই সংখ্যায় শুভ্র চট্টোপাধ্যায়ের দুরন্ত একটা লেখাতেও আছে সেই মন্দিরের কথা। লেখা ছাপতে যাওয়ার সময় সম্ভবত পত্রিকার সম্পাদক জানতেন না, গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ রাতে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে সেই মন্দির পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার চুরি বা মদনমোহনের বিগ্রহ চুরির তদন্ত হয়, চোর ধরা পড়ে না, তারপর রেপ্লিকা স্থাপন করা হয়, তারপর জনগণ ভুলে যায়। শান্তিনিকেতনে ভিড় বাড়ে, উত্তরায়ণে হুজুগে মানুষ যায়, পৌষমেলায় বা রাসমেলায় মানুষের সমুদ্রে সবাই ভুলে যায় সেসব চুরির লজ্জাকর কাহিনি। আমাদের এবারের আলোচনা আসলে উত্তরবঙ্গের পর্যটনে মন্দির মাহাত্ম্য কীভাবে সংযোজন করা সম্ভব, তাই ডিটেকটিভ গল্পের কোনও অবকাশ নেই।

> 'বহুদিন ধরে একটা ভাবনা লালিত হচ্ছিল মনের গভীরে একটা শব্দবন্ধ 'দেবস্থান ডুয়ার্স' ভ্রমন সার্কিট। উত্তরবঙ্গের উত্তরপ্রান্তের মন্দিরগুলি স্থাপত্যের আঙ্গিকে বিশালত্ব বা নান্দনিকত্বের দাবি করে না ঠিকই। সাদামাটা স্থাপত্য তবুও অবলীলায় সর্বধর্মকে মমতায়, সহিষ্ণুতায় বুকে টেনে নিয়েছে ডুয়ার্সের মন্দিরগুলি। ডুয়ার্সে এখন সারাবছর পর্যটকদের আনাগোনা।'

একটা ভাবনা লালিত হচ্ছিল মনের গভীরে একটা শব্দবন্ধ 'দেবস্থান ডুয়ার্স' ভ্রমন সার্কিট। উত্তরবঙ্গের উত্তরপ্রান্তের মন্দিরগুলি স্থাপত্যের আঙ্গিকে বিশালত্ব বা নান্দনিকত্বের দাবি করে না ঠিকই। সাদামাটা স্থাপত্য তবুও অবলীলায় সর্বধর্মকে মমতায়, সহিষ্ণুতায় বুকে টেনে নিয়েছে ডুয়ার্সের মন্দিরগুলি। ডুয়ার্সে এখন সারাবছর পর্যটকদের আনাগোনা। তাই মনে হয়েছিল, ঘন সবুজ চা বাগান, ঝরনা-নদী, গভীর বন, পাখির ডাক আর বন্যপ্রাণ— আর তার সাথে 'দেবস্থান' নতুনত্ব কিছুটা আনত তো বটেই। ২৪শে ডিসেম্বর ২০১৭ তে জলপাইগুড়ি আড্ডাঘরে বন্ধুবর দেবপ্রসাদ রায় লিখিত 'ডুয়ার্স থেকে দিল্লি' এবং অনুজ প্রতিম গৌতম

পুড়ে যাওয়ার আগে দেবী চৌধুরানি মন্দির

চক্রবর্তীর 'চায়ের ডুয়ার্স কী চায়?' পুস্তক দুটির স্থানীয় আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে ও আলোচনা সভায় কোচবিহার থেকে এসেছিলেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান ও বিধায়ক শ্রী মিহির গোস্বামী। সেদিন ওঁকে 'দেবস্থান ডুয়ার্স' সার্কিটের কথা বুঝিয়ে বলি। উনি আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং একটা প্রস্তাব প্রস্তুত করার কথা বলেছিলেন। তাই আর বিলম্ব করিনি, জলপাইগুড়ি দিয়েই শুরু হোক প্রথম পর্ব।

গত জানুয়ারির হিমেল সকালে আমরা কয়েকজন মিলে লম্বা ড্রাইভ জমালাম। সঙ্গে প্রচুর রান্না করা ও শুকনো খাবার-পানীয়। স্টিয়ারিং-এ সাদা (ড্রাইভার) থাকলে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। পাশে আমি নেভিগেটার। সাদার মতো এমন হতচ্ছাড়া বাউন্ডুলে স্টিয়ারিং-এ কিন্তু শান্ত ধীরস্থির। প্রথমে কদমতলা থেকে তিন কিমি দূরে জাতীয় সড়কের ধারে গোশালা মোড়ে দেবী চৌধুরানির কালীবাড়ি, সাথে পঞ্চবটী। গাছ গাছলায় ভরা, সন্ধ্যার পরে গা ছমছম করে। করলার উপনদী রুকরুকা-র ধারে। কিছুদিন আগে একদিন বিকেলে সপরিবারে মন্দিরে যাই পুজো দিতে। পুরোহিত খুব তাড়াহুড়ো করে পুজো দিলেন, আমরা দেবীপ্রণাম করার আগেই ঠাকুরমশাই মন্দির ত্যাগ করে চলে গেলেন। অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছিলাম সেদিন। ইতিমধ্যে পুরোহিত মশাইয়ের সহচর ফিরে যাচ্ছিলেন, তাকে পাকড়াও করলাম। জানতে চাইলাম পুরোহিত মশাইয়ের এই ব্যবহারের কারণ। উত্তর শুনে আমরা স্তম্ভিত। সেদিনই দুপুরে পুরোহিত মশাইয়ের স্ত্রী ভোগের জন্য তরকারি কাটছিলেন, হঠাৎ করে তাকে গোখরো সাপে ছোবল দেয়, তিনি তখন সদর হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছিলেন, তাই চিন্তিত স্বামীর এত তাড়া! শুনে অত্যন্ত লজ্জিত হলাম। অপরাধ স্খালনের জন্য কিছুদিন পর একদিন মন্দিরে এলাম, দেখা করলাম জীবন ফিরে পাওয়া পুরোহিত গিন্নির সঙ্গে। ওনাকে সব ঘটনা জানিয়ে হাত ধরে দুঃখ প্রকাশ করেছিলাম। চেহারায় ব্যবহারে আদর্শ বাঙালি গৃহবধূ। মাটির মানুষ। এবারে উল্টে উনিই লজ্জায় পড়লেন। একসঙ্গে ছবি তুলে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলাম সেদিন। মহাসড়কের পাশে অবস্থানের কারণে নিরন্তর ট্রাক-বাসের ভয়ানক শব্দ, অথচ অবাক কাণ্ড সেই শব্দ মন্দিরে পৌঁছায় না। পুজো সকাল, বিকেল ও সন্ধ্যা তিন বেলাতেই হয়। পুজোর উপকরণ শহর থেকে নিয়ে যেতে হবে। ঘুরে ফিরে বেশ কিছুটা সময় কাটানো যায়। কথিত আছে এখানে দেবী চৌধুরানি এসেছিলেন, যদিও অনেকে বলেন সেটা নিছকই জনশ্রুতি।

> মহাসড়কের বাম হাতের রাস্তায় ২৮ কিমি দূরে হুসলুডাঙ্গার মোড় থেকে গ্রামের পথ দিয়ে যেতে হবে জটিলেশ্বরের মন্দিরে। আনুমানিক তিনশ বছরের পুরনো এই শিবতীর্থ। পাথরের উপর খোদাই করা প্রাচীন কারুকার্য দৃষ্টিনন্দন। ১৬ মিটার দূরে সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির। গাছগাছালিতে ভরা। পরিবেশটি পূণ্যার্থী ও ভ্রমণার্থী সবার জন্যই মনোরম। মন্দির সংলগ্ন টলটলে জলের বিশাল পুকুরের পারে প্রাচীন বটগাছে পূণ্যার্থীরা মানত করে সুতো বাঁধেন

মন্দির থেকে বেরিয়ে হাইওয়ে পেরিয়ে উত্তরমুখি পথে ২০ কিমি দূরে রংধামালি ছাড়িয়ে কিছুটা রাস্তা। হালকা বনপথে বোদাগঞ্জ ফরেস্ট বিট অফিস পেরিয়ে বন সংলগ্ন অঞ্চলে সতীর একান্ন পীঠের অন্যতম ভ্রামরী দেবীর মন্দির। মাতা এখানে কালীরূপে পূজিতা। বহু পুণ্যার্থী প্রতিদিন দর্শনে আসেন, প্রসাদ গ্রহণ করেন। গত দশ বছরে একটা মন্দির যে কলেবরে এমন বৃদ্ধি পেতে পারে, যারা না দেখেছেন তারা বিশ্বাসই করতে পারবেন না। মন্দিরের সামনের ফাঁকা জায়গায় অনেকগুলো পুজো সামগ্রীর দোকান। মন্দিরের পাশেই দু-চারটে চায়ের দোকান বেশ চলছে। বেশ কয়েকজন মানুষ মন্দিরের কাজে নিযুক্ত। অমাবস্যা, পূর্ণিমা বা উৎসবের দিনগুলোতে বহু ভক্তের সমাবেশ হয়। গমগম করে চারপাশ। সারা মাঠ জুড়ে ভিড় করে নানারকম গাড়ি। প্রায় সন্ধ্যায় যুবক যুবতীরা জোড় বেঁধে আসে বিয়ে করতে। সঙ্গে দু-চারজন বন্ধু বান্ধব। বেশ কিছু দরদাম করার পর স্থির করা অর্থ মূল্য। মন্দিরে জমা করার পর দেবীর সামনে মন্ত্রোচ্চারণ, মালা বদল ও সিঁদুর দান করে বিয়ে হয়। মহিলা পূণ্যার্থী হাজির থাকলে উলুধ্বনিতে প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়। পুরোহিত লালবাবা সাদাসিধে মানুষ, উনিও আনন্দে মেতে ওঠেন। মন্দিরের পাশেই জোড়ালাগা যমজ উঁচু বট ও অশত্থ গাছ, মানত করে বহু মানুষ গাছে সুতো বাঁধেন।

পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া দেবী চৌধুরানি মন্দির

একই পথে ফিরে এসে রংধামালি মোড় থেকে নতুন রাস্তা ধরে ডান হাতে ১৮ কিমি গেলে বেলাকোবা বটতলা। এই নতুন রাস্তায় পথ চলা এক সুন্দর অভিজ্ঞতা। মসৃণ রাস্তা, একাধিক নতুন সেতু, গ্রাম ছুঁয়ে, সবুজ চা- বাগানের বুক চিরে এই বিকল্প পথ গিয়েছে শিলিগুড়ি। আকাশ পরিষ্কার থাকলে সারাটা পথে ডানপাশে থাকবে রূপোলি চাদরে মোড়া কাঞ্চনজঙ্ঘা। বটতলা থেকে আবার ডানদিকে ঘুরে ভাঙ্গাচোরা পথে এক-দেড় কিমি দূরে শিকারপুরের দেবী চৌধুরানি-ভবানী পাঠকের মন্দির। সপ্ত চাল-এর প্যাগোডাধর্মী এই মন্দিরের

সঙ্গে ছিল আড়াইশো বছরের এক মিথ। এই মন্দিরটি শিকারপুর চা-বাগানের এক পাশে, অবহেলাতেই পড়ে ছিল। এখানে কাঠের তৈরি ১১টি মূর্তি ছিল তার মধ্যে ছিল দেবী চৌধুরানি, ভবানী পাঠক ও তাদের সহচর-অনুচরদের মূর্তি। ১৯৬০ সনে অগ্নিকাণ্ডে শিল্পের এই সুন্দর কাজ পুড়ে যায়। পরে স্থানীয় শিল্পী মাটির মূর্তি বানিয়ে স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে পাশেই একটি কালী মন্দির স্থাপন করা হয় এবং নিত্য পুজোর ব্যবস্থা হয়। গত জানুয়ারিতে যখন যাই সেদিন কলকাতার এক পরিবার পুজো দিচ্ছিলেন, ওনাদের দেখে মনে মনে খুশি হয়েছিলাম ভেবে যে পর্যটকরা আসছেন। কিন্তু হায়! গত ১৬ ফেব্রুয়ারি রাতে সেই প্যাগোডার অনুকরণে নির্মিত মন্দির আগুনে ধ্বংস হয়ে যায়। তদন্ত চলছে। শোনা যায় হুকিং করে বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়া হয়েছিল, সেখান থেকেই আগুন। নতুন মন্দির কবে হবে জানি না, হবে তো নিশ্চয়ই। তেবে স্থানটির পরিচিতি রয়ে যাবে দেবী চৌধুরানির নামে, ভবানী পাঠকের নামে। অবশ্যই সেই মিথ থেকে যাবে যুগের পর যুগ।

একটু চা-পানের বিরতি দরকার। বটতলায় গরুর দুধের দারুণ চা পাওয়া যায়, সঙ্গে লোকাল বেকারির দমদার বিস্কুট। তাই বলে সময় কিন্তু নষ্ট করা যাবে না একেবারে। একই পথে ফিরে আসতে হবে গোশালা মোড়ে। মহাসড়কের বাম হাতের রাস্তায় ২৮ কিমি দূরে হুসলুডাঙ্গার মোড় থেকে গ্রামের পথ দিয়ে যেতে হবে জটিলেশ্বরের মন্দিরে। আনুমানিক তিনশ বছরের পুরনো এই শিবতীর্থ। পাথরের উপর খোদাই করা প্রাচীন কারুকার্য দৃষ্টিনন্দন। ১৬ মিটার দূরে সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির। গাছগাছালিতে ভরা। পরিবেশটি পূণ্যার্থী ও ভ্রমণার্থী সবার জন্যই মনোরম। ঘেরা মন্দির প্রাঙ্গণের বাইরে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বাঁধানো চত্বরে কার পার্কিং বন্দোবস্ত আছে। পুজোর সামগ্রী নিয়ে কিছু স্থানীয় মানুষ ডাকাডাকি করেন। মন্দিরে প্রবেশের টিকিট ঘর আছে। এলাকার মাঝেই বিশ্রামের জন্য সুন্দর একটি আবাস তৈরি হয়েছে। মন্দির সংলগ্ন টলটলে জলের বিশাল পুকুরের পারে প্রাচীন বটগাছে পূণ্যার্থীরা মানত করে সুতো বাঁধেন— অনেকেই পুকুর পারে অথবা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেন। এখানে আধঘণ্টাটাক কাটিয়ে ৬কিমি দূরের জল্পেশ মন্দিরে চলে আসা যায়।

যারা পুজো দিয়ে খাবেন তাদের একটু সময় লাগবে, নইলে একটু বিশ্রাম নিয়ে ভোগের প্রসাদ গ্রহণ করতে হবে। কতজন খাবেন আগেই তা জানাতে হবে। খুব যত্ন করে নিরামিষ রান্না করা হয়। সাধারণত সুগন্ধি কালো নুনিয়া আতপ চালের সঙ্গে মুগ ডালের খিচুরি, দু'রকম ভাজা, তরকারি, চাটনি, পায়েস ও মিষ্টি থাকবে। যদি যান তবে দুপুরের ভোজটা অবশ্যই উপরি পাওনা। খাওয়া শেষ হতে হতে প্রায় দুপুর আড়াইটে। পায়ে পায়ে মন্দির এলাকাটা ঘুরে দেখা যায়। অনেকে বলেন যে পাথরের টুকরোটি শিবলিঙ্গ মেনে পুজো হয় তা এক উল্কাপিণ্ড, মহাকাশ থেকে পতিত হয়। নাম তার জল্পেশ্বর। এই মহাপীঠের কথা পুরাণে উল্লেখ আছে বলা হয়। অতীতে জল্প নামে অসমের এক রাজা না কি মন্দিরটি নির্মাণ করেন। কালের নিয়মে মন্দির ধ্বংস হলে কোচবিহারের মহারাজা এবং বৈকুণ্ঠপুরের রাজার আনুকুল্যে পুনর্নির্মাণ করা হয়। ইদানিং সৌন্দর্যায়নের অনেক কাজ হয়েছে। দশ টাকার টিকিট কেটে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। মাটির গর্ভে শিবস্থান। মাথায় সুউচ্চ ডোম, মোট উচ্চতা প্রায় ৩৯ মিটার। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে ওই ডোমসহ মন্দির ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তৎকালীন কোচবিহারের মহারাজা তখন পুরো মন্দির সংস্কারের ব্যবস্থা করেন। অতীত কালে অসম থেকে পুরোহিত আনা হয়েছিল— সেবাইতের দায়িত্ব নিতে। তারাই বংশ পরম্পরায় দেবপুজোর দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। মন্দিরের পাশেই সুবিশাল দিঘি, জলে নীল আকাশের ছায়া, বাঁধানো ঘাট। গাছপালায় চারদিকটা সবুজ। পাশেই জর্দা নদীর পারে মেলার মাঠ।

> “কথিত আছে ১৮৬৪ সনে ইঙ্গ-ভুটান যুদ্ধের সময় ভুটানিরা ভোটপট্টি ছেড়ে যাওয়ার সময় নাকি বিপুল সোনাদানা মন্দির গর্ভে লুকিয়ে রেখে যায়। ইংরেজ সেনা সেই সম্পদের লোভে অমন ভাস্কর্যময় মন্দিরটি ভেঙ্গেচুরে তছনছ করে দেয়। মন্দিরের ইতিহাস লেখা একটা বোর্ড, হেরিটেজ সোসাইটি বা প্রত্নতত্ত্ব দপ্তর ঝোলাতে পারতেন না? না কি সংরক্ষণের চিন্তা দূর-অস্ত। ”

শিবরাত্রির সময় সাতদিন মেলা বসে। জমে ওঠে লোকসংগীতের আসর। মাটির পুতুল থেকে বাঁশের ঝুড়ি অনেক কিছুই পাওয়া যায়। আর আছে অনেক খাবারের দোকান। পুরনো রীতি মেনে এখনও কিছু পরিবার মেলার মাঠের পাশে ছাউনি বানিয়ে বাস করে। মেলা উপভোগ করে, ভক্তিভরে মন্দিরে পুজো দেয়। শ্রাবণ মাস জুড়ে চলে ভক্তদের আনাগোনা। অসম, বিহার, ওড়িশা, নেপাল, সিকিম থেকে গাড়ি ভরতি করে ভক্তরা ভিড় করে মন্দির থেকে ১২ কিমি দূরে তিস্তা নদীর পারে। শীতল জলে স্নান করে, গেরুয়া জামাকাপড় পরে কাঁধের বাঁকে জল ভরতি হাড়ি নিয়ে ‘ভোলে বোম’ আওয়াজে দিকবিদিক মুখরিত করে ভক্তের মিছিল চলে মন্দিরের পথে। মহাসড়কের পাশে তিস্তা সেতুর পর থেকে পসারিরা দোকান সাজিয়ে বসে; গেরুয়া পোশাক, বাঁক, ছোট কলস সঙ্গে আরও নানাবিধ সামগ্রী নিয়ে। প্রতি সোমবার যানবাহন ওই পথে আটকে পড়ে ভক্তদের ভিড়ে। পথে ভক্তদের সেবার জন্য বেশ কিছু জলসত্র চালু হয়।

মন্দির এলাকায় পুজো সামগ্রীর বেশ কিছু দোকান ছাড়াও অনেকগুলো খাবারের দোকান আছে। উৎসবের সময় অস্থায়ী অনেক দোকান বসে। মন্দিরের দক্ষিণে আনাজপত্রের দোকান বসে। কিছুদিন আগে মন্দিরের সামনে সুদৃশ্য গেট তৈরি হয়েছে। তবে মনে হয় গেটটির নির্মাণ মূল মন্দিরের স্থাপত্যের সঙ্গে সমতা রেখে করা হয়নি। কাছেই সরকারি উদ্যোগে ঝাঁ চকচকে একটা অতিথি নিবাস গড়ে উঠেছে। এসি এবং ননএসি রুম সাধ্যের মধ্যে ভাড়া পাওয়া যায়। কত মানুষ, কত রকম জীবিকার মানুষ এই দেবস্থানকে কেন্দ্র করে জীবিকা নির্বাহ করেন তা হয়ত এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়। সাধারণ দিনগুলিতে বেশ কিছু মানুষ দর্শনের জন্য আসেন, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন বা বিয়ের জন্যও কিছু মানুষ আসেন। ভারতের বিভিন্ন দেবস্থানে অসুররূপী সেবাইতদের যেমন দাপট দেখা যায়— এখানে তা নেই। এখানকার মানুষজন অত্যন্ত শান্ত, সরল তাদের জীবন যাত্রা।

এবার জলপাইগুড়ি ফেরার পথে এই সার্কিটের শেষ স্পট ধ্বংসপ্রাপ্ত শিবস্থান বটেশ্বর মন্দির। অচেনা, অজানা, চরম অবহেলিত কয়েকশো বছরের প্রাচীন ধর্মস্থান। মন্দিরটি সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর নির্মাণ বলে কিছু গবেষকের ধারণা। বড় বড় পাথরের খণ্ডের উপর খোদাই করা কারুকার্য মাঠ জুড়ে পড়ে আছে। কথিত আছে ১৮৬৪ সনে ইঙ্গ-ভুটান যুদ্ধের সময় ভুটানিরা ভোটপট্টি ছেড়ে যাওয়ার সময় নাকি বিপুল সোনাদানা মন্দির গর্ভে লুকিয়ে রেখে যায়। ইংরেজ সেনা সেই সম্পদের লোভে অমন ভাস্কর্যময় মন্দিরটি ভেঙ্গেচুরে তছনছ করে দেয়। মন্দিরের ইতিহাস লেখা একটা বোর্ড, হেরিটেজ সোসাইটি বা প্রত্নতত্ত্ব দপ্তর ঝোলাতে পারতেন না? না কি সংরক্ষণের চিন্তা দূর-অস্ত। ইতিমধ্যেই বিকেল চারটা বাজতে চলল। মন খারাপ নিয়ে ফিরতে হয়েছিল, প্রথম যেদিন এসেছিলাম। ডানদিকে দেড়-দুই কিমি দূরে মহাসড়ক ধরে আবার ডানদিকে একটু দূরেই খুকশিয়া পার্ক। এখানে বড় একটা পুকুরে বোটিং হয়, মিউজিকাল ফাউন্টেন আছে। নানা গাছপালায়, ফুলে ভরতি। বাচ্চারা ঘোড়ায় চড়তে পারে। এককোণে ছোট্ট রেস্তোরাঁয় বসে আরাম করে চা-পান শেষ করে ফিরে আসুন জলপাইগুড়ি। সকাল ন'টায় বেরিয়ে বিকেল পাঁচটায় ফিরে আসা, আপনার সারা জীবনের একটা দিন স্মরণীয় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

কভার স্টোরি

অনেক কিছু হয়েছে ডুয়ার্সে তবু
পরিবহণ কিন্তু আজও কাঁদায়

যৌবনে আমার ভীষণ পছন্দ ছিল ধর্মশালা। যাতায়াত রেলগাড়ি না হলে বাস। সংরক্ষণ নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না। হরিদ্বারে কালীকাম্বলী বাবার ধর্মশালার চিত্র। বিচিত্র অভিজ্ঞতা জীবনের পরম সঞ্চয়। খটমল থেকে খাটিয়া আবার খটমল ছোড়কে গাটিয়া। দক্ষিণা মাত্র পঞ্চাশ পয়সা। এলাহাবাদে হিউয়েট রোডে চামেলীদেবী ধরমশালায় বারান্দায় শুয়ে থাকা ক্যাম্বিসের ব্যাগ মাথায় দিয়ে। আর পরিবহণ? রেলকামরায় জানালা দিয়ে প্রবেশ। তুমুল হট্টগোল গিজগিজ করছে যাত্রী। মেঝেতে, বাথরুমের কাছে পা ফেলার জায়গা নাই। মধ্যরাতে সবাই যেন হঠযোগী। কারুর ঠ্যাং আমার কাঁধে। কারও মাথা কোলের উপর নুইয়ে পড়ছে। সঙ্গে ব্যাঘ্রসম নাসিকা গর্জন। ভয়ঙ্কর লাগলেও অনবদ্য।

ষাটের দশকের শুরু থেকে আমার বেড়ানোর পাগলামি। উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে চা-বলয়, বনস্থলে, পাহাড়ে— যখন যেখানে গিয়েছি ভরসা বাস, হাতে গোনা দু'-চারটে মেল না হলে প্যাসেঞ্জার ট্রেন। বাস ছিল খুবই অনিয়মিত। সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে এক্কেবারে শুনশান। মনে পড়ে হ্যামিলটনগঞ্জ থেকে আলিপুরদুয়ার ফিরব বাস, ট্রেন কিছুই নাই। অচেনা মফস্বল গঞ্জ চা-বাগানে ঘেরা। চারপাশে জঙ্গল। টিমটিমে আলো, দু'-চারটে দোকান। কোথায় রাত কাটাব ভাবতে ভাবতে একটা চা-দোকানে ঢুকে নেতিয়ে পড়া শিঙারা আর চা খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করি এখানে রাত্রিযাপনের কী সুবিধা? দোকানদার বলল আর ঘণ্টা খানেক পরেই দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করব। হঠাৎ মনে পড়ল নীলমণি বর্মণের কথা। আলিপুরদুয়ার থেকে সে সময় অধ্যাপক শক্তিপদ ঘোষ সম্পাদনা করতেন ইংরেজিতে মাউন্টেন ডেসপ্যাচ' আর বাংলায় 'পরমাণু'। দোকানদার বলল, হাতিলার পাশে নীলমণি বর্মণের বাড়ি। জানি না বাড়িতে আছে কি না। যাইহোক কপাল ঠুকে হাঁটা দিলাম নীলমণির বাড়ির দিকে। ভাগ্যি ভাল। ওকে পেয়ে যাই বাড়িতেই। অসুবিধার কথা বলতেই তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে বলল— হ্যামিলটনগঞ্জে আমি থাকতে আপনার চিন্তা কিসের? তারপর বাকিটুকু ইতিহাস।

তরাই ডুয়ার্সের বহু জনপদে সৌন্দর্য খনিগুলি বেড়াতে গিয়ে কত যে তিক্ত মধুর অভিজ্ঞতা আমার ঝুলিতে জমা আছে তা বলে শেষ করা যাবে না। তখন ইকো টুরিজম, হোমস্টে, লজ রিসর্ট কোথায়? সরকারি অতিথি নিবাসই ছিল একমাত্র ভরসা। আর যানবাহন, আগেই বলেছি বাস। আদ্যি কালের বদ্দিবুড়ো। মনে পড়ে আলিপুরদুয়ার থেকে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের বাসে রওনা হয়েছি ধুমপাড়া পোশাকী নাম নিউল্যান্ডস চা-বাগান। আমার ভ্রমণ সাথী রাজেন পান্ডে। নিউল্যান্ডস থেকে সঙ্কোশ চা-বাগান, কালীখোলা হয়ে পায়ে পায়ে যমদুয়ার। কোথায় পরিবহণ! চাতক পাখির মতন চেয়ে থাকা। হনটনই শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। হাতিপোতা থেকে তুরতুরি ময়নাবাড়ি হয়ে ভুটানঘাট বনবাংলো। সেখান থেকে পদব্রজে পিপিংখোলা যাত্রাপথের রোমাঞ্চ। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বনভূমি। আমি লিখেছিলাম— ভুটানঘাট ওয়ালটেয়ার ডে লা মেয়ারের কবিতা। অসাধারণ অভিজ্ঞতা। ভ্রমণে এ পথেই আমার পরম সম্পদ। আজ শুধুই রোমন্থন।

একদা পর্যটনের মাধ্যম ছিল ডুলি, পালকি, গো-যান, ঘোড়া, খচ্চর। নদীপথে নৌকা। স্যার জোসেফ ডাল্টন হুকারের জার্নালস পড়লে জানবেন কলকাতা থেকে দার্জিলিং পৌঁছাতে কত মাস সময় নিয়েছিল। কীসের পরিবহণ? মানুষের সংখ্যা হাতে গোনা যেত। শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডে হাওড়া পেট্রল পাম্পের কাছে ছিল মেসার্স বার্ড কোম্পানির গো-যানের আড্ডা। কোচবিহারের মহারাজার পাংখাপুলাররা থাকত পাখা নিয়ে। নিত্য গঙ্গা জল যেত দার্জিলিঙে। পাংখাবাড়িতে চমৎকার বাংলো ছিল। হুকারের লেখায় উল্লেখ। আমি যদিও সেটিকে খুঁজে পাই নাই।

মুড়ির টিনের গল্প মনে পড়ে? এ প্রজন্মের অনেকের কাছে ধাঁধার মতো মনে হতেই পারে। ক্ষুদে ম্যাটাডোর বাস। বাস আড্ডা ছিল লালু মোহন মেঠাই দোকানের কাছে, আলিপুরদুয়ার ইস্টিশনের গায়ে। ভোর থেকে সন্ধে ছোটাছুটি করত ডি.আর.এম চৌপথী পর্যন্ত। আমার বেশি করে মনে পড়ে তার একটাই কারণ জগন্নাথদা, হাটখোলার নিতাই কবিরাজ। না হলে বসুধা প্রিন্টার্সের তিনু বিষ্ণুর ঠেকে জম্পেশ আড্ডা দিয়ে বাসে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হত। কন্ডাক্টর বলত হঠযোগী হতে হবে। মাঝে মাঝে বাস মিস করলে হন্টন, না হলে রিকশাওয়ালাকে তৈল মর্দন। মনে পড়ে আলিপুরদুয়ার থেকে রাজাভাতখাওয়া, জয়ন্তী সেতু, ভুটিয়াবস্তি, চুনিয়া, ফাসখাওয়া, হাতিপোতা, কার্ত্তিকা, রায়ডাক, ধওলা, কোহিনূর, শামুকতলা, সলসলাবাড়ি হয়ে দুয়ারে ফেরা। ৯৩'র বন্যায় সেই যে মুখ থুবড়ে পড়ল জয়ন্তী সেতু। সম্প্রতি বালা নদী, ডিমা নদীর উপর সেতু তৈরি হলেও

ডুয়ার্সের গ্রামীণ পরিবহণ এখনও অথৈ জলে

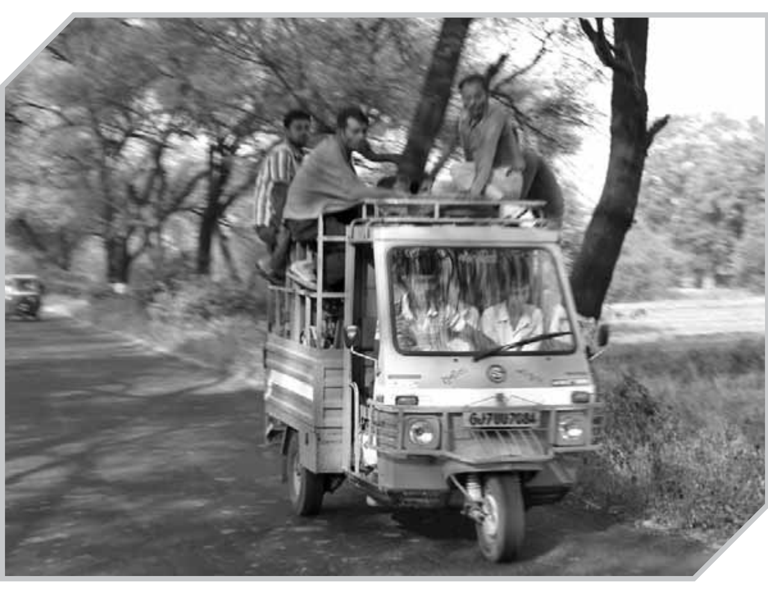

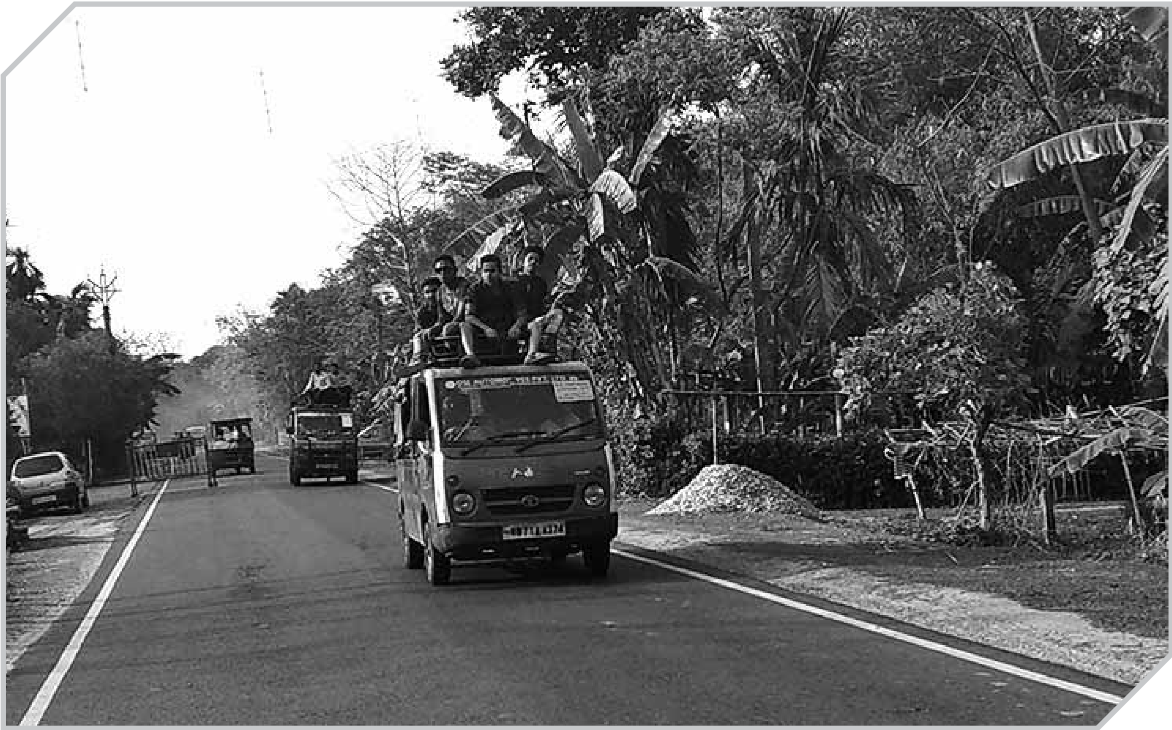

বাসের সংখ্যা কিন্তু বাড়ে নাই। আগামী দিনে সম্ভাবনা কম, কারণ বাঘবনের ভিতর দিয়ে বাসের যাওয়া আসাতে বাঘেরা শব্দদূষণে আক্রান্ত হতে পারে। তবে ঘন ঘন নীল বাস পাবেন কোচবিহারের জন্য। বক্সা ফিডার রোডে এখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে টোটো, অটো, রিকশা, এখানে নিত্য জ্যামজট। পূর্ব ডুয়ার্সের সদর দরজা আলিপুরদুয়ার হলে পর্যটনের বিকল্প হয়ে অগ্রগতি মোটেও আশাব্যঞ্জক নয় যাহা অপ্রিয় হইলেও সত্য। পরিবহণের পাশাপাশি পথঘাট, সেতু, সঠিক যোগাযোগ ব্যবস্থা সুষ্ঠু সুন্দরভাবে আজও কিন্তু গড়ে উঠল না। রাষ্ট্রীয় পরিবহণের বাস ডিপোগুলির দিকে তাকালে কান্না পায়। হতশ্রী, কুৎসিত, কদর্য, কদাকার। শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাসের বহিরঙ্গ চিত্রটি দেখে নেন। প্রবেশ পথে নাই নিরাপত্তা রক্ষী। ডান দিকে আবর্জনার স্তূপ, ঝাঁটা ঝান্ডিমুন্ডি। এলোমেলো নীল বাসগুলি ছড়ানো। শুরুতে যে নান্দনিক জেল্লা ছিল এখন দেখলে কষ্ট হয়। চারিদিকে দালাল, ভবঘুরে, ভিখারি, হোটেল থেকে ডাকাডাকি, বাস আড্ডার ভিতরে ময়লা কাগজপত্র। খোদার নামে চলছে। দেখারও কেউ নেই, বলারও কেউ নেই। অবিরাম মাইকে ঘোষণা চলছে ফালাকাটা হয়ে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, বিধাননগর হয়ে রায়গঞ্জ, মালদহ। বাস টার্মিনাসে সুন্দর রেস্তোরাঁ, হোটেল ছিল। উত্তম পরিবেশ। এখন সত্যি পোড়ো বাগানে পরিণত। একই অবস্থা জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে। আলিপুরদুয়ারে যাত্রীদের বসার জায়গা নেই। শৌচালয় তথৈবচ। দুঃখ হয় কাঠের ছোট ছোট সেতুগুলির সংস্কার, পাকাপোক্ত হল না। একটি তো মুখ থুবড়ে পড়ে আছে গত বছরের প্রবল বৃষ্টিতে। নড়বড়ে পরিবহণ ব্যবস্থার উপর পর্যটন কীভাবে নির্ভর করবে জানা নাই। অথচ একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

> পূর্ব ডুয়ার্সের সদর দরজা আলিপুরদুয়ার হলে পর্যটনের বিকল্প হয়ে অগ্রগতি মোটেও আশাব্যঞ্জক নয় যাহা অপ্রিয় হইলেও সত্য। পরিবহণের পাশাপাশি পথঘাট, সেতু, সঠিক যোগাযোগ ব্যবস্থা সুষ্ঠু সুন্দরভাবে আজও কিন্তু গড়ে উঠল না। রাষ্ট্রীয় পরিবহণের বাস ডিপোগুলির দিকে তাকালে কান্না পায়। হতশ্রী, কুৎসিত, কদর্য, কদাকার। এলোমেলো নীল বাসগুলি ছড়ানো। শুরুতে যে নান্দনিক জেল্লা ছিল এখন দেখলে কষ্ট হয়।

কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গ সড়ক পরিবহণের অন্যতম ৩৪ নং জাতীয় সড়ক আজও সম্পূর্ণ হল না। এশিয়ান হাইওয়ের কাজকর্ম লন্ডভন্ড অবস্থা। ডালখোলায় রেলওয়ে লেবেল ক্রশিং ভয়াবহ অভিশপ্ত। শিলিগুড়ি থেকে রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, মালদহ যেতে কী দুঃসহ অভিজ্ঞতা হয় ভুক্তভোগীরাই উপলব্ধি করেন। অথচ দিল্লি, হরিয়ানা, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রে বেড়াতে গিয়ে দেখুন ছয় লেনের রাস্তা যেন মাখনের মতন। বিকানীর থেকে জয়সলমীর গাড়িতে ভ্রমণ এতটুকু কষ্টদায়ক নয়। মুশকিল আসানের পথ কী? কে ধরবে হাল, কার আছে হিম্মৎ?

সুষ্ঠু পর্যটনের রূপরেখা কোথায়? মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে, টেলিভিশনে দেখি-শুনি-পড়ি সবুজের পথে হাতছানি উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের উদ্যোগে। হা হতোস্মি, দু'-চার দিন যেতেই উত্তেজনা শেষ। প্রচারের ডঙ্কা নিনাদ বন্ধ। রেলদপ্তর থেকে চালু হয়েছিল ডুয়ার্স অন হুইলস। অনেক ঢাকঢোল পেটানো হয়েছিল। আমরা যারা বেড়াতে ভালবাসি আশায় বুক বেঁধেছিলাম। শেষ পর্যন্ত সবটাই গুড়ে বালি। নড়বড়ে পরিবহণের পরিষেবা জনমানসে, পর্যটকদের কাছে আশার সৃষ্টি করতে পারছে না। আজ পর্যন্ত আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ি, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি বাস আড্ডায় ট্রাভেল ডেস্ক, কিয়স্ক তৈরি হল না। ভরা মরশুমে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে গেলে দেখবেন মন্দিরের পান্ডাদের মতন ড্রাইভার, খালাশি, দালালদের দৌরাত্ম। টানাহ্যাঁচরা চলছে। নির্বিকার, নিরুত্তাপ প্রশাসন। একটু আধটু হামকিদামকি করে চুপচাপ। প্রিপেড ট্যাক্সির করুণ অবস্থা। পর্যটকরা হয়রানি, প্রতারিত, ঝগড়াবিবাদের শিকার হচ্ছেন। বিরক্ত, তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে যাচ্ছেন। কার ঘরে কে দেবে ধুনো?

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

মৃত্যুশয্যা থেকে ফিরলেও উত্তরের উন্নয়নে আরো বহুপথ চলতে হবে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণকে

এক।
মালবাজারের বহু মানুষ আজ অবধি কোচবিহারের রাজবাড়ি দেখেননি, জলপাইগুড়ির অনেকেই দেখেননি কুমারগ্রামের সংকোশ বা রায়ডাক। কোচবিহারের বহু মানুষের কাছেই আলিপুরদুয়ার জংশন পেরোলেই তা 'অচেনা ডুয়ার্স' কারণ এসব 'অড রুটে' বাস চলেনি খুব একটা কোনওকালেই।

দুই।
সাড়ে তিনশ টাকা রেল বা বাসভাড়ায় কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি ৬০০ কিমি অতিক্রম করে এসে পর্যটককে আজও নব্বই কিলোমিটার দূরত্বে গরুমারা পৌঁছতে ভাড়া করতে হয় ২০০০ টাকার গাড়ি, কারণ এপথে বাস চলে না বললেই চলে।

তিন।
সেবক ব্রিজ পেরিয়ে যে হাইওয়ে সোজা চলে গেছে চালসা-নাগরাকাটা-হাসিমারা-বীরপাড়া হয়ে আলিপুরদুয়ার, অন্য যেকোনো পর্যটনের রাজ্য হলে সেপথে অহরহ চলতো রংচঙে টুরিস্ট বাস। কিন্তু বাস্তবে সেপথে বাস পরিবহণ নেই বললেই চলে।

যোগাযোগের অভাবই যে উত্তরের প্রত্যন্ত জেলাগুলিকে যুগের পর যুগ পিছিয়ে রেখেছে সেকথা আজকের প্রজন্মকে আর বলে দিতে হয় না। কতকগুলি উদাহরণ যেমন চোখের সামনে স্পষ্ট করে তোলে সে ছবি। আজও পরিবহণ নিগমের কোনও কর্তাকে এই চারটে পরিস্থিতির কথা বললে সোজাসুজিভাবে জবাব দেবেন, আসলে এসব রুটে প্যাসেঞ্জার হয় না, তাই বাস চালানো হয় না। তখন প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই আসে, ডিম নাকি মুরগি কোনটি পৃথিবীতে আগে এসেছিল? তাহলে পরিবহণ নিগমকে পুরোপুরিভাবে বাণিজ্যিক সংস্থায় পরিণত করতে বাধা কোথায়? মানলাম, সরকারের 'মানবিক

মানুষের কাছে জবাবদিহি বাড়াবার কথা বলছেন নতুন চেয়ারম্যান?

মুখ' হয়তো নিগমের খারাপ অবস্থায় দেখানো সম্ভব হয়নি, কিন্তু এটাও তো ঠিক, সরকার কোনও রুটে বাস চালানো শুরু করলে তবেই তো জমে উঠবে সেই পথ। কারণ আজতো এসব পথে মানুষের অভাব নেই। নিগমের বাস যাতায়াত করলে বাড়বে লোকসমাগম, শুরু হবে যাতায়াত, হবে বেচাকেনা, জমে উঠবে অর্থনীতি। সরকার গাঁয়ের মানুষজনকে যখন ঢেলে ভাতা দিয়ে তার দুঃখমোচন করছেন, তখন পরিবহণ না দিলে তার

উন্নত মানের শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ কোথায়? নাকি সরকার চান না পরিবহণ বাড়ুক, মানুষে মানুষে যোগাযোগ আদান-প্রদান বাড়ুক, ক্রমে নিজেদের অধিকার নিয়ে সচেতন হয়ে উঠুক উত্তরের মানুষ?

বাহাত্তরে তারুণ্যের তরঙ্গ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমে!

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের হাল ফেরাতে তিন জনের ভূমিকা উল্লেখ্য— (ডান দিক থেকে) পরিবহণ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারি, পরিবহণ সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নিগমের বর্তমান চেয়ারম্যান মিহির গোস্বামী

শিলিগুড়ি থেকে কোচবিহারের লাস্ট বাস সেদিন যখন নির্মীয়মান হাইওয়ে আর রেলগেটের যানজট ছাড়িয়ে নিগমের ফালাকাটা স্ট্যান্ডে এসে দাঁড়াল, রাত তখন সওয়া দশটা। চায়ের স্টল একটি খোলা, পান দোকানি তার পসার গোটাচ্ছেন, ক্লান্ত চোখে জানালেন, বাসের চাপ বেড়ে গেছে অস্বাভাবিক, ভোর পাঁচটা থেকে শুরু হয়, সারাদিন কোনও বিরতি নেই, বেচাকেনার ফাঁকে নাওয়া-খাওয়ার সময় মেলে না। এর পরেও আছে নাকি বাস? আছে আরও গোটা দুই-তিন, সেইসময় অবশ্য দোকানপাট খোলা থাকে না! এমন দিন কোনওদিন আসবে তা কি কেউ ভেবেছিল? অকপট স্বীকারোক্তি দোকানিদের জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ি স্ট্যান্ডেও। সবার মুখে একই কথা, ঘুরে দাঁড়িয়েছে রাষ্ট্রীয় পরিবহণ, ফিরে এসেছে সুদিন। ডিপোতে ডিপোতে সাজ সাজ রব পড়ে গিয়েছে যেন! কিশোরী কন্যাটি যখন বাড়ি ফিরে বলে, এখন নতুন নতুন সব বাসে উঠলেই চোখে পড়ে ঝকঝকে তরুণ কনডাক্টর, স্টিয়ারিংয়ে হ্যান্ডসাম সব ড্রাইভার, তখন সত্যিই অনুভুত হয়, পরিবহণে তারুণ্যের তেজ আনছে নতুন প্রজন্ম!

সরকারি প্রেস বিবৃতির মতো শোনাতে পারে তবু— 'রাজ্যের তরুণ পরিবহণ মন্ত্রীর কর্মতৎপরতা, সার্বিক পরিকল্পনা, মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন, অপচয় হ্রাস, প্রবীণতম কর্মীদের ভি আর এস প্রকল্পে আনা, তরুণতম ড্রাইভার-কন্ডাকটর চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, তেলের সাশ্রয়, প্রায় প্রতিটি লাভজনক রুটে বিভিন্ন ডিপো থেকে প্রচুর সংখ্যায় সরকারি বাস চালানোর ফলে সরকারি পরিবহণ ব্যবসার প্রতি আস্থাশীল হচ্ছে আম নাগরিক।' কর্মসংস্কৃতির অভাবে এবং রাজনীতিজীবীদের চাপে মৃত্যুশয্যায় চলে গিয়েছিল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ। কোন এক এক অদৃশ্য যাদুমন্ত্র বলে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। গত সাত বছরে বার তিনেক চেয়ারম্যান বদলের পর মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ব্যাটন কাঁধে তুলে নিয়ে কর্পোরেশনকে কোমাগ্রস্ত অবস্থা থেকে তুলে প্রাণবন্ত করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হয়েছেন চলতি চেয়ারম্যান কোচবিহারের বিধায়ক মিহির গোস্বামী। 'এই কৃতিত্ব একদিকে যেমন সংস্থার পরিচালকমন্ডলীর, অন্যদিকে অধিক প্রশংসা প্রাপ্য সংস্থার কর্মীদের। কারণ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার কর্মীরা কর্মঠ, আন্তরিক এবং যে কোনও চ্যালেঞ্জ গ্রহণে সমর্থ। সরকার পরিকল্পনা করে ঠিকই, তবে পরিবহণ কর্মীরাই অসম্ভবকে সম্ভব করার কাণ্ডারী।' এসব বলে বিনয়ী মিহিরবাবু অবশ্য বলেন এই কৃতিত্বে তাঁর অংশ অতি সামান্যই।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের

কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার থেকে শিলিগুড়ি এসি বাস যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছে

সাম্প্রতিক যাত্রী পরিষেবায় খুশি আমজনতা। নতুন সরকার আসবার পর গত সাত বছরে মোট ৪৮৫টি নতুন বাস এসেছে নিগমে। একসঙ্গে এতগুলি বাস পাওয়ার ফলে নিগম নতুন করে পরিকল্পনার মাধ্যমে সংস্থাকে লাভজনক করে তোলার কাজে ব্রতী হয়েছে। মিহিরবাবু জানালেন, নিগমের মাসিক আয় এখনকার চেয়ে অন্তত ১৫ শতাংশ বাড়ানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। যাত্রী পরিষেবায় গুরুত্ব, ব্যয়সংকোচ, প্রয়োজনাতিরিক্ত তেল খরচ ও রাস্তায় চুরি বন্ধ করা, নতুন নতুন রুটে বাস চালানো, গ্রামাঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকায় বাস চালানোসহ উত্তরবঙ্গের সাতটি জেলাতেই সরকারি বাস পরিষেবার উন্নয়নের দিকে জোর দেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে নিগমের কর্মী সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। বর্তমানে প্রায় ৯০০ টি বাস নিয়মিত নানা রুটে চলছে। ২০১৪-১৫ সালে বাসগুলি যেখানে মাসে ৩৭৮.৮ লক্ষ কিমি চলতো, সেখানে ২০১৫-১৬ আর্থিক বর্ষে চলেছে ৫৫৮.৯৬ লক্ষ কিমি। ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে যেখানে ভাড়া বাবদ মাসে ৮৪০০.৩৬ লক্ষ

“দুপুর গড়াতেই বাসের সংখ্যা কমতে থাকে, সন্ধের পর বাস চলাচল ক্ষীণ হয়ে আসে। ফলে অন্ধকার নামতেই জন পরিবহণ যোগাযোগ প্রায় বন্ধ হয়ে যায় ডুয়ার্সে, একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছবার পর আঠারো বছর পেরিয়েও। আজও অনেক ব্যস্ত রুটে রাত ন'টায় লাস্ট বাস, কোথাও আবার সন্ধে ছ'টার পরে বাস নেই, ভাবা যায়?”

এবং অন্যান্য সূত্র থেকে ৬৯.৮৩ লক্ষ অর্থাৎ মোট আয় হয়েছিল ৮৪৭০.১৯ লক্ষ টাকা, ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে সেই আয় বেড়ে হয়েছে ১২৬১৮.৬৪ লক্ষ টাকা। কিন্তু বার্ষিক ব্যায় ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে যা ছিল, ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষেও তাই অর্থাৎ ১৯১ কোটি টাকাই ছিল।

চালু হয়েছে বায়ো টয়লেট রকেট বাস

সেই কারণেই নিগমের ঘুরে দাঁড়ানোতে খুশি রাজ্য সরকার। পরিবহণ নিগমের জন্য বিগত অর্থবর্ষের চেয়ে ২০১৭ সালে ২০০ কোটি টাকা বাজেটে বেশি বৃদ্ধি করেছিল। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন, জিপিএস এবং সিসিটিভি সমন্বিত ৭৫টি বাস নিয়ে নিগম তার যাত্রা শুরু করেছে নতুনভাবে। একদিকে সরকার যেমন নিগমকে বেসরকারি বাস মালিকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আয় বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে, পাশাপাশি সরকার যে নিগমকে আর বেশিদিন ভরতুকি দিয়ে পুষবে না তা-ও ঠারেঠোরে জানিয়ে দিয়েছে।

গত আশির দশকে উত্তরবঙ্গে জ্যোতি বসুর সরকারের ভাতঘুম ছুটিয়ে দিয়েছিলেন যে যুব কংগ্রেস নেতা, তিনিই আজ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের চেয়ারম্যান, নিগমের সম্পর্কে বহুদিনের সফ্‌ট কর্ণার, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। বেটার লেট দ্যান নেভার, দেরিতে হলেও পুরনো এই সঙ্গীর ওপর ভরসা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী, সেটাই যা আশার ইঙ্গিত দেয়, জানালেন নিগমের বিরোধী ইউনিয়নের এক নেতা। তেষট্টির তরুণ মিহির গোস্বামী ভীষণ খুশি তাঁর 'ডায়নামিক' মন্ত্রীর সঙ্গে কাজ করতে পেরে, কিন্তু প্রশংসায় গলতে নারাজ। তাঁর হিসেবে এখনও অনেক কিছু করতে হবে, সবার আগে ফিরিয়ে আনতে হবে কর্মসংস্কৃতি, যা হারিয়েই গিয়েছিল বলা যায়। 'বাম জমানার শেষ দশ বছরে এখানেও চলেছে অবাধ লুঠপাট, প্রশাসনিক শৈথিল্য তো ছিলই। যার ফলে প্রায় মৃত্যু শয্যায় চলে গিয়েছিল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। অথচ দেখুন সাধারণ মানুষের আস্থার জায়গাটা কিন্তু হারায়নি, সেটাই আমাদের মূলধন', প্রত্যয়ের আভাস মিলল চেয়ারম্যানের গলায়, 'মানুষের কাছে জবাবদিহি আরও বাড়াতে হবে আমাদের'।

রাতে বাড়ুক সরকারি বাস আজও কি সন্ধেবেলায় ঘুমিয়ে পড়ে ডুয়ার্স?

বাস বাড়লেও সারাদিনে তাদের সঠিক সমানুপাতিক বন্টন হয়নি, এই অভিযোগ রয়েছে নিত্যযাত্রীদের। যেমন সকালের দিকে একই গন্তব্যে যাওয়ার বাস পাঁচ-দশ মিনিট পরপর মেলে, ফলে অনেক বাসই প্রায় খালিই যায়, যাত্রী পায় কম। দুপুর গড়াতেই বাসের সংখ্যা কমতে থাকে, সন্ধের পর বাস চলাচল ক্ষীণ হয়ে আসে। ফলে অন্ধকার নামতেই জন পরিবহণ যোগাযোগ প্রায় বন্ধ হয়ে যায় ডুয়ার্সে, একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছবার পর আঠারো বছর পেরিয়েও। আজও অনেক ব্যস্ত রুটে রাত ন'টায় লাস্ট বাস, কোথাও আবার সন্ধে ছ'টার পরে বাস নেই, ভাবা যায়? অতএব এক বুড়ো বামপন্থী তাত্ত্বিক নেতার দাবি 'বাসে ক্যামেরা

ওয়াইফাই মিউজিক সিস্টেম বসিয়ে আদতে কোনও উন্নয়ন হয় না', মেনে নিতে হবে! আমরা কি ভাবতে পারি না ছাত্রছাত্রীরা শহরে সন্ধেয় টিউশনির পাঠ শেষ করে বাড়ি ফিরে আসার জন্য বাড়তি সময় পাবে? সেলসের কর্মীরা আরও বেশি সময় পাবেন মার্কেটে থাকার, ছোট ব্যাবসায়ীরা একবেলা দোকানদারি করে সময় পেতে পারেন পাইকারি বাজারে সওদা করতে! সেলসের চাকুরিরত এক যুবকের বক্তব্য, রাস্তা যখন প্রস্তুত ও নিরাপদ তখন বেশি রাতে বাস না চললে বলা যায় রোজ কয়েক ঘণ্টা ভাইটাল এনার্জির অপচয় হচ্ছে ডুয়ার্সে, যা উন্নয়নের অন্তরায় হয়েই রয়ে গিয়েছে আজও। যাত্রী পাওয়া যাবে না বলে লেট নাইট বাস দেওয়া হয় না, এই ভুল যুক্তিতে আটকে থাকলে সেই অন্তরায় ঘুচবে না, বলাই বাহুল্য। যাত্রী যদি নাই জানতে পারে বাস বেশি রাতে চলে তাহলে তার পরিকল্পনা করবে কী করে? আর একবার জানলে সোশালমিডিয়ার যুগে তার প্রচার-বিজ্ঞাপন কি কোনও সমস্যা? ফোর লেন হাইওয়ের কাজ যখন শেষ পর্যায়ে তখন এইরকম যুক্তি রীতিমত হাস্যকর। লাস্ট বাসের সময়সীমা পর্যায়ক্রমে বাড়ানো দরকার, নীতিগতভাবে নিগমের চেয়ারম্যান মানলেন একথা, বললেন সে নিয়ে চিন্তাভাবনা ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার আগে প্রয়োজন ঘর গোছানো, সেদিকে বেশি গুরুত্ব দিতে চান তিনি।

নিগমের 'হাতি'র কাছে এবার চাই 'ট্রাংক' সার্ভিস

কোচবিহার বা আলিপুরদুয়ার থেকে প্রত্যহ বহু যাত্রী যান বাগডোগরা বিমানবন্দরে। তাদের ঘিরে জমে উঠেছে গাড়ি ভাড়ার ব্যবসা। আড়াই হাজার টাকার বিমান টিকিট অথচ বাগডোগরা পৌঁছতে বা ফিরতি পথে দিতে হয় আরও তিন হাজার। সকাল ছ'টা থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত বহু বাস যায় কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, মাথাভাঙা থেকে শিলিগুড়িতে। বিকেলে সব বাসই ফেরে। এর মধ্যে গোটা তিনের সার্ভিসকে কি বাগডোগরা পর্যন্ত এক্সটেন্ড করা যায় না? তেমনই শতাব্দী এক্সপ্রেসের সুবিধা ভোগ করে কেবল শিলিগুড়ি সন্নিহিত মানুষজন, আশপাশের জেলার লোকেদের বা ডুয়ার্সের পর্যটকদের শতাব্দী এক্সপ্রেসে চাপতে গেলে রাতে শিলিগুড়ির হোটেলে বা আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে কাটাতে হয়। রাতে যারা এনজেপি ফিরছেন তাদের নিয়ে যেমন একটি বাস ফিরতে পারে কোচবিহার বা আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত, তেমনই একটি বাস এদিক থেকে রাতে রওনা হয়ে ভোরে ধরিয়ে দিতে পারে শতাব্দী এক্সপ্রেস, পারে না? প্রত্যাশা বাড়ছে রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের প্রতি। চিন্তা-ভাবনাকে একটু প্রলম্বিত করতে সমস্যা কোথায়?

ডুয়ার্সের পর্যটন বাড়াতে চাই বাস, ব্যাস

উত্তরবঙ্গের টি, টিম্বার, টুরিজম এর সঙ্গে আরেক 'টি' অর্থাৎ ট্রান্সপোর্ট বা পরিবহণকে যোগ না

> 'পর্যটনমুখী পরিবহণ' বলতে ঠিক কী বোঝায়? না, 'সবুজের হাতছানি' টাইপের প্যাকেজ টুর নয়, সেখানে না ছিল পেশাদারি পরিচালনা, না ছিল কোয়ালিটির ছোঁয়া। একটা সময় নিগমের বাস ছিল না, আয় ছিল না, অথচ প্রচুর কর্মী গিজগিজ করত তখন এসব উদ্যোগই 'হিরো' ছিল। পরিবহণের লোকেরা তাদের মূল পরিষেবা, অর্থাৎ টাইম মেনে বাস চালানো বা রক্ষণাবেক্ষণ, ছেড়ে পর্যটক নিয়ে প্যাকেজ টুর করাবেন তা কখনই যুক্তিযুক্ত প্রস্তাব নয়, দেশে কোথাও এরকম উদাহরণ নেই।

করলে পরিকাঠামো সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না। এতদিনে এইটুকু উপলব্ধি আমাদের হয়েছে। এই মুহূর্তে উত্তরে চাই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ। আজ যখন কাঠের বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে, চা-শিল্প বাঁচার লড়াই চালাচ্ছে, তখন ডুয়ার্সের একমাত্র শিল্প হতে পারে পর্যটন এ নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। আর পরিবহণ পরিকাঠামো ছাড়া এই পর্যটন শিল্প এগোতে পারবে না তাও নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এই লক্ষ্যে সরকারকে দিশা দেখানোর পথিকৃৎ হতে পারে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। অতএব নিগমের ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলির মধ্যে 'পর্যটনমুখী পরিবহণ' হোক অন্যতম সেটাই কি কাম্য নয়?

'পর্যটনমুখী পরিবহণ' বলতে ঠিক কী বোঝায়? না, 'সবুজের হাতছানি' টাইপের প্যাকেজ টুর নয়, সেখানে না ছিল পেশাদারি পরিচালনা, না ছিল কোয়ালিটির ছোঁয়া। একটা সময় নিগমের বাস ছিল না, আয় ছিল না, অথচ প্রচুর কর্মী গিজগিজ করত তখন এসব উদ্যোগই 'হিরো' ছিল। পরিবহণের লোকেরা তাদের মূল পরিষেবা, অর্থাৎ টাইম মেনে বাস চালানো বা রক্ষণাবেক্ষণ, ছেড়ে পর্যটক নিয়ে প্যাকেজ টুর করাবেন তা কখনই যুক্তিযুক্ত প্রস্তাব নয়, দেশে কোথাও এরকম উদাহরণ নেই। বরং অন্যান্য অনেক রাজ্যের মতই পর্যটন দপ্তর ও তাদের অনুমোদিত বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে গাটছড়া বেঁধে জনপ্রিয় রুটগুলিতে চলুক নিগমের আধুনিক টুরিস্ট বাস। আগাম কিংবা তৎক্ষণাৎ, পর্যটকরা নিজেরাও অনলাইনে বুক করতে পারবেন এইসব বাসের টিকিট। বাগডোগরা বিমান বন্দর এবং নিউ জলপাইগুড়ি, মালবাজার, আলিপুরদুয়ার জংশন এবং নিউ কোচবিহার এই চার রেল স্টেশনকে কেন্দ্র করে চালু হোক টুরিস্ট বাস সার্ভিস। স্টেশনগুলিতে তৈরি করা হোক নিগমের নিজস্ব টাচস্ক্রিন কিয়স্ক। বাস চালানো বা দেখাশোনা করার জন্য পর্যটনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের নিয়ে খোলা হোক নতুন বিভাগ।

পর্যটনের দুনিয়ায় পহলে দর্শনধারী হওয়াটা জরুরি। তাই প্রয়োজন উত্তর-পূর্ব ভারতের গেটওয়ে শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনালের আমূল সংস্কার করাও। থাকুক গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা। ঝকঝকে টার্মিনাসের ভেতরে থাকবে তকতকে পরিষ্কার রেস্তোরাঁ, শোরুম, চা-স্টল ও রাত্রি যাপনের পরিচ্ছন্ন গেস্টরুম। এতে আগামীতে বাংলাদেশ-নেপাল-ভুটানের বাস চালু হলেও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। সম্পূর্ণ একমত হয়ে মিহিরবাবু আরও মনে করিয়ে দিলেন, সেই সঙ্গে এলাকাকে যানজটমুক্ত করতে হলে উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন রুটে, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, ঝাড়খন্ড ইত্যাদি রুটের বেসরকারি বাস পরিষেবার জন্য সম্পূর্ণ আলাদা টার্মিনাস করা অন্তত অবরুদ্ধ শিলিগুড়ি শহরের কথা ভেবে আসু প্রয়োজন।

কিন্তু আসলে সবটাই হয় সরকারি নীতি ও সিদ্ধান্ত মেনে, বিশেষ করে পর্যটনের ক্ষেত্রে তো বটেই। আর নিগমের নিজস্ব সম্পদ বলতে যা বোঝায় সেইসব জমির স্বত্বাধিকারের তথ্যাদি একত্রিত করবার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, কর্মীদের কোড অব কন্ডাক্ট চালু করাও আগে দরকার, অনলাইনে বুকিং বা বাস চলাচলের তথ্যাদি জানাবার পরিষেবাও শুরু হওয়া উচিত, সবকিছু গুছিয়ে নিতে সময় লাগবেই, জানালেন চেয়ারম্যান মিহিরবাবু। 'তবে আমরা যে কোনও গঠনমূলক প্রস্তাবকেই স্বাগত জানাই'— প্রবল উৎসাহের সুর মিলল তাঁর শেষ কথায়।

এখন ডুয়ার্স ব্যুরো

বিষয় ডুয়ার্স

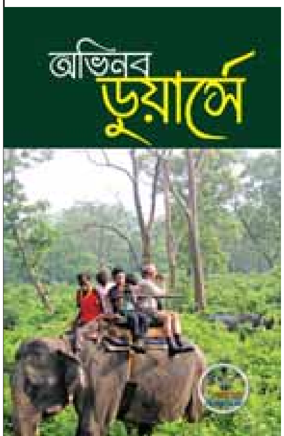

অভিনব ডুয়ার্সে।
প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২০০ টাকা

ডুয়ার্স থেকে দিল্লি।
দেবপ্রসাদ রায়। ১৫০ টাকা

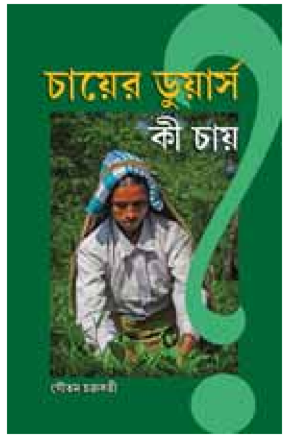

চায়ের ডুয়ার্স কী চায়?
গৌতম চক্রবর্তী ১১০ টাকা

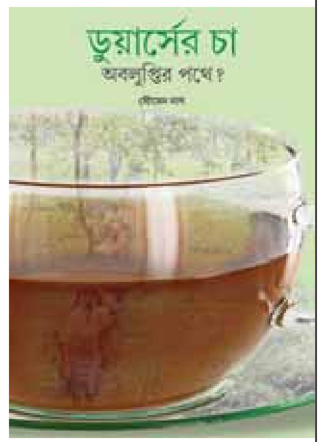

ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে?
সৌমেন নাগ। ১৫০ টাকা

ডুয়ার্সের সেরা তিন লেখকের গল্প সংকলন

ডুয়ার্সের গপ্পোসপ্পো।
সাগরিকা রায়। ১৫০ টাকা

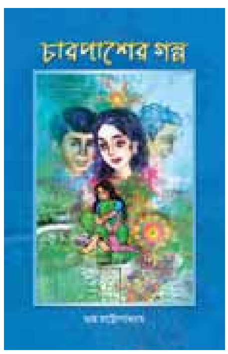

চারপাশের গল্প।
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১০০ টাকা

লাল ডায়েরি।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা

প্রথম পেপারব্যাক থ্রিলার

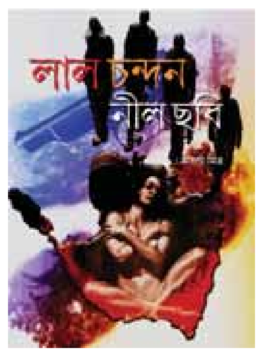

লাল চন্দন নীল ছবি।
অরণ্য মিত্র। ১১০ টাকা

পকেট পেপারব্যাক

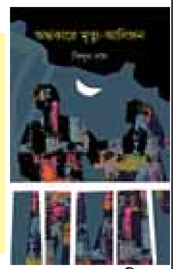

অন্ধকারে মৃত্যু-আলিঙ্গন।
বিপুল দাস। ৫৫ টাকা

পকেট পেপারব্যাক

মেঘের পর রোদ।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ৫৫ টাকা

ছোটদের জন্য প্রথম বই

সবুজ মনের গল্পগুলি। রীতা রায়। ১২৫ টাকা

ডুয়ার্সের কাব্য চর্চা

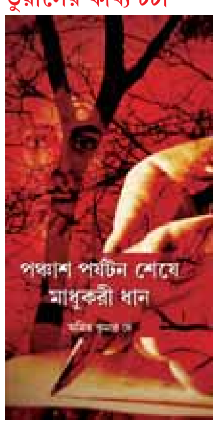

পঞ্চাশ পর্যটন শেষে মাধুকরী ধান
অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা

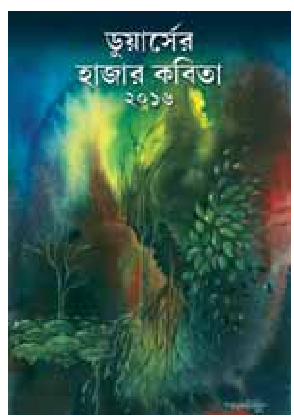

ডুয়ার্সের হাজার কবিতা।
অমিত কুমার দে সম্পাদিত। ৫০০ টাকা

পকেট পেপারব্যাক

কুহুলিয়াদের দেশে।
সুকান্ত গাঙ্গুলী। ৫৫ টাকা

বাড়িতে বসে বই পেতে গেলে মেল করুন **ekhondurars@yahoo.com**

বই আপনার কাছাকাছি কোথায় পাওয়া যাবে জানতে ফোন করুন
উত্তরবঙ্গে ৯৮৩০৪১০৮০৮, কলকাতায় ০৩৩-৪০৭০ ১৪৪৪

বিষয় পর্যটন

সুলভ সংস্করণ ৪৯৫ টাকা

আমাদের পাখি। তাপস দাশ ও উজ্জ্বল ঘোষ।

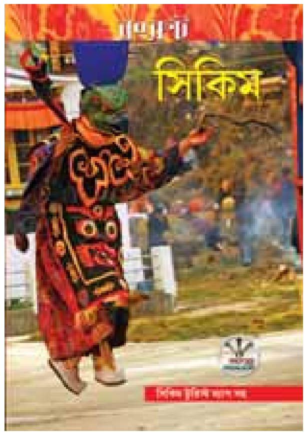

সিকিম।
সংকলন। ২০০ টাকা

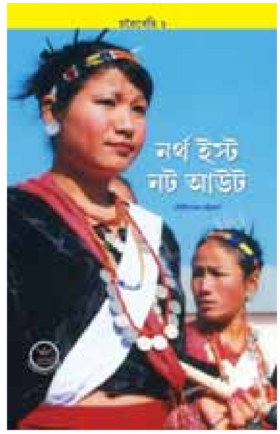

নর্থ ইস্ট নট আউট।
গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা

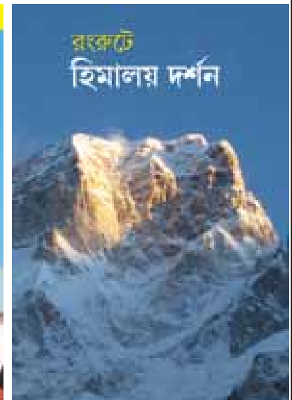

রংরুটে হিমালয় দর্শন।
সংকলন। ২০০ টাকা

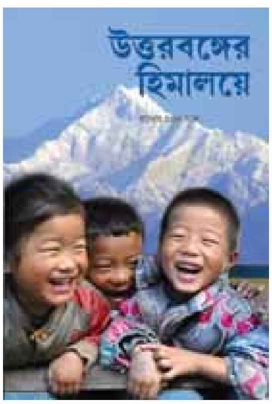

উত্তরবঙ্গের হিমালয়ে।
প্রদোষ রঞ্জন সাহা। ২০০ টাকা

সব্যসাচীর সঙ্গে জলে জঙ্গলে। ২য় খণ্ড
১৫০ টাকা

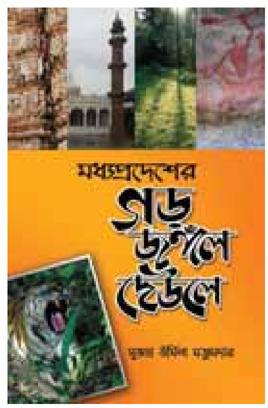

মধ্যপ্রদেশের গড় জঙ্গল দেউলে।
সুভদ্রা উর্মিলা মজুমদার। ২০০ টাকা

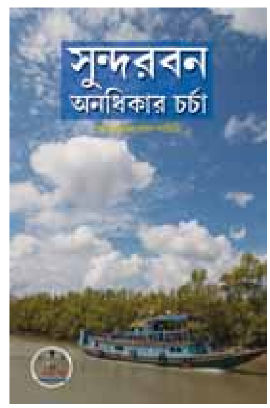

সুন্দরবন অনধিকার চর্চা।
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী। ১৫০ টাকা

ধর্মীয় পর্যটনে কোচবিহার

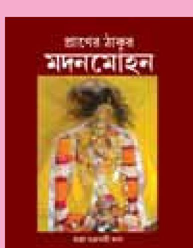

প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন।
তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস। ১১০ টাকা

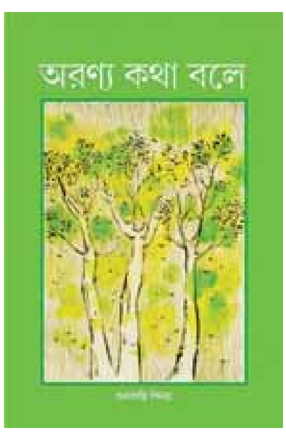

অরণ্য কথা বলে।
শুভ্রকান্তি সিনহা। ১৫০ টাকা

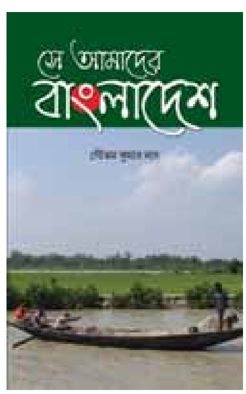

সে আমাদের বাংলাদেশ।
গৌতম কুমার দাস। ২০০ টাকা

পাসপোর্ট প্রতিবেশিদের পাড়ায়।
দীপিকা ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা

বই আপনার কাছাকাছি কোথায় পাওয়া যাবে জানতে ফোন করুন উত্তরবঙ্গে ৯৮৩০৪১০৮০৮, কলকাতায় ০৩৩-৪০৭০ ১৪৪৪

বাড়িতে বসে বই পেতে গেলে মেল করুন rongroute.travelmag@gmail.com

যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রাখলে বেসরকারি পরিবহণে কড়া সরকারি লাগাম অত্যন্ত জরুরি

উত্তরবঙ্গে নতুন এলে অনেকেই পথেঘাটে বেসরকারি বাসের দুটি ছবি দেখে খানিক অবাক হয়ে যান। এক বাসে ভাড়া দিলেও তার বিনিময়ে টিকিট দেওয়ার চল নেই সর্বত্র। আর দুই, বহু বেসরকারি বাস প্রায় হুবহু এনবিএসটিসি বাসের মতো রং ও ডিজাইন নকল করে চলছে, উদ্দেশ্য যাত্রীদের সরকারি পরিবহণের উপর অন্ধ নির্ভরতার সুযোগ নেওয়া। এতে এনবিএসটিসি কর্মী-কর্তাদের বা পরিবহণ দপ্তরের কোনও হেলদোল আছে বলে মনে হয় না। তেমনই আরেকটি সত্যেরও প্রতীকী উদঘাটন হয়, তা হল বেসরকারি পরিবহণে সরকারি লাগামের বড়ই অভাব। অন্তত উত্তরবঙ্গে তো বটেই। আজ পথেঘাটে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটলে কয়েকদিনের জন্য প্রশাসন তেড়েমেরে ওঠে, তারপর আবার সেই নৈরাজ্য।

আসলে গোটা বঙ্গেই পরিবহণ পরিষেবা এক বিচিত্র শিল্প যেখানে শ্রমিক ও মালিক দু-পক্ষই ধর্মঘট ডাকে। শ্রমিকের থেকেও ধর্মঘটে এখন মালিকদেরই যেন একচেটিয়া অধিকার, ধর্মঘট যেন এখন মালিকানা রক্ষার হাতিয়ার। মালিকদের বক্তব্য তেলের দাম বাড়ার কারণেই তারা বাসের ভাড়া বাড়ানোর দাবি তোলেন সরকারের কাছে। অন্যদিকে পরিবহণ শিল্পকে বাঁচাতে পেট্রল, ডিজেলের দাম কমানোর দাবি তোলে শ্রমিকেরা, ডাকে ধর্মঘট। এ এক অদ্ভুত ধর্মঘট সহবস্থান, লক্ষ্য এক, উদ্দেশ্য আলাদা। এ রাজ্যে বেসরকারি বাস পরিষেবার হাল হকিকৎ, সরকারি বাসের পরিষেবার ক্রমোন্নয়ন, টোটো-অটো বিবাদ বিসম্বাদ, এককথায় জনপরিবহণ পরিষেবা কোন পথে জানতে হাজির হয়েছিলাম সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষজনের কাছে। অনেকেরই মতে, সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদির এ রাজ্যে বাসের ভাড়া যথেষ্ট বেশিই বলা যায়। আর বেসরকারি বাস পরিষেবায় সরকারি নজরদারি না থাকায় বহু বছর যাবৎ একপ্রকার যথেচ্ছাচার চলছে। আজও টিকিট বলতে আঙুল সমান টুকরো কাগজ, যাতে ভাড়ার অঙ্কসহ বাসের নম্বর বা রুট সবকিছুই অস্পষ্ট, কোথাও কোথাও আবার টিকিটের বালাই নেই। হাইকোর্টের রায়ে দূষণ সৃষ্টিকারি বাসগুলিকে অবশ্য শহর ছাড়তে হয়েছে এবং কিছু নতুন বাসের দেখা মিলছে বটে, কিন্তু তাতে গুণগত মানের কোনও হেরফের ঘটেনি। বসা বা দাঁড়ানোর জায়গা কোনও কিছুতেই বিধিনিয়মের বালাই নেই।

> বেসরকারি বহু রুটে শীত-গ্রীষ্ম বারোমাস বাস থাকে রাস্তায়। রাস্তা দখল করেই চলে সারাই-ঝালাই-ধোয়ামোছার কাজ। অর্থাৎ পার্কিংখাতে এই বাস মালিকদের এক পয়সাও খরচ নেই। যাত্রীদের মতোই চরম অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার বেসরকারি বাসের ড্রাইভার-কন্ডাকটরের মতো পরিবহণ শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারিরা, অনেকেরই মাস মাইনের পরিবর্তে কমিশনভিত্তিক রোজগার।

তার ওপর অতিরিক্ত যাত্রী তুলতে মুড়ির টিন ঝাঁকানোর মতো ঘন ঘন ব্রেক কষার যন্ত্রণা তো আছেই। আরও আছে পোড়া তেলের গন্ধ, ইঞ্জিনের বিকট শব্দ, জানলার কাঁচের বিরক্তিকর ঝনঝনানি। রোদ বৃষ্টি এড়াতে সেই পাল্লা তুলে খুলতে কালঘাম ছুটে যায়। যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে যাওয়া, ওভারটেক করতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়াও কমেনি, বরং বেড়েছে।

সরকারি বাসের ডিপো বলে একটি বস্তু আছে। বেসরকারি বহু রুটে শীত-গ্রীষ্ম বারোমাস বাস থাকে রাস্তায়। রাস্তা দখল করেই চলে সারাই-ঝালাই-ধোয়ামোছার কাজ। অর্থাৎ পার্কিংখাতে এই বাস মালিকদের এক পয়সাও খরচ নেই। যাত্রীদের মতোই চরম অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার বেসরকারি বাসের ড্রাইভার-কন্ডাকটরের মতো পরিবহণ শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারিরা, অনেকেরই মাস মাইনের পরিবর্তে কমিশনভিত্তিক রোজগার। সরকারের সদিচ্ছা থাকলে তাদের প্রথম কাজ হওয়া উচিত বিভিন্ন স্তরের অভিজ্ঞ লোকজনকে নিয়ে একটি পরিবহণ কমিশন গঠন করা যাঁরা সব দিক বিচার-বিবেচনা করে ন্যায্য ভাড়া ঠিক করবেন এবং যাত্রী-স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে বাস মালিকদেরকে বাধ্য করবেন। বহুদিন ধরেই এই রাজ্যের সাধারণ পরিবহণ, বিশেষ করে বাসের যাত্রীভাড়া বাড়েনি, যেখানে তেলের দাম বেড়েইছে, নিম্নমুখী হতে দেখা যায় কদাচ, সেখানে এই ভাড়া না বাড়িয়ে কতদিন পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাবে সেটাও বিবেচনার বিষয় বইকি। বাসমালিকদের লাভক্ষতির চাইতে এক্ষেত্রে সরকারের কাছে সাধারণ মানুষের সুবিধা-অসুবিধার দিকটাই অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রায় বছরখানেক ধরেই দেখা যাচ্ছে লোকসানের অজুহাতে রাস্তায় বেসরকারি পরিবহণ কমে গেছে। ফলে বাড়ছে সাধারণ

ঝুঁকি নিয়ে বেসরকারি বাসের মাথায় চেপেই যাতায়াত করে মানুষ

রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে যাত্রী তোলে ছোট গাড়িগুলিও

মানুষের দুর্ভোগ ও উদ্বেগ দুইই বাড়ছে।

উত্তরবঙ্গের পথেও আজ চোখে পড়ে এতদিনের নিরীহ সাধারণ মানুষগুলির সহিষ্ণুতা দিন কে দিন কমছে, ক্রমেই তারা প্রতিবাদের ভাষা বা প্রতিকারের আশা দুইই যেন হারিয়ে ফেলছে। রাস্তা আড়াল করে যত্রতত্র দাঁড়িয়ে থাকে বেসরকারি বাস, যাত্রী ভরতি না হলে টানা দাড়িয়েই থাকে, পেছনে অন্য গাড়ির লম্বা লাইন, অসহিষ্ণু ওভারটেক করতে গিয়ে উল্টোদিকের গাড়ির পথ অবরুদ্ধ, পুরো এলাকা জুড়ে যানজট, নির্বিকার চালক ও যাত্রী, খানিক দূরে অসহায় দর্শক হয়ে গুটিকয় সিভিক পুলিশ, এই ছবি সর্বত্র দৈনন্দিন। নির্দিষ্ট সময়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে ডাহা ফেল। কে করবে এর সমাধান? কে শোনে কার কথা? সেদিন যেমন ঘোলাটে চোখের এক গ্রামীণ বৃদ্ধকে বাসে আক্ষেপ করতে শুনলাম, নেতা-মন্ত্রী-পুলিশ সবাই তো ব্যস্ত চাকুরি বাঁচাতে। কই বদলের কাউন্টডাউন এখনও শুরু হল না?

আলিপুরদুয়ার বা কোচবিহার থেকে শিলিগুড়ি উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের বাসে লাগে সাড়ে তিন-চার ঘণ্টা, বেসরকারি বাসে চার-সাড়ে চার ঘণ্টা, সময়ে সময়ে আরও বেশি। যেসব বাসগুলি আলিপুরদুয়ার ছেড়ে হাসিমারা-বীরপাড়া-বানারহাট-মালবাজার হয়ে শিলিগুড়ি আসে সেগুলিতে সময় লাগে সরকারি বাসের তুলনায় অনেক বেশি। বছর কয়েক আগেও বেশ কিছুদিন সরকারি বাস পরিষেবায় কর্মসংস্কৃতি ও দুইই বাস প্রায় ছিল না, সেসময় যাইচ্ছেতাই রাজত্ব করে গিয়েছে বেসরকারি পরিবহণ। কিন্তু সময় বদলাচ্ছে, প্রশাসনে এসেছে গতি, সরকারের অভিমুখ গিয়েছে পাল্টে। তাই কোচবিহার বা আলিপুরদুয়ার থেকে আরও কম সময়ে বেসরকারি বাসের যাত্রী পরিষেবা দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে বাস মালিক, বাসকর্মী ইউনিয়ন, সিণ্ডিকেট, বাসের কর্মীবৃন্দ সকলেরই চিন্তা ভাবনা করা উচিত। ফালাকাটা বীরপাড়ায় দীর্ঘ বিরতি, ধূপগুড়িতে টানা দাঁড়িয়ে থাকা, ময়নাগুড়ির ভিতরে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়া— এই রোগ নির্মূল করতে না পারলে যাত্রী পরিবহণে উন্নয়নের দাবি বা স্বপ্ন কোনওটাই সম্ভব নয়। বাকি দুনিয়ার মতো উত্তরের জীবনযাত্রাতেও গতি আসছে, নতুন প্রযুক্তির বাস আরও বাড়তেই থাকবে সরকারি নিগমের, স্বল্প দূরত্বের রুটে বাড়ছে ম্যাজিক, জিপসি বা জিপ জাতীয় ছোট গাড়ি। এই চ্যালেঞ্জের মুখে ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে গেলে পুরনো বদভ্যাস ত্যাগ করাটা যে জরুরি এই সত্য বিলক্ষণ বোঝেন বাসমালিকেরা। যেমন জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি রুটে একসময়ে রমরমা রাজত্ব ছিল বেসরকারি সুপার বাসগুলির। যাত্রীদের সঙ্গে একশ্রেণির কন্ডাকটরের খারাপ ব্যবহার, এয়ারভিউ বা কদমতলায় নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করে গেলেও প্যাসেঞ্জার না হওয়া অব্দি দাঁড়িয়ে থাকা, রীতিমত রংবাজ পরিষেবা ছিল তাদের, রাস্তাও ছিল খারাপ। নতুন সরকার আসতে না আসতেই যেন ভোল পাল্টে গেল। রাস্তা ঠিক হল, তার আগেই নতুন সরকারি বাসে ভরে গেল জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি রুট। মিনিট পনের বাদে বাদেই বাস, হু হু করে পৌঁছে দিচ্ছে গন্তব্যে। মাসখানেকের মধ্যেই সব রংবাজি খতম, মানুষ খুশি। এখন হাতে গোনা কয়েকটি সুপার বাস, যার নির্দিষ্ট কোনও টাইম টেবল নেই। নামেই সুপার, সারাটা পথই প্রায় যাত্রী তুলতে তুলতে যায়, যাত্রীর চাইতে মাল বহন করে বেশি, সেটাই অস্তিত্ব রক্ষার পথ।

বেসরকারি বাস মালিকদের বক্তব্য, পুরনো বাস নিয়ে এখন অবৈধ সস্তার জ্বালানি আর রিসোল টায়ারে গ্রামীণ পকেট রুটে চালানো ছাড়া আর উপায় নেই, না হলে পেট চলবে না। তার ওপর সরকারি বিধিনিষেধ মরার ওপর খাঁড়ার ঘা। যেমন বর্তমানে জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি রুটে ২৪টি সুপার বাস এবং ২৪ টি মিনি বাস চলে, জলপাইগুড়ি-মালবাজার রুটে ২৫ টি মিনিবাস এবং ৪৫ টি ম্যাক্সি বাস চলাচল করে। হলদিবাড়ি রুটে ছোট এবং বড় বাস মিলিয়ে মোট ৫৫ টি গাড়ি প্রতিদিন চলাফেরা করে। সরকারি বাস জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি রুটে ২৪ টি, মালবাজার রুটে ১০ টি এবং হলদিবাড়ি ৭ টি নিয়মিত চলাচল করে। জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি, হলদিবাড়ি এবং মালবাজারে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম নতুন বাস চালাবার ফলে বেসরকারি বাসগুলি মার খাচ্ছে। জলপাইগুড়ি জেলা বেসরকারি পরিবহণ জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির আহবায়ক সুদীপ্ত ঘোষের অভিযোগ, বেসরকারি বাস মালিকেরা যে সমস্ত রুটে চালায় সার্ভে না করে একই রুটে অতিরিক্ত বাস চালাচ্ছে সরকার। সরকারি বাসে যদি লাভ না হয় সেক্ষেত্রে সরকার ভর্তুকি দিয়ে থাকে। কিন্তু বেসরকারি বাস চালিয়ে যদি লাভই না হয় তাহলে কীভাবে মালিক ব্যাংকের লোন পরিশোধ করবেন? কীভাবেই বা বাসের সঙ্গে যুক্ত এতগুলো পরিবার বাঁচবে?

কিন্তু কঠিন বাস্তব অস্বীকার করারও তো উপায় নেই। বেসরকারি বাসে ক্রমেই কমছে যাত্রীর সংখ্যা, উদ্বিগ্ন বেসরকারি বাস ও মিনিবাস সংগঠনের শীর্ষনেতৃত্বও, তাঁরা লক্ষ্য করে দেখেছেন সময় বাঁচাতে দাঁড়িয়ে হলেও মানুষ সরকারি বাসে যাতায়াত করছে, বেসরকারি বাসে চড়তে চাইছে না। অন্যদিকে যুগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলেছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা। এসি, জিপিআরএস, সিসি টিভিসহ একাধিক পরিষেবা সহ সরকারি দূরপাল্লার বাসে চালু করতে চলেছে ফ্রি ইন্টারনেট পরিষেবা। অতএব সুদীপ্তবাবুদেরও বোধহয় এখুনি কঠিন দিনের আশংকায় সমাধানের সহজ পথ বের করা উচিত। বিপ্লব আন্দোলন ঘেরাও অবরোধ করে সমাধান হবে না একথা এখন শিশুও বোঝে, সেই বাম আমল থেকেই মালিক বা শ্রমিকের ইউনিয়ন একই দলকে সমর্থন করে, প্রতিবাদ বা বিরোধিতা করবার জায়গাটাই এরাজ্য থেকে বহুকাল আগে হারিয়ে গিয়েছে। বরং সরকারি অনুশাসন কড়া হলে তা মেনে নিয়ে সরকারের সঙ্গে বসে রুট ভাগাভাগি করে নিলে, সময় মেনে গাড়ি চালালে, নিয়ম মেনে বাস স্টপে দাঁড়ালে, গাড়ি রাস্তায় রাখবার জন্য সরকারকে মূল্য ধরে দিলে, বাকি সবাইকে আইন মানতে বাধ্য করলে যাত্রীদের বিশ্বাস আস্থা যেমন ফিরে আসবে, তেমনই রক্ষা পাবে বেসরকারি পরিবহণ শিল্প ও তার সঙ্গে যুক্ত অসংখ্য পরিবার। পরিবহণ নিয়ে এখন সরকারি অবস্থান কিন্তু খুব পরিস্কার, সরকারের সঙ্গে চলো, নয়তো জাহান্নামে যাও।

গৌতম চক্রবর্তী

অপর্যটকের মন্ডলঘাট

কাদোবাড়ি হাটে ট্রেন থামে। লোকাল ট্রেন। হলদিবাড়ি থেকে এনজেপি যায়। কাদোবাড়ি হাট হল হল্ট স্টেশান। প্ল্যাটফর্মের বালাই নেই। ট্রেন থামে লেবেল ক্রসিং-এ। তার আগে দু'-পাশে দু'-খানা বাঁশ লাগিয়ে রাস্তা আটকানো হয়।

চৈত্র মাসের গরম। খুব একটা চাপ না হলেও রোদে দাঁড়ান যাচ্ছিল না। চিত্রগ্রাহক দেবরাজ কর খুব মন দিয়ে ক্যামেরা তাক করে কাদোবাড়ি হল্টের ছবি তোলার চেষ্টা করছে আর আমি স্থানীয় বিড়িতে ধরিয়ে ভাবছি ছোটবেলার কথা। জলপাইগুড়ি থেকে ট্রেনে কাদোবাড়ি হাট পৌঁছতে লাগে মিনিট দশেক। স্কুলে পড়ার সময় একবার বাড়ির অনুমতি নিয়ে তিনটের ট্রেনে কাদোবাড়ি হাটে নেমে পড়ে বেশ চমকে গিয়েছিলাম মনে আছে। চমকের কারণ আর কিছুই নয়। ট্রেন থামার স্থান নিয়ে আমার মনে যা যা ধারণা ছিল, কাদোবাড়ি স্টেশনে নেমে তা বিলকুল উবে গিয়েছিল। ট্রেন চলে যাওয়ার পর চারদিকে তাকিয়ে দেখি কেবল মাঠ, গাছপালা, তিস্তা ক্যানেলের খোঁড়াখুঁড়ি, কাঁচা রাস্তা আর দু'-তিনটে রুগ্ন চেহারার দোকান।

তারপর অনেক বছর চলে গিয়েছে। চলে যাওয়া বছরগুলোতে আমি কাদোবাড়ি হাটে কম করে পঞ্চাশবার গিয়েছি। আসলে আমরা যেতাম সাইকেল চালিয়ে বৈকালিক ভ্রমণে। ক্রমে ক্যানেলের কাজ হল। ক্যানেল বরাবর রাস্তা হল। আমাদের সাইকেল ভ্রমণের জন্য পাওয়া গেল নতুন পথ। সে পথ দিয়ে আমার যেতে শুরু করলাম মন্ডলঘাট পর্যন্ত। তিস্তা তখন মন্ডলঘাট ঘেঁষে বয়ে যেত এবং সেই বয়ে যাওয়া দেখতে দেখতে আমরা আড্ডা দিতাম। ক্রমশঃ দেখা গেল যে কাদোবাড়ি, কানাপাড়া, বোয়ালমারি, মন্ডলঘাট এলাকার লোকজনের কেউ কেউ আমাদের চিনে ফেলেছে এবং ঝাকুয়াপাড়ার এক চায়ের দোকানি আমাদের ধারে চা-বিস্কুট খাওয়াচ্ছে। কালের নিয়মে সেইসব ঘোরাঘুরি থেমে যাওয়ার পর বেশ কয়েক বছর কাদোবাড়ি-মন্ডলঘাটের পথে যাওয়া হয়নি। বছর তিন-চার আগে সদ্য গাড়ি কেনা এক বন্ধুকে যখন বললাম যে টুকটাক ঘুরতে যাওয়ার জন্য সে ওই পথটার কথা ভাবতে পারে, তখন সে একটু অবাক হয়েছিল।

জলপাইগুড়ি শহরের দক্ষিণ প্রান্তে পার্কের মোড় থেকে রাস্তা দু'-ভাগে ভাগ হয়ে একটা গেছে হলদিবাড়ির দিকে, আরেকটা কাদোবাড়ি-মন্ডলঘাট ছুঁয়ে শেষ অবধি ওই হলদিবাড়িতেই। কিন্তু দুটো রাস্তার মধ্যে পরিবেশগত পার্থক্য আছে। মন্ডলঘাটের পথ অনেক বেশি গ্রামীণ। সেই সময় ঝামেলা ছিল একটাই। এখন সেটা নেই। ঝামেলাটা রাস্তার। সেই ভাঙা পথ এখন চকচকে নতুন। মোটর বাইক চলছিল তরতরিয়ে। আমার সেই বন্ধুর সঙ্গে কদাচিৎ দেখা হলে সে জানায় যে, সুযোগ পেলেই সে গাড়ি চালিয়ে সকাল বেলায় ওদিকে যাচ্ছে।

পথটা একই রকম দেখব আশা করেছিলাম এবারও। তাই-ই দেখলাম। খোলা নিচু মাঠে জল জমে আছে। কচুরিপানার ফুল ছড়িয়ে আছে অনেকটা জায়গা জুড়ে। মাঝে মাঝে জমকালো বাঁশঝাড় আর তার পেছনে সবুজ গাছপালার দেয়াল। বিরাট খোলা আকাশ। এই

রাস্তা দিয়ে আমি নানা সময়ে সাইকেল চালিয়েছি। শেষ রোমাঞ্চকর ভ্রমণটা ছিল এক পূর্ণিমার রাতে। বন্ধু নিঝুমকে নিয়ে জলপাইগুড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম ঠিক রাত বারোটায়। একটা ই-স্কুটারে চেপে। ভোর বেলাতেও গিয়েছি দু'-তিন বার। জলপাইগুড়ি থেকে বাইকে বা গাড়িতে কেউ যদি হাওয়া খেতে এদিকে ভোর-সকালে চলে আসে তবে মাঝে মাঝেই আসতে চাইবেন। বস্তুতঃ এই কাদোবাড়ি-মন্ডলঘাট-কানাপাড়া-বোয়ালমারি এলাকায় জনবিস্ফোরণ ঘটেনি। তাই ফাঁকা জায়গার অভাব নেই।

কাদোবাড়ি যাওয়ার পথটা মূল পথ থেকে বাঁ দিকে টার্ন নিয়েছে। রাস্তাটা চিরকাল একই রকম ভাঙা দেখে আসছি বলে মনে পড়ছিল। সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন অথচ হাটে যাওয়ার রাস্তার এমন ভগ্নদশা দেখে সন্দেহ হল যে এদিকে বিরোধিরা বেশি বাস করে থাকতে পারেন। সেদিনই হাটবার মানে রবিবার, কিন্তু সকাল এগারোটায় হাট বসার কোনও লক্ষণ চোখে পড়ল না। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক। বেলা না গড়ালে আবার হাট জমে নাকি? তবে দোকানপাট খুলেছে বেশ কয়েকটা। তার একটা চা-বিস্কুট খেয়ে আরও মিনিট তিনেক বাইক হাঁকিয়ে হাজির হলাম স্টেশানে। আগেই বলেছি সে স্টেশান লেবেল ক্রশিং-এর ওপর। হলুদরঙা সিমেন্টের বোর্ডে কালো দিয়ে স্টেশানের নাম লেখাও আছে। তবে স্থানীয় লোকেরা একে বলে থাকেন 'জালিয়াপাড়া স্টেশান'।

এই স্টেশানে টিকিট কাটা যায় না।

স্কুল জীবনে দেখা কাদোবাড়ি স্টেশানের চেহারা খুব একটা বদলায়নি। অনেক দিন পর্যন্ত এদিককার লোক জলপাইগুড়ি যেত ট্রেনে চেপে, নয় তো সাইকেলে। ইদানিং অটো এসেছে। কিন্তু যেটা চোখে পড়ল না, তা হল টোটো।

আসলে তিস্তার পশ্চিম বরাবর এইসব এলাকার অনেকটাই ছিল নদীর প্লাবন ভূমি। তিস্তা এখন দূরে সরে গিয়েছে, কিন্তু মাটির উর্বরতা নিয়ে যায়নি। দু'-ধারের জমিতে চাষবাসের নমুনা দেখতে দেখতেই আসছিলাম। আলু ওঠার সময়। খেতময় দাঁড়িয়ে থাকা লাল রঙা আলুর বস্তা মাঝে মাঝেই চোখে পড়ছিল। কয়েক বছর হল ডুয়ার্সে ভুট্টা চাষ হচ্ছে পুরোদমে। লম্বা পাতাওয়ালা সে গাছ এদিককার খেতেও দেখতে পারছিলাম হঠাৎ হঠাৎ। হলদিবাড়ি হাটের সব্জির যে বিরাট খ্যাতি তার পেছনে এদিককার চাষিদের অবদান নেহাৎ কম নয়। সকাল বেলায় কাদোবাড়ি স্টেশানে এলে নির্ঘাৎ দেখতে পেতাম খেতের সব্জি ব্যাগে বা বস্তায় নিয়ে কৃষক দাঁড়িয়ে আছেন আটটার ট্রেন চেপে জলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়ি যাবেন বলে। কিন্তু সে ট্রেন সকালে চলে গেছে। এবার যাবে বারোটার ট্রেন যাকে আমরা ধরব মন্ডলঘাট স্টেশানে। একবার কচুয়া বোয়ালমারিতে বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে বিরাট এক পেয়ারা বাগানের অস্তিত্ব টের পেয়ে চমকিত হয়েছিলাম বটে!

কাদোবাড়ির লেবেল ক্রসিং ওরফে স্টেশন পেরিয়ে, তিস্তা ক্যানেলের পাশ দিয়ে মোটামুটি ভাল রাস্তা দিয়ে চললাম মন্ডলঘাটের দিকে। একপাশে ক্যানেল, হাঁটু ডোবা কালো কালো স্থির জল। আরেক পাশে নিচু জমি। জনবিরল। ক্যানেল পার হওয়ার জন্য ছোটো ছোটো সাঁকো। এই পথ দিয়ে বিকেলের দিকে যেতে যেতে একদা অনেক রকম পাখি দেখেছি, কিন্তু আজকের চৈত্র দুপুরে তাদের নজরে পড়ল না। তবে আর কিছু চোখে না পড়লেও দু'-চারটে রঙিন মাছরাঙা আশা করেছিলাম বটে! সে গুড়েও বালি পড়ল। মন্ডলঘাট আশা পর্যন্ত গোটা কয়েক বক আর ঘুঘু ছাড়া পক্ষীকূলের বাকি প্রতিনিধিদের দর্শন পাওয়া গেল না।

মন্ডলঘাট স্টেশানেও প্ল্যাটফর্ম নেই, তবে কাদোবাড়ির তুলনায় তার অবস্থা ভাল। লাল রঙের ছোট স্টেশান বাড়ির ওয়েটিং রুমে জনা বিশেক নারী-পুরুষ অপেক্ষা করছিলেন ট্রেনের জন্য। উল্টো দিকের টিকিট কাউন্টার তখনও খোলেনি। জানা গেল এই স্টেশানে রেলের কোনও স্টাফ নেই। কোনও একজনকে টিকিট বেচার ঠিকে দেওয়া হয়েছে। তাঁর কর্মচারি ট্রেন আসার মিনিট পাঁচেক আগে উদয় হলেন। কম্পিউটের কোনও প্রশ্নই নেই। খাঁকি রঙের ছোটো আকারের পুরু কাগজে ছাপা আগেকার যুগের টিকিট বিক্রি হয় এখনও এ স্টেশানে। দেখে রোমাঞ্চ হল। ট্রেন দাঁড়াল আধ মিনিট। কামরাগুলোর জানলা দিয়ে বেরিয়ে থাকা লাঠির আগায় গেরুয়া পতাকা দেখে মনে পড়ল আজ রামনবমী বটে! বিজেপির সমর্থকেরা চলেছেন জলপাইগুড়ির রাম মিছিলে যোগদান করতে।

ট্রেন চলে যেতেই মন্ডলঘাট স্টেশন প্রায় জনশূন্য। আমরা বেরিয়ে এলাম। রাস্তা থেকে স্টেশানে ঢোকার পথটা দোকানপাটে ঢাকা। বাইরে থেকে চট করে বোঝা যায় কী ভাবে যেতে হবে। স্টেশনে ঢোকার আগে যে দোকানটায় বসে পরোটা খেলাম সেটা দেখি বন্ধ হয়ে গেছে। দোকানের উল্টো দিকে শনি ঠাকুরের মূর্তি। ঘন নীল মুখে ফটফটে সাদা চোখ। সোজা তাকিয়ে আছেন দোকানের দিকেই। বলা যায় যে আমরা শনির দৃষ্টির সামনে বসেই পরোটা খেয়েছিলাম তখন। মনে হয় যে দোকানদার টানা বেশিক্ষণ শনির দৃষ্টির সামনে বাণিজ্য চালাতে অস্বস্তি বোধ করেন।

২০১১-এর সেন্সাস রিপোর্ট থেকে জানলাম যে মন্ডলঘাট গ্রামের আয়তন বাইশ হাজার হেক্টরের বেশি এবং লোক সংখ্যা যোলো হাজারের সামান্য ওপরে। শিক্ষার হার আর সেক্স রেশিও— দুটোই রাজ্যের গড় মানের চাইতে একটু উঁচু।

কিন্তু মন্ডলঘাটে এসে একদা যা মন ভরে দেখতাম তা হল তিস্তা। বিরাট চওড়া। মূল ধারাটা এদিকে দিয়েই বয়ে যেত। পাণ্ডব বর্জিত বাঁধে বসে দেখতাম বিচিত্র সব কীটপতঙ্গ। বাহারি গিরগিটি। বর্ণোজ্জ্বল পাখি। সে সব পুরনো কথা। এখন তিস্তাটা ঠিক কেমন আছে সেটা কি একবার দেখব না?

ফলে মন্ডলঘাট থেকে আবার ক্যানেল বরাবর পথ ধরে কিছুটা গিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরে পৌঁছোলাম তিস্তার পাড়ে। নদী যে সরে গিয়েছে তা স্থানীয় লোক আগেই জানিয়ে দিয়েছিল চায়ের দোকানে। কিন্তু সে সরণ যে এতটা তা ভাবিনি! আমি দেখলাম ধূ ধূ প্রান্তর। ঈষৎ ঘোলা প্রকাণ্ড আকাশ মিশে গিয়েছে দিগন্তে। দূরে দূরে ছড়িয়ে কয়েকটা অস্থায়ি ঘর। চাষবাসের কাজে কয়েকটা লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে। সাদা হয়ে আসা মাটির দিকে তাকান যায় না। চোখ ঝলসে যায় আস্তে আস্তে।

নদী নেই। আরও আরও পূবে সরে গিয়েছে তিস্তার ধারা। এখানে জল দেখতে হলে আসতে হবে বর্ষায়। মন খারাপ হয়ে গেল! তিস্তা না থাকলে মন্ডলঘাটের থাকল কী? ওপাড়ে বার্নেশ অথবা মেখলিগঞ্জ। এ পাড়ে অদূরেই হলদিবাড়ি ঘাট। একদা জলপথে বর্তমান ওপাড় বাংলা থেকে আসা নৌকো জমিয়ে রাখত মন্ডলের ঘাট। সে সব স্রেফ ইতিহাস। জলপথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে, জলও কি বন্ধ হয়ে যাবে? ১৯৬৮-এর বন্যায় জলপাইগুড়ি শহর তছনছ হয়ে গিয়েছিল। মন্ডলঘাটও ধ্বংস হয়ে গেছিল সেই তান্ডবে। তারপর থেকে সুউচ্চ বাঁধে ঘিরে দেওয়া হয়েছিল তাকে। চৈত্রের বিচ্ছিরি দুপুরে ধুলোময় বাঁধকে মনে হচ্ছিল লম্বা হয়ে পড়ে থাকা একটা ভঙ্গুর ঢিবি। ওপাড় থেকে চর ভাঙতে ভাঙতে তিস্তার মূল স্রোত আবার এ পাশে ফিরে এসে কোনও এক ভরা শ্রাবণের দিনে যদি সে ঢিবিতে একটা ঢুঁসো মারে তবে মন্ডলঘাটের কপালে দুর্যোগ আছে।

কিন্তু তার আগে তিস্তাকে ফিরে আসতে হবে।

সেদিন সন্ধ্যায় সৃষ্টি মাইমের সব্যসাচী দত্তের আহ্বানে 'মুক্তধারা' নাটকের ক্লোজড ডোর শো অভিনয় দেখতে দেখতে কয়েক ঘণ্টা আগে দেখে আসা ধূলিধূসরিত তিস্তার চেহারাটা মনে পড়ছিল। এ কালের বিভূতিদের কল্যাণে তিস্তা এখন বদ্ধধারা। অভিজিৎরা আর কি আসবে তাকে মুক্ত করতে?

নরম ভোরবেলায়, থমথমে মেঘলা দিনে, টিপটিপ বরিষণে, শান্ত বিকেলে মন্ডলঘাট কাদোবাড়ির আশপাশ দিয়ে ঘুরে এলে মন্দ লাগবে না। দারুণ কিছু দেখার আশা নিয়ে যাবেন না কিন্তু। কেবল গ্রামের পরিবেশ দেখতে যাবেন বলে বেরিয়ে পড়বেন। তিস্তার ধু-ধু চরে বিকেল বেলায় হাঁটতে ভাল লাগবে। মনে হবে পৃথিবী অনেক বড়। মন্ডলঘাটে পর্যটকদের দেখার কিছু নেই, কিন্তু প্রকৃতি প্রেমিকদের দেখার অনেক কিছু আছে।

মানে, প্রেমের জন্য প্রকৃতি আছে।

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

ছবি: দেবরাজ কর

নদী-জঙ্গল-চা বাগানের কোলে ঘুমন্ত

শালকুমার

গ্রামের নাম জলদাপাড়া, ফরেস্ট রেঞ্জ জলদাপাড়া(পূর্ব), জাতীয় উদ্যানের নামও জলদাপাড়া। শহুরে অতিথি-পর্যটকদের জন্য এখানেও আছে জিপসি ও হাতি সাফারি। অথচ শহরের শতকরা নব্বইভাগ টুরিস্ট এর কথা জানেন না। এপথে এখনও ভিড় কম। টুকটাক রিসর্ট লজ গড়ে উঠেছে কিন্তু হালে পানি পাওয়ার মত কিছু হয়নি। তোর্সা থেকে বেরিয়ে আবার তোর্সায় মিশেছে ছোট্ট নদী সিসামারা, বছরভর জল থাকে এই নদীতে, বর্ষায় রূপ ভয়ংকর, ভেসে যায় বড় বড় গাছের গুড়ি, মায় বিশাল গন্ডারও। পূর্বপাড়ে জাতীয় উদ্যানের কোর এরিয়া, নদীতে জল খেতে আসে হাতির পাল, হরিণ। পশ্চিম পাড়ে ছোট ছোট গ্রাম, চা বাগান। গাড়ির হর্ণের আওয়াজ পৌঁছয় না, প্রকৃতির মধ্যে সমাহিত হতে চাইলে এর চেয়ে ভাল জায়গা গোটা ডুয়ার্সে মিলবে না। সংরক্ষণমূলক ইকো পর্যটনের আদর্শ নিরীক্ষা কেন্দ্র হতে পারে আলিপুরদুয়ার জেলার অন্তর্গত শালকুমার পঞ্চায়েতের এই ছোট ছোট হ্যামলেটগুলি।

ফালাকাটা থেকে আলিপুরদুয়ার যাওয়ার পথে তোর্সা সেতুর আগেই বাঁ হাতে চলে গেল যে পথ সে পথের শেষেই দেখা মিলবে শালকুমারের জলদাপাড়া, তাতে নিশ্চয়ই থাকার জন্য আসা হয়নি? না হওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়। কারণ এখানে আপাত দৃষ্টিতে গ্রাম্য পরিবেশের ছবিটাই স্পষ্ট, বাকিটা দেখতে হলে থাকতে হবে। এখানে কেউ সাজিয়ে গুছিয়ে এনে নৈসর্গিক দৃশ্যের তৈরি থালা আপনাকে পরিবেশন করবে না। আপনাকে খুঁজে নিতে হবে। সেজন্যে স্থানীয় লোকেরা আছেন, তাঁরা আপনাকে সাহায্য করবেন।

রাজমহলের পাশেই তাজমহল!

সেদিন শালকুমারহাটে পৌঁছে বাঁদিকে একটা রাস্তা ধরে আমরা গেলাম রিসর্ট এভারেস্টের সন্ধানে। ওখানেই থাকবার বুকিং আছে। এখান থেকে জলদাপাড়া ফরেস্টের গেট পাঁচ মিনিট। রিসর্টে ঢোকার সময় বড় একটা গেট দারোয়ান এসে খুলে দিল। গাড়ি নিয়ে কয়েক সেকেন্ড চলতেই সামনে বিশাল এলাকা জুড়ে খোলা জায়গা। সেখানে বাঁদিক দখল করে আছে তিনটে উঁচু টিলা। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয় টিলায়। প্রথমটায় একটি কটেজ কোচবিহারের রাজবাড়ির আদলে। তার নাম 'রাজমহল'; দ্বিতীয় টিলাটাতে রয়েছে ছোটখাট একটি তাজমহল। তার নাম ওটাই। তৃতীয় টিলার অর্ধসমাপ্ত কাজ দেখে বোঝা গেল, পরে শোনাও গেল যে ওটা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল তৈরি হচ্ছে। ডানদিকেও তিনটে টিলা বানানো রয়েছে কিন্তু তাতে কোনও ইঁট গাঁথা হয়নি এখনও। মনোজ রায় (ফোন ৮৭৬৮২০৯০২৬), রিসর্টের মালিককে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এই দুটোই ঘর? দেখালেন, প্রতিটা ঘরের বেসমেন্টেও একটা করে ঘর আছে। সবমিলে মোট পাঁচটা। আমাদের জন্য বরাদ্দ ওই রাজমহল। বেসমেন্টের ঘরগুলো দেখে হানিমুন কাপ্‌লদের কথা মনে হচ্ছিল। এত প্রাইভেসি কোথাও মিলবে কিনা বলা মুশকিল। আমাদের কটেজের ভেতর ঢুকে দেখলাম বিশালাকৃতির একটাই রুম। ডানদিকে বিছানা, বাঁদিকে বাথ রুম। ঠিক মাঝখানে গম্বুজ থেকে একটা ঝাড়বাতি ঝোলানো যেটাতে ইচ্ছে করলে ব্লুটুথ কানেকশন করে পছন্দের মুডের গান চালিয়ে যাওয়া যেতে পারে। অবশ্যই ইউটিউবে। শুধু তাই না, বাতি থেকে নানান রঙের নানান মুডের আলো তো বেরোচ্ছেই।

দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে হাঁটতে হাঁটতে সামনের সীমানা পর্যন্ত গিয়ে উঠলাম উঁচু ঢিবিতে। সঙ্গে বাইনোকুলার ছিল। সামনে অনেকটা ঘাসের জঙ্গল দেখা যাচ্ছে যেটা মিশে গেছে জলদাপাড়া অরণ্যের সঙ্গে, শুনলাম ওখান দিয়ে আগে তোর্সা বইত, এখন ঘুরে গিয়েছে। ওই তৃণভূমি নাকি বনবিভাগের হাতেই গড়া। ফরেস্টের দিকে বাইনোকুলার তাক করে চেয়ার নিয়ে বসে রইলাম অনেক্ষণ। পাখির রকমারি দেখতে দেখতে তো চোখ আর সরানোই

> শালকুমার গ্রামের প্রকৃতিতে এখনও সারল্য আছে। স্বচ্ছতা আছে। মানুষের উৎশৃঙ্খল হাত পড়েনি বলেই হয়ত গ্রামটা অবিকৃত এখনও। তবে হ্যাঁ মানুষ যেমন ডেভেলপমেন্ট আর টুরিজমের নামে ইকোলজির বিনাশ করছে বিনা বিবেচনায়, তেমনই আবার মানুষই ইকোলজি নিয়ে সবচাইতে বেশি চিন্তিত। শালকুমার এমনই একটা জায়গা যেখানে ফরেস্টের অনুভূতি আছে পুরোপুরি, নদী আছে জলে পূর্ণ হয়ে, চা বাগানের সবুজ আছে। এমনটাই থাকুক না।

যাচ্ছিল না। নানান জাতের, নানান মাপের, নানান রঙের। একটা পাখি দেখলাম, বললে বিশ্বাস করবেন না, এক্কেবারে ফড়িং বলে ভুল হবে প্রথমটায়। লম্বা লম্বা ঘাসের ডগায় ডগায় বসে আছে দিব্যি, এমনই হালকা ঘাসের সরু ডগার এতটুকুও হেলদোল হয়নি। আর একটা তো ভাবলাম প্রজাপতি উড়ে যাচ্ছে বোধহয়, না না, একদম না। পাখি। ওদের নামধাম জানি না, ইচ্ছেও নেই খুব একটা জানবার, কিন্তু নেশায় পেয়ে বসেছিল যেন।

পশ্চিমে সূর্য ঘুমোতে যাওয়ার উপক্রম করতেই উঠে পড়লাম। কটেজের কাছে ফিরে আসতে বাধ্য হলাম রক্তচোষার উপদ্রবে। শুধুমাত্র পৃথিবীর ভয়ংকর ক্ষুদে আপদগুলো যদি না সারা গায়ে হুল ফোটাত তাহলে আরও কতক্ষণ যে বসে থাকতাম কে জানে! ওমা! নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখি গ্রামের দু' তিনজন মহিলা পুরুষ বাচ্চাকাচ্চাসহ আমাদের জানালা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে ভেতরে। ব্যাপারটা কী? জিজ্ঞাসা করে জানলাম, এখানে নাকি রাজবাড়ি আর তাজমহল দেখার জন্য সারাদিন দর্শকের আনাগোনা লেগেই থাকে। আমাদের মতো শহুরে জাত মধ্যবিত্তের কাছে কথাটা শুনতে বোকা বোকা লাগলেও আমি এক মুহূর্তের জন্য গ্রাম্য মানুষগুলোর অন্তর স্পর্শ করে ফেলতে পেরেছিলাম। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যাদের কেবল পেটের চিন্তা তাদের কাছে তাজমহল তো স্বপ্ন, কোচবিহারের রাজবাড়িটাও নাগালের বাইরে। কিন্তু দেখতে ইচ্ছে করে নিশ্চই, বেড়াতে যেতেও ইচ্ছে করে হয়ত! পৃথিবীতে জন্ম নিয়েও পুরো পৃথিবীটাই অধরা। এখানে তবু দুধের স্বাদ ঘোলে মিটছে। তবে এই সাদাসিদে মানুষগুলোকে দেখে কষ্ট হচ্ছিল এই ভেবে যে ঘোলটাকেই কেমন দুধ ভেবে পিপাসা মেটাচ্ছে! মডেল রাজবাড়ি জেনেও তার ভেতর উঁকি দিয়ে দেখছে ভেতরটা না জানি কেমন। বিকেলবেলা প্রায়ই এরা দশ টাকার টিকিট কেটে প্রাসাদ দুটো দেখতে আসে, এটুকুই তাদের বিনোদন যাপন। শুধু গ্রামের মানুষেরা নন, লোকমুখে শুনে দূর থেকেও অনেকে একবার চোখের দেখা দেখতে আসে, এমনকি গাড়ি নিয়েও।

রাত্তির তখন দশটা। সার্চ লাইট নিয়ে আবার ওই টিলায়। পাশের গাছগাছালির মধ্যে হাতির শব্দ। আমার পরিবারের খুদে সদস্যেরা চোখ দুটোকে ওদের শেষ চেষ্টা অব্দি খুলে ফেলেছে, ঠোঁট দুটো ঝুলে গেছে, মুখ হাঁ। চারিদিক ফাঁকা, ধূধূ অন্ধকার শুধু। গা ছমছমে ব্যাপার একটা। রোমাঞ্চ জাগছিল বৈকি! খানিক বাদে গাছ মুড়তে মুড়তে তিনি চলে এলেন আমাদের কটেজের এক্কেবারে উল্টোদিকে, গ্রামেরই একজন লোকের বাড়ির পেছন দিকটায়। এটা ওদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, ফলে, টিন, পটকা, আলো আরও কীসব নিয়ে বেরিয়ে এসে হাতি তাড়ানো হল নিশুতি রাত্তিরে। শুনলাম, আজকাল নাকি আর পটকা-ফটকায় বড় একটা ভয় পায় না ওরা। ইচ্ছে হয় তাই চলে যায়।

কৃষ্ণাঙ্গ তরুণ ব্যাধ? নাকি অরণ্যের অনার্য রাজপুত্র কোনও?

সে রাতে ঐরাবত পরিবারের ভোজন অসমাপ্ত ছিল কিনা জানি না। রাঁধুনী রথীনবাবুর অনবদ্য মেনু উদরস্থ করে বড় বড় ঢেকুর তুলে আমরা সবাই ঘুমোতে গিয়েছিলাম এগারোটা নাগাদ। পরদিন সকালের প্রথম ফুটফুটে আলোয় শালকুমারকে দেখলাম, ঘুমের ঘোর তখনও কাটেনি বোধহয়, মনে হল যেন শাল শিমুলের জঙ্গলে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে এক কৃষ্ণাঙ্গ তরুণ ব্যাধ, নাকি অরণ্যের অনার্য রাজপুত্র কোনও, রাত জাগার ক্লান্তিতে তার অবিন্যস্ত লম্বা চুল, ধনুক, তির-তূণ। ভাবলাম যাই একবার ওর কপালের চুলগুলি যত্ন করে সরিয়ে দিয়ে আলতো করে ডাকি। ছোটদের ডাকাডাকিতে তা আর হল না। মাথাটা কেন যে ঠিক খুলছে না, আজকাল এইসব সিন্থেটিক পানীয়তে কী মেশায় কে জানে বাবা!

তবে খানিক বাদে দেখা মিলল আরেক গ্রামীণ তরুণের। অনুজ, সদাহাস্য মুখ, আমাদের সঙ্গে বাইক নিয়ে চলল আশপাশ দেখাতে। আমরা অবশ্য জঙ্গল সাফারি করিনি। এখানে সে সুযোগও আছে। জীপ সাফারি কিংবা এলিফ্যান্ট সাফারি যে কোনওটা করতে চাইলে রিসর্ট থেকেই আপনাকে বন্দোবস্ত করে দেওয়া হবে। আমরা গাড়িতে, অনুজ ওর বাইকে। গ্রামের রাস্তার বাঁক আর বাঁক পেরোচ্ছি কেবল, গুলিয়ে যাচ্ছিল প্রথমটায়। পরে ঠাহর করতে পারলাম। বেশিরভাগ বাড়ির লোকেরাই সুপুরির ওপর নির্ভরশীল মনে হল। প্রায় প্রতিটা বাড়িতেই অনেক সুপুরি গাছ। আবাদি জমি কিন্তু এদিকটায় চোখেই পড়ল না। শুনলাম হাতির উৎপাতেই তা সম্ভব হয় না। চা-বাগানের মধ্যে এসে থামলাম। কচি কচি নতুন পাতায় ভরে গেছে চা-গাছগুলো। নতুন কুঁড়ি ছাড়ছে। পাম্পে জল দেওয়া চলছে। এত সবুজ আর সবুজ দেখলে চোখ না জুড়িয়ে পারে! শরীরটা ঠান্ডা হয়ে গেল, সেই সঙ্গে মন শান্ত। চা-বাগানের কাঁচা রাস্তা ধরে আমরা উঠে গেলাম বাঁধের ওপর। বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে যেন বিস্ময়ের আর এক কপাট উন্মোচন করল কেউ। সামনে সিসামারা নদী, শেষ হলেই ঘন অরণ্য। পেছন ফিরলাম। কেবল সবুজ। চা বাগান, নদী, জঙ্গল সবটা মিলে আমার তখন পাখি হতে ইচ্ছে করছিল। হুহু করে বাতাস এসে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছিল আমায়। আমি যাইনি। কপট লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি।

শালকুমার গ্রামের প্রকৃতিতে এখনও সারল্য আছে। স্বচ্ছতা আছে। মানুষের উৎশৃঙ্খল হাত পড়েনি বলেই হয়ত গ্রামটা অবিকৃত এখনও। তবে হ্যাঁ মানুষ যেমন ডেভেলপমেন্ট আর টুরিজমের নামে ইকোলজির বিনাশ করছে বিনা বিবেচনায়, তেমনই আবার মানুষই ইকোলজি নিয়ে সবচাইতে বেশি চিন্তিত। শালকুমার এমনই একটা জায়গা যেখানে ফরেস্টের অনুভূতি আছে পুরোপুরি, নদী আছে জলে পূর্ণ হয়ে, চা-বাগানের সবুজ আছে। এমনটাই থাকুক না। ইকো-টুরিজম মানে সারি সারি কটেজ গড়া নয়, বা কেবল 'নো-প্লাস্টিক' নয়, তার অনেক আগে মজ্জায় ঢোকাতে হবে 'প্রকৃতির সংরক্ষণ', সেটাই আমাদের সরকার বাহাদুর এখনও বোঝাতে শুরু করল না। সেই ইকো-টুরিজমের নামে এর সর্বনাশ আর নাই বা করলাম!

শ্বেতা সরখেল

ছবি অতনু সরখেল

ভরা শ্রাবণের সেই শালকুমার কি ভোলা যায়?

বছর দুয়েক আগের এক বর্ষায় ডুয়ার্সের মনমোহিনী রূপের স্বাদ নিতেই পৌঁছে গিয়েছিলাম আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা ব্লকের ছোট্ট জনপদ শালকুমারে। মেইন রোড ধরে বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর শুরু হল কাঁচা রাস্তা। গোড়ালি-জলে দাঁড়িয়ে থাকা সবুজ ধান-খেতের মাঝ বরাবর চলা আঁকাবাঁকা পথ। চারদিকে পাট পচা গন্ধ।

এ গ্রামের নাম নতুনপাড়া। নীচু এলাকা। তাই সব বাড়ির মাটির উঠোনেই জল জমে রয়েছে। জিজ্ঞেস করতে করতে পৌঁছালাম সিসামারা নদী-বাঁধ সংলগ্ন এক লজে। 'রাইনো কটেজ' ৯৪৩৪৬০৭৮২৫/৯৪৩৪০৪৫৭২০। আগে থেকেই বুকিং থাকায় কেয়ারটেকার উপস্থিত ছিল। লোহার সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলাম। দুটো মাত্র ঘর। কোমর পর্যন্ত কাঠের বিটের ওপর কাচ লাগানো। কাচের ঘর বললেই চলে। ঘরে বসেই চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। ঘরের সামনে কাঠের রেলিং দেওয়া ব্যালকনি। তাতে বেতের রকিং চেয়ার পাতা, যেখানে বসে নিভৃতে উপভোগ করা যায় বর্ষায় খরস্রোতা নদীর উদ্দামতা। এককথায় 'অ-সাম', কোনও কথা হবে না!

> শালকুমারে প্রতি বৃহস্পতিবার হাট বসে। গাড়ি নিয়ে হাটে একচক্কর দিয়ে এসেছিলাম। সন্ধ্যেয় ব্যালকনিতে বসে মাছ ভাজা আর ফ্রায়েড চিকেন খেতে খেতে চোখ বুঁজে সিসামারার গর্জন শুনলে মনে হচ্ছিল যেন সমুদ্র-সৈকতে বসে আছি।

রিসর্টের বারান্দা থেকে দেখা যাচ্ছে সিসামারা নদীর ওপাড়ে জলদাপাড়ার জঙ্গল

মধ্যাহ্ন ভোজনের পরই বেরিয়ে পড়লাম। বাঁধের উপর দিয়ে গাড়ি নিয়ে প্রায় দু' কিলোমিটার পথ পেরোলাম। এখানে বাঁধ দেওয়া নেই। বোল্ডারের উপর তারজালি দেওয়া। সাবধানে নেমে সর্পিণী সিসামারাকে খুব সামনে থেকে লেন্সবন্দী করছিলাম। গোটা বাঁধ জুড়ে শুধুই বড় বড় গাছের গুঁড়ি আর ডালপালা শুকোতে দেওয়া। সঙ্গী ছিল কেয়ারটেকার ছেলেটি, জানাল, এইসব কাঠ

Hotel Yubraj & Restaurant Monarch (Air Conditioned)

Room	Single	Double
Super Deluxe (Non AC	Rs. 650	900
Deluxe AC	Rs. 990	1200
Super Deluxe AC	Rs. 1100	1300
VIP Deluxe AC	Rs. 2000	2000
Suite	Rs. 3000	3000
VIP Suite	Rs. 3500	3500
Extra Occupancy (N-AC)	Rs. 100	--
Extra Occupancy (SC)	Rs. 200	--

N.B. *Tax as per applicable*

Charu Arcade, B. S. Road, Cooch Behar
Tel. No. +91 9735526252, (03582) 227885/231710
Email: hotelyubrajcoochbehar@gmail.com
www.hotelyubrajcoochbehar.com

বর্ষার জলে জঙ্গল থেকে ভেসে আসছে গাছ, ডালপালা

নদীর জলে ভেসে আসে। গ্রামের লোক সেগুলিকে তুলে, রোদে শুকিয়ে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে। সারা বছরই এভাবে কাঠ ভেসে আসে কি? শুনলাম ভারী বর্ষায় নদী খরস্রোতা হলে তখনই বড় বড় গাছ ভূমিক্ষয়ে ভেঙ্গে পড়ে। অনেকসময় চোরাশিকারিরাও জঙ্গলের গাছ কেটে জলে ভাসিয়ে দেয়। পরে সেগুলো সংগ্রহ করে।

শালকুমারে প্রতি বৃহস্পতিবার হাট বসে। গাড়ি নিয়ে হাটে একচক্কর দিয়ে এসেছিলাম। সন্ধ্যেয় ব্যালকনিতে বসে মাছ ভাজা আর ফ্রায়েড চিকেন খেতে খেতে চোখ বুঁজে সিসামারার গর্জন শুনলে মনে হচ্ছিল যেন সমুদ্র-সৈকতে বসে আছি।

বৃষ্টি মাথায় শালকুমারে পৌঁছলেও দুপুরের পর থেকে বৃষ্টি উধাও। সেইসঙ্গে টানা লোডশেডিং। জঙ্গলে অন্ধকারটা মন্দ লাগছিল না ঠিকই তবে বৃষ্টি-প্রতীক্ষায় অধীর আমরা বারবার আকাশের দিকে চেয়ে বৃষ্টি কামনা করতে লাগলাম। রাত এগারোটা নাগাদ রিমঝিম ধারায় শুরু হওয়া বৃষ্টি রাত বাড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার দাপট দেখিয়ে চলল। ছাতা মাথায় একতলার ডাইনিং-এ গিয়ে ডিনার সেরে যখন বিছানায় গেলাম তখন প্রকৃতি জুড়ে কেবলই বৃষ্টির গান। আমাদের আনন্দ দেখে কে!

সকালে উঠে দেখি চারিদিকে শুধু জল আর জল। কাচের দরজা খুলে ব্যালকনিতে আসতেই দেখি বাঁধের উপর একদল মানুষ কাকভেজা হয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। কারো হাতে লাঠি, কারো হাতে লম্বা নাইলনের দড়ি গোল করে পাকানো, কারো কারো হাতে আবার অপেক্ষাকৃত সরু বাঁশের আগায়

“কারো হাতে লাঠি, কারো হাতে লম্বা নাইলনের দড়ি গোল করে পাকানো, কারো কারো হাতে আবার অপেক্ষাকৃত সরু বাঁশের আগায় শক্তপোক্ত করে বাঁধা দা কিংবা হাঁসুয়া। আঠারো থেকে আশি সব বয়সী পুরুষসহ মহিলাদের সে কি আনন্দোচ্ছ্বাস! আমরা শহুরে শ্রীমতিরা যারা রান্নার গ্যাস শেষ হলেই মোবাইল ফোনে হাত বাড়াই, পরের সিলিন্ডার বুক করবার জন্য, তারা কি এই জীবনযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করবার জন্য একবার বর্ষায় আসব এখানে?”

শক্তপোক্ত করে বাঁধা দা কিংবা হাঁসুয়া। আঠারো থেকে আশি সব বয়সী পুরুষসহ মহিলাদের সে কি আনন্দোচ্ছ্বাস! রাতারাতি কয়েকগুণ বেড়ে গেছে সিসামারার জল, নতুনপাড়া ডুবতে বসেছে, তবে এ কিসের উচ্ছ্বাস? উৎসাহ মেটাতে ছাতা মাথায় মাত্র কয়েক পা হেঁটে বাঁধের উপর উঠলাম। দেখি তীব্র জলস্রোতে ভেসে আসছে কাঠের গুঁড়ি, মোটা মোটা ডাল এমনকি গোড়াশুদ্ধ গোটা গাছ পর্যন্ত। যে বা যারা ধরবে সেই কাঠ বা গুঁড়ি তার বা তাদের। এরপর সেই কাঠ বাছাই হয়, ঘর বা আসবাব বানানোর কাজে লাগলে সেগুলি আলাদা করা হয়, বাকিটা গরীব মানুষগুলির বছরভর উনুন ধরাবার কাজে লাগে। হ্যাঁ, জঙ্গলের নিয়ম অনুযায়ী প্রকৃতির খেয়ালে পড়ে যাওয়া গাছের ডাল বা অংশে অধিকার থাকে অরণ্য সংলগ্ন মানুষদের। অবাক হলাম, এই তীব্র জলোচ্ছ্বাস উপেক্ষা করে বৃদ্ধ থেকে যুবক কাঠ ভেসে আসা মাত্রই লক্ষ্য স্থির করে ছুঁড়ে দিচ্ছে ফাঁস লাগানো দড়ি কিংবা গাছের কোনও অংশে আটকে দিচ্ছে বাঁশের আগায় বাঁধা দা। তারপর নদীর পাড় ধরে জনাকতক মিলে জলের গতির সঙ্গে বেশ কিছুটা পথ ছুটে সজোরে টেনে তুলছে সেই কাঠ। তারপর মহিলারা সেই কাঠ বাঁধের একপাশ দিয়ে সাজিয়ে রাখছে রোদে শুকোনোর অপেক্ষায়। বৃষ্টিতে কাকভেজা হয়ে জ্বালানি সংগ্রহের জন্য কী অমানবিক পরিশ্রম, সেই সঙ্গে জীবনের ঝুঁকি, না দেখলে বিশ্বাস হবে না! আমরা শহুরে শ্রীমতিরা যারা রান্নার গ্যাস শেষ হলেই মোবাইল ফোনে হাত বাড়াই, পরের সিলিন্ডার বুক করবার জন্য, তারা কি এই জীবনযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করবার জন্য একবার বর্ষায় আসব এখানে?

বৃষ্টিতে বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছিল। গরম কফির আস্বাদ নিতে ফিরে আসতেই বাঁধের উপর থাকা নতুনপাড়ার বাসিন্দারা চীৎকার করে বলল, এখনই লজ ছেড়ে চলে যান। চা-বাগান সংলগ্ন এলাকা (তখন সেখানে বাঁধ ছিল না) দিয়ে নদীর জল নতুনপাড়ায় ঢুকছে। বাণ এলে চার-পাঁচদিনের জন্য পথ-ঘাট সব বন্ধ হয়ে যাবে। ওদের কথামত চটপট ব্যাগ গুছোনো শুরু করলাম। শালকুমারে আর একটা দিন থাকার ইচ্ছে জলাঞ্জলি দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম অন্য গন্তব্যের উদ্দেশে। নতুনপাড়া ছেড়ে পাকা রাস্তায় ওঠার আগেই জলকাদায় গাড়ির চাকা আটকে গেল। সঙ্গে থাকা পথ-প্রদর্শক অর্থাৎ সেই কেয়ারটেকার ছেলেটি আশপাশের বাড়ি থেকে কোদাল চেয়ে এনে বৃষ্টিতেই মাটি কেটে রাস্তা তৈরির কাজে লেগে পড়ল। স্থানীয় মানুষেরও সহযোগিতা পেলাম। কোনওমতে গাড়ি উঠল। ওদেরকে টা টা করে বেরিয়ে পড়লাম আমরা, শ্রাবণের রোমাঞ্চ উপভোগ করতে আসা ভীরু শহুরে জীব, নিরাপত্তার খোঁজে পালিয়ে এলাম। তবু মনে মনে কামনা করছিলাম, ভাল থেকো তোমরা।

কাকলি মুখোপাধ্যায়

মন চায় মোর চায়

DOOARS

Mon Chai More Chai

আড্ডাঘর

মুক্তা ভবন, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি

যৌথ পরিচালনায়

শ্রীমতি ডুয়ার্স

এখন ডুয়ার্স

THE addaghar CLUB

A Community Development Project by NATIVE ECO SUSTAINABLE TOURISM SOCIETY

উওমানিয়া

ট্র্যাডিশন মেশে আধুনিকতায়

জেগে জেগে স্বপ্ন দেখাই জীবনে কিছু করার অনুপ্রেরণা জোগায়। 'উওমানিয়া'র জন্মটাও এইরকম স্বপ্ন দেখা থেকেই। 'উওমানিয়া' বুটিকের কর্ণধার দোলা গুহ নিয়োগী আসামের মেয়ে। এগ্রিকালচার নিয়ে পড়াশুনো করার পর সেই বিষয়কেন্দ্রিক চাকরি। চাকরি করতে গিয়ে গ্রামীণ মহিলাদের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ আসে। সেখান থেকেই কিছু করার একটা তাগিদ। কিন্তু কোনও কাজ করার সুযোগ কিংবা পরিকাঠামো কোনওটাই ছিল না তখন। এরপর বিয়ে হয়ে জলপাইগুড়িতে আসা। মেয়ে হয়। ডিজাইনিংয়ের স্বপ্ন যার মনের ভেতর ঘুমিয়ে ছিল এতকাল তা বাইরে আসার সুযোগ পেল এই প্রথম। মেয়ের জন্য জামা বানাতে গিয়ে। ডিজাইনিং আর সন্তানের জামা কাপড়েই সীমাবদ্ধ রইল না। ডালপালা মেলে তা বড়দের পোশাকেও পৌঁছে গেল। পোশাকে ধরা পড়ল আসাম, গুজরাত, রাজস্থান তো বটেই সর্বোপরি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন ট্র্যাডিশনাল টাচ। মজাটা হল, ট্র্যাডিশনাল, কিন্তু সময়োপযোগী আধুনিক, নতুন প্রজন্মের জন্য। তাই 'উওমানিয়া'র ট্যাগলাইন হল, 'হোয়্যার ট্র্যাডিশন মিটস্ মডার্নিটি'। ডিজাইনকে আপলিফট করার জন্য দোলা পৌঁছেছেন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন তাঁতী পাড়ায়। তাদের দক্ষ হাতকে কাজে লাগিয়ে ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে গামছা শাড়ি। তাঁতীদের দুর্দশা দেখে কিছুটা হলেও যদি সাহায্য হয় তাই অনুরোধ জানিয়েছেন সরকারকে। এদের নৈপুণ্য না হলে হারিয়ে যাবে একদিন। কালচারাল হেরিটেজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ হিসেবে ডিজাইনিংকে বেছে নিয়েছে 'উওমানিয়া'। সেইসঙ্গে কাজ করার জন্য আরও অনেক মেয়েরা এগিয়ে আসুক এই আশা রেখেছে, যাতে কিছু কর্মসংস্থানেরও সুযোগ হয়।

দোলা গুহ নিয়োগী

নিজস্ব প্রতিনিধি

ছবি সঞ্জু রায়

মেয়েরা সংস্কারে আটকে থাকে ভয়ে ? নাকি ভালবাসায় ?

শ্রীমতী ডুয়ার্স

ঘটনা এক

দেবতুষি যে কর্পোরেট হাউজে কাজ করে সেখানে মেয়েরা ওয়েস্টার্ন পোশাকেই স্বচ্ছন্দ। ও নিজেও তাই পরে এসেছে এতদিন ধরে। গোলমাল শুরু হল বিয়ের পর। শাখা-পলা-লোহা বাঁধানো-সোনার চুড়ি এসব যত আকর্ষণীয়ই হোক না কেন, তাঁতের শাড়িতে সুন্দর মানায় কিন্তু একেবারেই যায় না ট্রাউজার অথবা ওয়েস্ট কোটের সঙ্গে। অফিসে বেরনোর সময় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে উদ্ভট দেখায় নিজেকেই। অষ্টমঙ্গলার পর থেকে সে অনেকবার ভেবেছে, এসব খুলে ফেলে হালকা কিছু পরবে। হাত খালি রাখলেই বা ক্ষতি কী ? ওর আর তরুণের আপনি কোপনির সংসার। ওসব খুলে রাখলেও কেউ কিছু বলতে যাচ্ছে না। কিন্তু কেন যেন মনটা বড্ড খচখচ করে দেবতুষির। মাঝে মাঝে ও তাকায় তরুণের দিকে। কোথায় ? বৈবাহিক সম্পর্কের কোনও চিহ্নই তো তরুণ বহন করছে না তার শরীরে ? তাহলে যত দায় সবই ওর একার ? কিন্তু কী অদ্ভুত ! সমস্ত যুক্তি দিয়েও মনকে কিছুতেই বাধ্য করতে পারে না ও।

দিনের পর দিন শুধু অস্বস্তিটা বেড়ে গিয়ে কাঁটার মত খচখচ করে।

ঘটনা দুই

রানা স্যারের কোচিং থেকে ফিরছিল তিয়াসা অটোতে চেপে। সঙ্গে ওর মা'ও ছিলেন। প্রথমটা ঠিকই ছিল সবকিছু। তারপরই অদ্ভুত একটা ফিলিংস হল তিয়াসার। ওর পাশে বসে থাকা মাঝবয়সী সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক মাঝে মাঝেই ছলছুতোয় নোংরাভাবে স্পর্শ করছেন ওর শরীরের কোমল অংশগুলোকে। কিছুক্ষণ উশখুশ করে আড়চোখে মায়ের দিকে চাইল তিয়াসা। মায়ের নাকের ডগায় বিনবিনে ঘাম। মা মুখটা ঘুরিয়ে রেখেছেন বাইরের দিকে। নেক্সট স্টপেজ আসতেই তিয়াসার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে অটো থেকে নামালেন মা। হ্যাঁচকা টানে চোখে জল এসে গেল তিয়াসার। বাড়ি এখনও অনেক দূরে। ঠা ঠা রোদে ফাঁকা অটো স্টপে দাঁড়িয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠল ও। কঠিন মুখে বললেন মা, চুপ কর। মেয়েদের অনেক জ্বালা। এসব রাস্তাঘাটে হবেই। কমন ব্যাপার। মুখ বুজে মেনে নিতে শেখ। নয়তো নিজেই হাসির খোরাক হয়ে যাবি। প্রতিবাদ করতে গিয়েও চুপসে গেল তিয়াসা। সত্যিই তো, ও নিজেও তো চেঁচিয়ে উঠতে পারেনি লোকটার ওপর ? কেন ? কেন ?

ভোলা ভেটকির পাতুরি

ডুয়ার্সের ডিশ

উপকরণ: ২৫০ গ্রাম ভোলা ভেটকি মাঝারি সাইজের। কাল সরষে, কাঁচা লঙ্কা ও লবণ দিয়ে বাটা - ৪ চা চামচ। পেঁয়াজ বাটা - ১ চা চামচ, টক দই - ২ চা চামচ, টম্যাটো বাটা - ১ চা চামচ। কাঁচা লঙ্কা বাটা স্বাদ অনুসারে। লবণ - স্বাদ অনুসারে। ধনে পাতা - গার্নিসিংয়ের জন্য। সরষের তেল ২৫ গ্রাম। কলাপাতা ১ হাত সাইজের কয়েকটি।

প্রণালী: মাছ ভাল করে কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে জল ঝরিয়ে রাখুন, কলাপাতায় সোজা দিকে তেল মাখিয়ে একটু আগুনে সেঁকে নেবেন। অন্য দিকে মাছগুলিতে কাঁচা লঙ্কা লবণ দিয়ে বেটে রাখা সরষে বাটা দিয়ে ভাল করে মাখুন, তারপর পেঁয়াজ বাটা, টম্যাটো বাটা, কাঁচা লঙ্কা বাটা টক দই, লবণ ও সরষের তেল দিয়ে খুব ভাল করে মেখে আধ ঘণ্টা ম্যারিনেট করে রাখুন। তাওয়া গ্যাসে বসান তার ওপর সেঁকা কলাপাতাটি তাওয়ার ওপর বসিয়ে ম্যারিনেট করা মাছগুলো দিয়ে দিন ও কলাপাতা দিয়ে মুরে দিন ও একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখুন, গ্যাসের আঁচ প্রথম ১০ মিনিট কম করে রাখুন, তারপর বাড়িয়ে দিন তাতে বের হওয়া জল শুকিয়ে মাছের গায়ে লেগে যাবে ও সম্পূর্ণ স্বাদ মাছের মধ্যে ঢুকে যাবে। ঢাকনা খুলে দেখুন, যদি সম্পূর্ণ জল শুকিয়ে গিয়ে থাকে তবে গ্যাস বন্ধ করুন ও কলাপাতা থেকে বেড় করে ধনে পাতা দিয়ে সাজিয়ে গরম ভাতে খেতে দিন। দারুন লাগবে, ভোলা ভেটকি সমুদ্রের মাছ। এই মাছে যে সামুদ্রিক মাছের গন্ধ থাকে, এভাবে খেলে কোনও গন্ধ আপনি পাবেন না। আর এই মাছ ফ্যাট ফ্রি তাই সবাই নিশ্চিন্তে খেতে পারেন।

শ্রাবণী চক্রবর্তী

ঘটনা তিন

রোববারের দুপুর ফুরিয়ে গেছে কখন। বরের জন্য হাঁ করে বসে আছে পাপিয়া। ছুটির দিনটায় সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে সেই যে বেরোয়, তিনটে সাড়ে তিনটের আগে আর দেখা নেই তার। আড্ডা-তাস-বন্ধু-বান্ধব। এদিকে খাবার সব ডাইনিং টেবিলে জুড়িয়ে জল। প্রচণ্ড খিদেয় চিনচিন করছে পেটের ভিতরটা। বুবুন ভাত খেয়ে নিচের তলায় কম্পিউটারে গেমস খেলতে যাওয়ার আগে মা'কে ওভাবে বসে থাকতে দেখে একপ্রস্থ উপদেশ বাণী ঝেড়েছে। এমনকি তাপসও ফিরে এসে রাগারাগিই করে কিঞ্চিৎ। মুখে বলে, আমারটা ঢাকা দিয়ে রেখে তুমি খেয়ে নিলেই তো পারও। বেলা অবধি উপোস করার কী আছে? একটা দিন তোমার জ্বালায় একটু আড্ডা মারার যো নেই? সত্যিই তো। এক একসময় ভাবে পাপিয়া। কী হয় একদিন খেয়ে নিলে বরের আগে? কিন্তু ওই যে, শাশুড়ি সেই কবে শিখিয়েছিলেন। অমোঘ নিয়ম এ সংসারের। এখন মজ্জায় মজ্জায় মিশে গিয়েছে। বদলানো কি অতই সহজ রে ভাই?

ঘটনা চার

পাশের বাড়ির কল মিস্ত্রি হারুনের পাঁচ বছরের মেয়ে মিনুর আজ শিবঠাকুরের সঙ্গে বিয়ে। মজা দেখতে পাড়ার লোক ভেঙে পড়েছে মিনুদের বাড়িতে। বেনারসি-গয়নায় আপাদমস্তক মোড়া জুবুথুবু একরত্তি উপোসি মেয়েটা কিছুই বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে ওর মায়ের দিকে। বউদিটি শিক্ষিত। বিএ পাশ। জিগ্যেস করতেই বললেন, কী করব দিদিভাই, মানত করা ছিল মেয়ের সেই কোন ছোট বেলায়। না মানলে যদি কোনও অনর্থ ঘটে যায়? ওর বাবারও এটাই ইচ্ছে। বাড়ির লোকেও তাই বলল। এতজনের কথা অমান্য করলে আমার পাপ হবে না? বলুন তো?

ঘটনা পাঁচ

সুপ্রতীক দুম করে চলে গেল মাত্র তিনদিনের জ্বরে। বছর সাইত্রিশের বিপাশার জগতটা ধূসর হয়ে গিয়েছে। অ্যাড এজেন্সির চাকরিটা আর

> ধর্মের নামে গোঁড়ামি, ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে অন্ধ বিশ্বাসকে জীবনের পাথেয় করে চলছেন বহু নারী। নতুন ধরনের চিন্তা ভাবনাকে মোটেই তাঁরা প্রশ্রয় দিচ্ছেন না। হাঁচি, টিকটিকি, বেড়ালের রাস্তা কাটা, তেলপড়া, জলপড়া, বিধবাদের একাদশী পালন, এঁটো কাঁটা, জাতপাত, ছুঁতমার্গ —হ্যাঁ, এগুলো এখনও প্রদীপের তলার অন্ধকারের মতো রয়ে গিয়েছে আমাদের ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ করা আধুনিক গ্যাজেট নির্ভর সমাজের বিভিন্ন স্তরে স্তরে।

ফুটফুটে মেয়েটা ছিল বলে রক্ষে। নয়ত এই একাকীত্ব সে সইত কীভাবে। কলিগদের মধ্যে কয়েকজন খুবই ভাল বন্ধু। হইচই করে সিনেমা যাওয়ার প্ল্যান হয়েছে। বিপাশা ওয়ার্ডোব ঘাঁটছিল। উজ্জ্বল রংগুলো হাতছানি দিয়ে ডাকছিল ওকে। লাল, পার্পল, কমলা, মেরুন, পিঙ্ক। শাড়িগুলো নাড়াচাড়া করছিল সে পরম মমতায়। পরবে একটিবার? ঘন লাল সিল্কটায় কী যে মানাত ওকে। সুপ্রতীকের ফেভারিট কালার ওটা। পরক্ষণেই নিজের ভিতর থেকে এক রাক্ষুসি ঘুম ভেঙে জেগে উঠে ওর ইচ্ছেটার গলা মুচরে ধরল। নাহ, থাক। পাড়ার লোক, সোসাইটি, মিতিনের বন্ধু, তাদের মা-বাবা। সেদিন সিনেমাটা জমেনি। বিপাশার অকারণেই কান্না পাচ্ছিল বারবার।

এইরকম ভুরিভুরি উদাহরণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আমাদের চারপাশে। চোখ কান খোলা রাখলেই দেখা যায়। সমাজের বিভিন্ন স্তরে বসবাস করা নারীরা অল্পবিস্তর হলেও নিজেদের ভিতরের সংস্কার থেকে আজও মুক্ত হতে পেরেছেন কি? আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যে রকমফের থাকতে পারে, মানসিকতার ব্যবধানও রয়েছে বিভিন্ন জনের মধ্যে। কিন্তু আমরা প্রায় সকলেই সংস্কারের নানা বেড়াজালে নিজেরাই নিজেদের আবদ্ধ করে রেখেছি এখনও। একবার ভেবে দেখুন তো, যুক্তির নিরিখে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার খুঁটিনাটিকে বিচার করতে পারেন ক'জন? এখনও আমাদের চারপাশে চোখ মেললেই দেখা যায় অন্ধের মতো গতানুগতিক নিয়ম মেনে চলার করুণ প্রচেষ্টাকে। বস্তাপচা নিয়ম, নীতি, সংস্কার যা সমাজ এককালে তৈরি করেছিল নারীকে শাসন করে ঘরে বন্দি করে রাখার জন্য। আমরা কি মনের জানালাগুলো খোলা রাখতে পেরেছি? ধর্মের নামে গোঁড়ামি, ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে অন্ধ বিশ্বাসকে জীবনের পাথেয় করে চলছেন বহু নারী। নতুন ধরনের চিন্তা ভাবনাকে মোটেই তাঁরা প্রশ্রয় দিচ্ছেন না। হাঁচি, টিকটিকি, বেড়ালের রাস্তা কাটা, তেলপড়া, জলপড়া, বিধবাদের একাদশী পালন, এঁটো কাঁটা, জাতপাত, ছুঁতমার্গ —হ্যাঁ, এগুলো এখনও প্রদীপের তলার অন্ধকারের মতো রয়ে গিয়েছে আমাদের ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ করা আধুনিক গ্যাজেট নির্ভর সমাজের বিভিন্ন স্তরে স্তরে। ভেবে দেখুন তো, এখনও এই দুনিয়ায় অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হওয়ার পরও বহু নারীই মনে করেন যে তাঁদের একজন পুরুষ অভিভাবক অতি অবশ্যই প্রয়োজন। বেঁচে থাকতে গেলে একজন পুরুষ ছাড়া জীবনে যেন আর কোনও গতি নেই। স্বামী থাকলে তো কথাই নেই। না থাকলে ভাই অথবা দাদা অথবা কাকা-জ্যাঠা চলতে পারে। পুরুষ অভিভাবক ছাড়া পরিচিত দুনিয়ার গণ্ডি পেরতে এখনও ভয় পান বহু নারী। কিন্তু কেন এই ভয়? যখন আধুনিক সমাজে নারীদের ক্ষেত্র সর্বত্র? এ কি আমাদের সেই আজন্মলালিত সংস্কারকে আঁকড়ে ধরা নয়?

নিম্ন মধ্যবিত্ত স্তরে একটি নারী লোকের বাড়িতে খেটে যেটুকু রোজগার করছে পেটের দায়ে, তা সে তুলে দিচ্ছে তার মদ্যপ স্বামীর হাতে। কারণ আবারও সেই প্রাচীন সংস্কার।

'পতি পরম গুরু'। প্রতিবাদ যে একেবারেই নেই, তা নয়, কিন্তু সেটা যৎসামান্য। প্রতিবাদে জুটছে মার। কিন্তু তার বিনিময়ে পরদিন আবার চোখ মুছতে মুছতে মদ্যপ স্বামীর বমি পরিষ্কার করতে হচ্ছে সেই অভাগাদের। মধ্য ও উচ্চ মধ্যবিত্ত নারীরাও প্রায় একই পথে হাঁটছেন। পুরুষ অভিভাবকের কথাই যে শেষ কথা তা প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই মজ্জায় মজ্জায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের। স্বামী অফিস থেকে ফিরলে তাকে চায়ের কাপ এগিয়ে দেওয়া, জলখাবার বানিয়ে খাওয়ানো, স্বামীকে ও বাড়ির অন্যান্যদের খাইয়ে তারপর নিজে খেতে বসা, লোভনীয় খাবারটুকু তাদের জন্য বরাদ্দ রেখে নিজে কোনও মতে কিছু একটা গিলে নেওয়া, এসব তো খুবই চিরাচরিত উদাহরণ। হয়ত এর উল্টো চিত্রও আছে আমাদের সমাজে। কিন্তু তার সংখ্যা একেবারেই হাতেগোনা। এসব আর কতদিন চলবে বলুন তো? একটু নিজের দিকেও তাকান। অন্যদের কেয়ার করবেন অবশ্যই। তার সঙ্গে নিজেকেও একটু ভালবাসুন। প্যাম্পার করুন। যত্ন নিন। ভাল থাকার চাবিকাঠি কিন্তু আপনার হাতেই রয়েছে। মুঠিটা খোলার অপেক্ষা কেবল।

নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত বলিষ্ঠভাবে নেওয়ার ক্ষমতা কি এখনও তৈরি হয়েছে আধুনিকা অথবা প্রাচীনাদের মধ্যে? ছেলে মেয়ে ভবিষ্যতে কী নিয়ে পড়াশোনা করবে, তাদের কেরিয়ার থেকে আরম্ভ করে বাড়ির অন্যান্য খুঁটিনাটি জিনিসপত্র নিয়ে ডিসিশন মেকিংয়ের সময় যখন আসে, জোর গলায় মতামত জানাতে কুণ্ঠিত হন এখনও অনেক নারীই। কর্মক্ষেত্রেও সেই একই দৃশ্য ঘুরেফিরে আসে চোখে। কী মনে হয়, ভুল বলে ফেলবেন? আপনার মতামত শুনে লোকে হাসবে? হাসতে দিন। একদিন ভুল করতে করতেই তো ঠিক করতে শিখবেন। এই যে হীনমন্যতা, এ-ও কি এক ধরনের সংস্কার নয়? এছাড়া আজকাল রাস্তায়, অফিসে, চলন্ত বাসে, ট্রেনে সর্বত্র নারীদের সেক্সুয়ালি হ্যারাস করার প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। আট মাসের শিশু থেকে ষাট বছরের বৃদ্ধা কেউই বাদ নেই। আমি বা আপনিও হয়ত জীবনের কোনও না কোনও সময়ে দাঁতে দাঁত চেপে এই ধরনের নিগ্রহ সহ্য করেছি মুখ বুঁজে। আমাদের মধ্যে কতজন তীব্র গলায় প্রতিবাদ করতে পেরেছি? অনেকেই লোকলজ্জার ভয়ে চুপ করে থেকেছেন। মুখোশ খুলে দেওয়া হয়নি কুৎসিত মানুষটার। আমাদের এই ধরনের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটানোর সময় এসেছে।

আদতেই সংস্কারমুক্ত হতে পারা কিন্তু খুব কঠিন নয়। এর জন্য চাই একটি যুক্তিবাদী মন। আমার পরিচিত এক নারীর কথা বলতে ভীষণ ইচ্ছে করছে এই মুহূর্তে। সম্পর্কে তিনি আমার বৌদি হন। বিজয়া দশমীর এক বিকেল। অস্তরাগের রঙে লালচে হয়েছে আকাশ। মণ্ডপে মণ্ডপে চলছে জমিয়ে সিঁদুর খেলা। একদল উৎসাহী ভিড় করে গেলেন বৌদির চৌকাঠে। চলো চলো, সিঁদুর খেলতে যাবে না? সমস্বরে চেঁচিয়ে বললেন তারা। বৌদি খুব শান্ত স্বরে তাদের প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন, না ভাই, আমি তো সিঁদুর খেলি না। বিয়ের পর কোনও দিনও খেলিনি। এতগুলো বছর তো হয়ে গেল। আর কেন?

সে কী! সকলেই স্তম্ভিত! স্বামীর কল্যাণ কামনা করে না, এ কেমন মেয়ে রে বাবা! বাঁকা চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে ওঁরা চলে গেলেন ফিসফিস গুজগুজ করতে করতে।

পরবর্তীতে আমি বৌদিকে জিগ্যেস করেছিলাম এর কারণ। তার উত্তরে উনি যা

"নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত বলিষ্ঠভাবে নেওয়ার ক্ষমতা কি এখনও তৈরি হয়েছে আধুনিকা অথবা প্রাচীনাদের মধ্যে? ছেলে মেয়ে ভবিষ্যতে কী নিয়ে পড়াশোনা করবে, তাদের কেরিয়ার থেকে আরম্ভ করে বাড়ির অন্যান্য খুঁটিনাটি জিনিসপত্র নিয়ে ডিসিশন মেকিংয়ের সময় যখন আসে, জোর গলায় মতামত জানাতে কুণ্ঠিত হন এখনও অনেক নারীই। কী মনে হয়, ভুল বলে ফেলবেন? এই যে হীনমন্যতা, এ-ও কি এক ধরনের সংস্কার নয়?"

বলেছিলেন তাতে আমারই অবাক হওয়ার পালা। উনি বলেছিলেন, সিঁদুর খেলা বড্ড নিষ্ঠুর মনে হয় আমার।

নিষ্ঠুর! কী বলছ তুমি? আমি বলেছিলাম।

নিষ্ঠুর নয়? ভাবো তো একবার? আমি যখন তাকিয়ে দেখি আমার পাশের বাড়ির অকালে স্বামী হারানো বৌটি, যে গতবারের পুজোতেও কত আনন্দ করে সিঁদুর খেলেছে, সে জানলার আড়াল থেকে কেমন তৃষ্ণার্ত চোখে তাকিয়ে থাকে দূরের ওই পথের দিকে, মণ্ডপ থেকে পিচের যে রাস্তা সটান এসে পড়েছে পাড়ার ভিতরে। কত মেয়ে বউরা হেঁটে আসছেন সেই পথ বেয়ে। হাতে তাঁদের পুজোর থালা, মাথা কপালে লেপটে আছে ঘন লাল সিঁদুর। মুখে তাঁদের অদ্ভুত লালচে দীপ্তি। সুখী সুখী আদুরে, কিছুটা যেন অহংকারি দেখাচ্ছে মুখগুলো ওই পড়ন্ত সূর্যের ছটায়। স্বামী হারানো বৌটি নিস্পলকে তাকিয়ে আছে সেদিকে। সে দেখছে কিছুটা ভয়ে ভয়ে, আশঙ্কায়। ওঁরা ওকে খেয়াল করেনি তো? বিয়ে, বৌভাত, অন্নপ্রাশন এরকম আরও কত আনন্দ অনুষ্ঠানে তার যে যাওয়া বারণ। সে এখন ব্রাত্য হয়ে গিয়েছে। বলও, নিষ্ঠুর নয়? আর স্বামীর কল্যাণ? সে তো মনে মনেও করা যায়। তার জন্য এত আড়ম্বরের আদৌ কোনও প্রয়োজন আছে কি?

আমি সেদিন চুপ করে ছিলাম। আসলে সংস্কার অথবা নিয়ম নীতি, তৈরি করেছে এই সমাজ। মেনে চলব কি চলব না, তা আমাদের উপরে। কিছু মেয়েদের দেখি গদগদ কণ্ঠে ফলাও করে বলতে তাদের স্বামীর ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে জীবনধারণের কথা। যেন এটাই বৈবাহিক প্রেমের মাপকাঠি। সেই মেয়েদের নিজস্ব কি কোনও জানালা নেই? প্রেম চিরন্তন। তা নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। কিন্তু আত্মমর্যাদা লঙ্ঘিত করে কি প্রেমের পূর্ণতা সম্ভব? আপনার কী মনে হয়?

এই যে চারিদিকে এত নারীমুক্তি, নারী স্বাধীনতার রব উঠেছে, যতক্ষণ না আমরা পুরোপুরি সংস্কার মুক্ত হতে পারব, যে সকল সংস্কার যুগ যুগ ধরে আমাদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, ততক্ষণ কি নারীমুক্তির প্রথম ধাপটাই পেরনো সম্ভব হবে? আসুন না একটু ভাবি। ভাবি উদার মনে, যুক্তির আলো দিয়ে। সংস্কারের নাগপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করি। চলুন, আমরা ডানা মেলি অনন্ত আকাশে।

রম্যাণী গোস্বামী

লেখা পাঠান হাতে লিখে নয়, টাইপ করে

ডুয়ার্স সংক্রান্ত আপনার কোনও লেখা থাকলে টাইপ করে পাঠান। আপনার লেখা সম্পাদকমন্ডলীর পছন্দ হলে এই পত্রিকায় তা ছাপা হবে। লেখার বিষয়বস্তুর উপর ছবি থাকলে অবশ্যই পাঠাবেন। লেখা পাঠানোর ঠিকানা 'আড্ডাঘর', মুক্তাভবন, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি। অথবা মেল করতে পারেন নিচের মেল আইডি-তে

editor.ekhonduars@ yahoo.com

এখন ডুয়ার্স

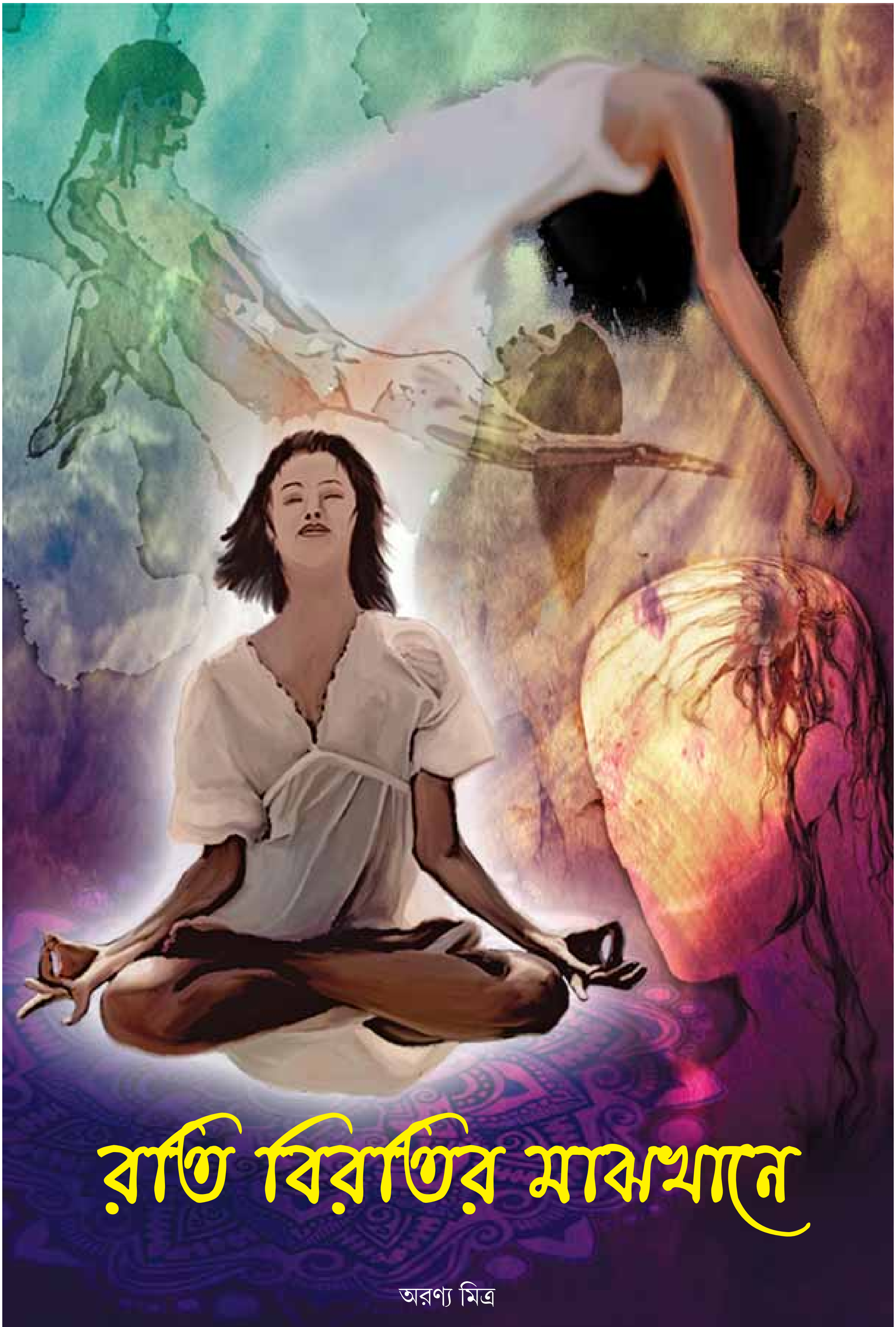
রতি বিরতির মাঝখানে
অরণ্য মিত্র

১

বিয়ের দু-বছর পর্যন্ত ইচ্ছে করেই সন্তান নেয়নি লোপা আর অসীম। বিয়ের সময় লোপার বয়স ছিল ছাব্বিশ। ছিপছিপে, শ্যামলা কিন্তু বেশ তন্বী। পড়াশুনোয় সাধারণ। অসীমের বাপ-মা অবশ্য উচ্চ শিক্ষিতা বউ চাননি। লোপা ছিল তাঁদের আদর্শ পুত্রবধূ। বিনয়ী, নরম, পতিব্রতা আর কিঞ্চিৎ শ্বাশুড়ি তর্জিতা। অসীমের মাতৃভক্তি অসীম না হলেও বেশ উঁচু দরের ছিল। লোপা ছিল সেই ভক্তিনাট্যের বাধ্য দর্শক। আসলে সে ছিল অতি সাধারণ ঘরের মেয়ে। এ হেন মেয়ের জন্য অসীমের মতো পাত্র পাওয়াটা প্রায় সিনেমার গল্প। মা-ছেলের সংসারে নিজের অস্তিত্বের ব্যাপারটা বাদ দিলে লোপা বেশ আরামেই ছিল। প্রাচুর্য তাঁর অপরিচিত বিষয় ছিল এতদিন। বিয়ের পর গরমের দুপুরে কোমল বিছানায় দৃষ্টিনন্দন বালিশে মাথা দিয়ে এসি চালিয়ে টিভির বিরাট পর্দায় ঝকঝকে সিরিয়াল দেখার মতো আনন্দে কাটিয়ে দিত একঘেয়ে দিনগুলি।

এইভাবে লোপা আর অসীমের দাম্পত্য জীবন বেশি দিন উষ্ণতা ধরে রাখতে পারেনি। দু-বছর পর তাঁরা যখন সন্তান নেওয়ার উদ্দেশ্যে মিলিত হতে শুরু করল— দেখা গেল ফল মিলছে না। সমস্যাটা যে ঠিক কোথায় সেটা বহু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখিয়েও জানা যায়নি। একজন মনোবিদ লোপাকে দেখার পর বলেছিলেন, 'আপনাদের দাম্পত্যে রোমাঞ্চের অভাব হচ্ছে।'

কথাটা যে ষোলো আনা সত্যি ছিল সেটা অসীম জানে। বিয়ের পর পর লোপার প্রতি তীব্র আকর্ষণ ছিল তাঁর। প্রায় প্রতিদিন রাতে খাওয়া দাওয়ার পর কোনও রকমে একটা সিগারেট খেয়ে লোপার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত সে। কয়েক মাস পর প্রাথমিক উদ্দামতা কেটে যাওয়ার পর অসীম টের পেয়েছিল সঙ্গমকালে লোপা সাড়া দেয় না। পুতুলের মতো পড়ে থাকে তাঁর শরীরে নিচে। মিলনের কালে অসীমের সব নির্দেশ মানলেও লোপা যেন বউ নয়, একজন কর্মি। ভালবাসছে না। ডিউটি করছে।

'তীব্র অবচেতন অনিচ্ছা থেকে মেয়েরা গর্ভধারণ আটকে দিতে পারে।' বুঝিয়েছিলেন সেই মনোবিদ। 'বিবাহিত জীবনে এটা হয়। আচ্ছা, আপনি ফোর প্লে করেন?'

প্রথমবার লোপাকে বিবস্ত্র করার পর তাঁর নগ্নতা দেখে অসীমের মনে পড়েছিল 'দেহলতা' শব্দটা। লোপার শরীর এখনও আগের মতই তন্বী। তাঁর বয়স যে এখন ছত্রিশ, সেটা না বলে দিলে বোঝার উপায় নেই। কিন্তু অসীমের মনে হয় এটা সেই দেহলতা নয়। লোপার শরীরে খাঁজগুলো আগের মতই অটুট, কিন্তু কী জানি একটা হারিয়ে গেছে। এই শরীর উষ্ণ নয়। শীতল। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। তাঁর শ্বাশুড়ি এখন শয্যাশায়ী। নার্সের অধীন। মফস্বল শহরের অভিজাত পাড়ায় এই চমৎকার দোতলা শ্বশুড়বাড়িটি এখন লোপার মুঠোয়। প্রাচুর্যের প্রতিটি কণা তাঁর অধিকারে। এটাই তাঁর মাইনে। এর বিনিময়ে তাঁকে বউ-এর ডিউটি করতে হবে আজীবন।

লোপা মন দিয়ে ডিউটি করে। অসীমের সব কিছু গোছান থাকে। অসীম কেবল ভুলে গেছে যে শেষ কবে তাঁরা মিলিত হয়েছিল। কিন্তু এসব নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। লোপা সব কিছু নিখুঁতভাবে করে। বাড়িতে থাকলে অসীমের যখন যেটা দরকার সেটা সুন্দরভাবে সাজান থাকে। বাড়িতে তিনজন পরিচারিকা আছে। এ ছাড়াও বাড়ির পুরনো ম্যানেজার মধুবাবু। লোপা নিজের হাতে রান্না করে। অসীমের প্রিয় ডিশগুলো সে বানায় ভারি যত্ন নিয়ে।

অসীমের মা ভেবেছিলেন এমন একজন বাধ্য পুত্রবধূ যে জন্য সারা দিন ডিউটি দেবে আর রাতে দেবে শরীর। লোপা ঠিক তেমনই হতে চেয়েছিল— কিন্তু ঠান্ডা হয়ে গেল। ফলে দুটো দায়িত্ব নিতে পারছিল না। বাধ্য হয়ে অসীম আরও একটা বউ যোগার করে নেয়। তার নাম সীমন্তিকা। চমৎকার মেয়ে। শিলিগুড়িতে থাকে। তাঁর বিয়ে করার ইচ্ছে নেই। অসীমের সব কিছু তাঁর জানা। সঙ্গমকালে অসীমের বন্য হয়ে ওঠাটা তাঁর বেশ পছন্দ।

'লোপা খুব সতী টাইপ মেয়ে।' একদিন মিলনের শেষে বলেছিল সীমন্তিকা। 'ও তোমাকে বিছানায় সহ্য করবে কিন্তু এনজয় করতে পারবে না।'

সেটা লোপা আর অসীমের দশম বিবাহ বার্ষিকির মাসখানেক আগেকার একটা দুপুর। ঠিক বিবাহ বার্ষিকীর দিন অসীমের মা মারা গেলেন। কয়েক মাস পর লোপা তাঁর এক দূর সম্পর্কের বোনকে নিয়ে এল ফালাকাটার এক গ্রাম থেকে। মেয়েটির বয়স সতের আঠারোর মতো। অচিরেই অসীম টের পেল যে মেয়েটি আসায় একপক্ষে ভালই হয়েছে। তাঁর নাম কুসুমী। বেশ হাসিখুশি। ভক্তিমতীও বটে। মা বিছানায় পড়ে যাওয়ার পর থেকে বাড়িতে নিত্যপুজো প্রায় থেমেই ছিল। লোপা সকাল সন্ধে প্রদীপ জ্বালিয়ে ধূপকাঠি ধরিয়ে ডিউটি পালন করত কেবল। কুসুমী আসায় গৃহদেবতার সঙ্কট কাটল। দেখা গেল যে লোপাও ব্যস্ত হয়ে পড়ছে তাঁর বোনের সঙ্গে। যন্ত্রের মত শরীর দেওয়া যায় কিন্তু প্রেম দেওয়া অসম্ভব। এই না দিতে পারা প্রেম হয়ত বদলে যেতে শুরু করল ভক্তিতে।

কিন্তু এ সব হল অসীম-লোপামুদ্রার জীবনকে বাইরে থেকে দেখা। জীবন যেমন দেখায় তেমন নয়।

অন্ধকার মানুষটি তাঁকে সবলে জাপ্টে ধরে। বৃষ্টি বেড়ে যায়। জল লেগে দেহের কাপড় গলে গলে পড়ে যায় মাটিতে। নগ্ন লোপাকে পিষতে পিষতে অন্ধকার মানুষটি দানব হয়ে ওঠে। লোপাকে ভেজা ঘাস আর পাতার জমিতে ঠেসে সঙ্গম করে নিষ্ঠুরের মতো। লোপার যন্ত্রণা হয়, সুখও। সে আশ্চর্য অসহনীয় অনুভূতি। ক্রমে অন্ধকার মানুষের মুখে আলো আসে। লোপা দেখে সে অসীম।

২

গতকাল মায়ের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিক ছিল। অসীম আজ দুপুরের কিছু পরে ফিরেছে ব্যাঙ্গালোর থেকে। ফেরার পর থেকে এখনও লোপার সঙ্গে দেখা হয়নি তাঁর। তবে এসব অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে অসীম লোপার খোঁজ করেনি। সে স্নান করে একটু হুইস্কি সেবন করে টিভি নিয়ে বসল। বাড়িতে কুসুমীকেও দেখা যাচ্ছে না। মনে হয় সে বাইরে বেরিয়েছে।

সীমন্তিনীর সঙ্গে কয়েক দিনের মধ্যেই দেখা হবে। অসীম সে কারণে বেশ প্রফুল্ল বোধ করছিল। প্রায় মাস পাঁচেক বিদেশে কাটিয়ে আজকালের মধ্যেই শিলিগুড়ি ফিরছে সীমন্তিনী। সব কিছু ঠিক থাকলে আগামি সপ্তাহে কয়েক দিনের জন্য অসীম আর সীমন্তিনী কালিম্পঙে কাটাবে।

টিভিতে সলমন খানের একটা ধুন্ধুমার সিনেমা দেখাচ্ছিল। অসীম সেটা বেশ মন দিয়ে দেখতে শুরু করল। বিজ্ঞাপন বিরতি না আসা পর্যন্ত ঠায় তাকিয়ে থাকল পর্দার দিকে। তারপর একটু চমকে উঠে তাকিয়ে দেখল দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কুসুমী হাসছে। তাঁর মুখে হাসি।

'একেবারে ডুবে গেছিলেন দেখছি! কখন এলেন?'

'বেরিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।' কুসুমী ঘরের ভেতরে এসে সোফার কোণায় বসল। 'দিদি জানে?'

'লোপাকে তো আসার পর দেখছি না। বেরিয়েছে নাকি?'

কুসুমী হাসল। সে জানে দিদি-জামাইবাবু দু'-জনের কাছেই মোবাইল আছে। তাঁরা ফোন করতে আর ধরতে জানে। তবুও পরস্পরকে ফোন করে না। বাড়িতে থাকলে সারা দিনে খুব জোর তিন-চারটে বাক্য বিনিময়।

'কোথায় লোপা?'

'বাব্বা!' কুসুমী অবাক হওয়ার ভান করে মুখে হাত চাপা দেয়। 'আপনার তো এমন করেন না? ডাকব দিদিকে?'

'বাড়িতে আছে?'

'ঠাকুর ঘরে। ধ্যানে বসেছে।'

'থাক।'

অসীম নিজেকে সামলে নিল। তাঁর মনে হল সে একটু বাড়াবাড়ি

করে ফেলেছে। বস্তুত লোপা বাড়িতে আছে না বাইরে গেছে— তা নিয়ে তাঁর কোনও সমস্যা নেই। সে বরং সীমন্তিনীর কথা ভাবছিল। বাড়াবাড়িটা সম্ভবত হুইস্কির কারণে হয়েছে। দ্রুত স্মার্ট হওয়ার জন্য একটা সিগারেট ধরিয়ে অসীম বলল, 'খেতে দাও। আমি একটু ঘুমোব। দিদির ধ্যান ভাঙলে বলে দিও যে আমি দু'-তিন দিনের মধ্যেই আবার বাইরে যেতে পারি।'

ব্যবসার কাজে সকাল সকাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে অসীম ফেরে সন্ধের পর। তারপর ঘণ্টা খানেক বাড়িতে থেকে স্থানীয় প্রতাপ সঙ্ঘ ক্লাবে আড্ডা মারতে যায়। দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ বাড়ি ফিরে হুইস্কি আর টিভি নিয়ে বসে। টিভি দেখতে দেখতেই হালকা কিছু খেয়ে নেয় অসীম। লোপা কখনও কখনও পাশে এসে বসে। এক আধটা কথা হয়। সাড়ে বারোটা কি একটা নাগাদ অসীম যখন নেশা আর ঘুম জড়ান চোখে বিছানায় ওঠে ততক্ষনে লোপা ঘুমিয়ে পড়েছে।

এই একই রকম জীবন যাপনের মধ্যে অসীম কোনও কারণে দুপুরের খাওয়া বাড়িতে সারলে লোপা পাশে দাঁড়িয়ে নীরবে তদারক করে। আজকে কুসুমী যখন ভাত বেড়ে দিচ্ছিল তখন অসীমের মনে হল যে লোপা পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আসলে লোপার দাঁড়িয়ে থাকাটা অসীমের দিক থেকে একটা অভ্যাস। মানুষ অভ্যাসের দাস হয়ে যায়। দুপুরে বাড়িতে খেলে পাশে লোপার দাঁড়িয়ে থাকাটা অসীমের অভ্যেস হয়ে গেছে। এর বেশি কিছু না।

'লোপার ধ্যান করার ব্যাপারটা কবে থেকে শুরু হল?' অসীম খেতে খেতে জিগ্যেস করে। 'লোপা কিন্তু এতটা ঠাকুর ভক্ত ছিল না। মা-কে খুশি করার জন্য পুজোপাট করত।'

একটু দূরে দাঁড়িয়ে অন্দর মহলের পরিচারিকা রত্নামাসী কান খাড়া করে ওদের সংলাপ শোনার চেষ্টা করছে দেখে কুসুমী তাঁকে বাইরে যেতে বলল। রত্নামাসী বেশি দিন হল আসেনি। এ বাড়ির মালিক-মালকিনের সমস্যাটা সে ঠিক ধরে উঠতে পারে না। এ নিয়ে তাঁর আগ্রহের অন্ত নেই।

'ধ্যান ব্যাপারটা নতুন।' রত্নামাসী বেরিয়ে গেলে কুসুমী মৃদু স্বরে জানায়। 'তিন-চার দিন হল শুরু হয়েছে। দুই আড়াই ঘণ্টার আগে বের হয় না ঠাকুর ঘর থেকে।'

অসীম কিছু না বলে খাওয়ায় মন দেয়। ঠাকুর ঘরে দরজা নেই। তার বদলে একটা ভাল আর ভারি পর্দা ঝোলান থাকে। অসীম ইচ্ছে করলেই পর্দা সরিয়ে ধ্যানরত লোপাকে দেখতে পারত। কিন্তু দেখল না। খাওয়া সেরে সে ভেবেছিল বেশ একটা ঘুম লাগাবে। কিন্তু কিছুক্ষণ বিছানায় এদিক ওদিক করে বুঝতে পারল ঘুম আসার প্রশ্নই নেই। সিগারেট ধরিয়ে রত্নামাসীকে কড়া করে কফি বানাবার নির্দেশ দিয়ে সে নেমে এল একতলায়। বারান্দার এক কোণে ম্যানেজারের ঘর, আরেক কোণে বাবার লাইব্রেরি। মাঝে দুটো ঘরের একটা বেশ বড়। সেটা বসার ঘর। বাকি ঘরটা গেস্ট রুম।

অসীমের বাবা সফল ব্যবসায়ী হওয়ার পাশাপাশি বই পড়তে ভালবাসতেন। ছোট লাইব্রেরিটা তাঁর কেনা বইয়ের সংগ্রহ। বাবা বেঁচে থাকতে বাড়িতে লোকজন আসত অনেক। গমগম করত। বাবা মারা যান অসীমের বিয়ের দু'-বছর আগে। অসীম তখন আঠাশ বছর। পারিবারিক ব্যবসা সে ভালই বুঝত। বাবা চলে যাওয়ার পর ব্যবসার রাশ নিজের হাতে নিয়ে সে গোড়াতেই সব রকম অতিরিক্ত খরচ বন্ধ করে দেয়। এই খরচগুলো ছিল বাবার খোলা মনের পরিচয়। ব্যবসার অফিসটাও তুলে নিয়ে যায় জলপাইগুড়িতে। সে চায়নি বাড়িটা লোকজনে গমগম করুক।

একতলার বারান্দায় এসে অসীম লক্ষ্য করল লাইব্রেরি ঘরের দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে আছে। এ ঘর এখন বন্ধই থাকে। বই পড়ায় অসীমের আগ্রহ নেই। সপ্তাহে একদিন ঘরটা খোলা হয় পরিষ্কার করার জন্য।

অসীমকে দেখে ম্যানেজার মধুবাবু নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। ভদ্রলোকের বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে। কুমারগ্রামের মানুষ। চাকরিতে যে থাকার খুব একটা ইচ্ছে আছে এমন নয়— কিন্তু মানুষটি ভাল বলে অসীম তাঁকে ছাড়তে চাইছে না।

'লাইব্রেরি ঘরটা খোলা দেখছি!' অসীম বলল। মধুবাবু সেদিকে একবার তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, 'বউ মা ক'দিন হল লাইব্রেরিতে বসে বইটই নাড়াচাড়া করছে। পড়তেও দেখেছি। আজ দুপুরেও এসেছিলেন। তুমি তখনো ফেরোনি।'

'লোপা বই পড়ছে?' বেশ অবাক হয়ে অসীম লাইব্রেরি রুমের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। গোটা ছয়েক পুরনো আমলের আলমারি ঠাসা বই। কাঠের বড় একটা টেবিল আর গোটা চারেক চেয়ার। অসীম দেখল টেবিলের ওপর একটা বই রাখা। লাল মলাটের ওপর কালো দিয়ে একটা প্রদীপের ছবি ছাপা। ছবির ওপরে মোটা অক্ষরে বাংলায় লেখা 'ফ্রবাশি'। নিচে লেখকের নাম, তাজউদ্দীন আনসারি। ছোট আকারের বইটা বেশ পুরনো। কাগজে লালচে ভাব চলে এসেছে।

অসীম বইটা নাড়াচাড়া করতে লাগল। ভাষা বেশ সোজা, কিন্তু পড়ার অভ্যেস নেই বলে অসীম ঠিক মন বসাতে পারল না। পাতা উল্টিয়ে, চোখ বুলিয়ে আবার টেবিলে রেখে দিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বইটার বিষয়বস্তু বেশ অদ্ভুত।

৩

স্বপ্নটা লোপার সুখের উৎস। আধো তন্দ্রায় স্বপ্নটা দেখছিল সে। মাঝে মাঝেই দেখে— বিশেষ করে অসীম যখন কয়েক দিনের জন্য বাইরে যায় তখন স্বপ্নটা তাঁকে জড়িয়ে রাখে।

স্বপ্নের পটভূমি একটা আদিম জঙ্গল। প্রাচীন কালের রমণীর মতো একটি মাত্র বস্ত্রে শরীর ঢেকে লোপা হেঁটে চলেছে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। পরনের কাপড় ভিজে ভিজে যাচ্ছে। লোপা দেখতে পারছে সিক্তবস্ত্রের আড়াল ভেদ করে তাঁর শরীরের খাঁজগুলো ফুটে উঠছে আদিম আহ্বান জানিয়ে। তারপর একটা অন্ধকারের মতো কেউ একজন এল। তাঁর দেহ অতি বলিষ্ঠ। কোমরে একফালি বস্ত্রমাত্র জড়ান। সেদিকে তাকিয়ে লোপা কেঁপে ওঠে।

অন্ধকার মানুষটি তাঁকে সবলে জাপ্টে ধরে। বৃষ্টি বেড়ে যায়। জল লেগে দেহের কাপড় গলে গলে পড়ে যায় মাটিতে। নগ্ন লোপাকে পিষতে পিষতে অন্ধকার মানুষটি দানব হয়ে ওঠে। লোপাকে ভেজা ঘাস আর পাতার জমিতে ঠেসে সঙ্গম করে নিষ্ঠুরের মতো। লোপার যন্ত্রণা হয়, সুখও। সে আশ্চর্য অসহনীয় অনুভূতি। ক্রমে অন্ধকার মানুষের মুখে আলো আসে। লোপা দেখে সে অসীম। তাঁর শরীর অনির্বচনীয় সুখে কেঁপে কেঁপে ওঠে। চাপা শীৎকার করে সে বলতে থাকে, 'আঃ! আঃ!'

রাগমোচনের অনুভূতি নিয়ে স্বপ্ন থেকে লোপা জেগে উঠত। কিন্তু চোখ খুলল না। নরম বিছানায় চিৎ হয়ে ডুবে যেতে যেতে উপভোগ করত সুখ। স্বপ্নটা শেষ সে দেখেছিল অসীম যেদিন ব্যাঙ্গালোর গেল। তারপর তিন মাস কেটে গেছে। স্বপ্নটা আর আসেনি। অসীম এর মধ্যে তিন-চার বার বাইরে গেছে— কিন্তু একবারও সে স্বপ্নে এসে লোপাকে জোর করে ভোগ করেনি। শেষবার স্বপ্নটা দেখার পরদিন একটা ব্যাপার ঘটেছিল। তারপর থেকে লোপার জীবনে একটা পরিবর্তন এসেছে। হয় তো তার সঙ্গে স্বপ্ন বন্ধ থাকার কোনও সম্পর্ক আছে।

ব্যাপাটা বেশ অদ্ভুত। কী খেয়ালে লাইব্রেরি রুমের তালা খুলিয়ে ভেতরে ঢুকেছিল লোপা। সেদিন সকাল থেকেই বৃষ্টি। পাড়ার দু'-তিন জন মহিলা মাঝে মাঝে দুপুরের দিকে লোপার সঙ্গে গল্প করতে আসে। লোপাও কোনও কোনও দিন দুপুরে কেনাকাটা করতে বের হয়। বৃষ্টির কারণে সেদিন গল্প বা শপিং— কোনওটাই হচ্ছিল না। কুসুমী গেছিল সিনেমা দেখতে। পরিচারিকাদের সঙ্গে লোপা কাজের কথা ছাড়া অতিরিক্ত বাক্য বিনিময় করে না। একঘেয়েমি কাটাতে সে লাইব্রেরি রুমে ঢুকবে ভেবেছিল। শ্বাশুড়ি বেঁচে থাকতে এ ঘরে তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ ঢুকত না। তিনি পছন্দও করতেন না। তাই বিয়ের পরপর কয়েক বার ছাড়া লাইব্রেরিতে লোপা খুব একটা আসেনি।

নিয়মিত পরিচর্যা হয় বলে ঘরটা ঝকঝকে তকতকে। বইয়ের আলমারিগুলোয় হাত বোলাতে বোলাতে লোপা তাঁর পড়ুয়া শ্বশুরের কথা ভাবার চেষ্টা করছিল। অসীম বইপত্র নেড়েচেড়েও দেখে না। তাঁর পড়ার অভ্যেস নেই। শ্বাশুড়িকেও কখনও পড়তে দেখেনি লোপা। শ্বশুর-শ্বাশুড়ির দাম্পত্য জীবন তেমন মধুর ছিল না বলেই সন্দেহ হয় লোপার।

এসব ভাবতে ভাবতে একটা আলমারি খুলে একটা বই অন্যমনস্কের মতো বের করে এনেছিল লোপা। বিয়ের আগে একটু আধটু বই কি পত্রিকা সে পড়ত। তাঁর ইচ্ছে ছিল ইন্টারেস্টিং কোনও বই পেলে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে পড়বে। বের করে আনা বইটার মলাটের দিকে সে তাকিয়ে দেখল লাল রঙের মলাটে কালো অক্ষরে লেখা 'ফ্রবাশি'। লেখকের নাম তাজউদ্দীন আনসারি। মলাটে জ্বলন্ত প্রদীপের ছবিও আছে এবং সেটাও কালো রঙে ছাপা।

বইটা মোটেই লোপাকে টানেনি। কিন্তু আলমারিতে ঢুকিয়ে রাখতে গিয়ে তাঁর মনে হল তাজউদ্দীন আনসারি নামটা তাঁর খুব চেনা। সে একটু চমকে উঠে মনে করার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছু খুঁজে পেল না। বইটার মলাটের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন জানি ঘোর লেগে গেল তাঁর। মনে হল বইটা একবার পড়া উচিত।

আলমারির সামনে দাঁড়িয়েই মন্ত্রমুগ্ধের মতো বইটার কয়েক পাতা পড়েছিল সে। কী পড়েছিল মনে নেই, কিন্তু পড়েছিল। পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল যেন বিস্মরণের ওপাড় থেকে একটা জগত ভেসে আসছে। বইয়ের কথাগুলো সে বুঝতে পারছে। বেশ কয়েক মিনিট বইটায় ডুবে থাকার পর কোনও একজনের গলা শুনে ঘোর থেকে ফিরে এসেছিল লোপা সেদিন। বাইরে কেউ কথা বলছিল জোরে জোরে। গলাটা তাঁরই।

বইটা টেবিলের ওপর রেখে দোতলায় চলে আসে লোপা। ভেবেছিল ঘরে নিয়ে আসবে। কিন্তু আনেনি। সে চাইছিল না বইটাকে কেউ দেখুক। সেদিন বিকেলেই প্রথম ঠাকুর ঘরে ঢুকে ধ্যানে বসে লোপা। তারপর থেকে লাইব্রেরি রুমে ঢুকে বইটা বারবার পড়েছে সে। পড়তে বসলেই কিছুক্ষণের জন্য একটা অলৌকিক অবস্থা তাঁকে গ্রাস করে নেয়। সম্মোহিতের মতো কয়েকটা পাতা সে পড়ে ফেলে। তাঁর ধ্যানের পরিমাণ আগের চাইতে বেড়ে গেছে। এখন দু'-বেলা দু'-ঘণ্টা করে ধ্যানস্থ হয়ে থাকে ঠাকুরের সামনে। ধ্যানটা কিন্তু গৃহদেবতার নয়। লোপা ধ্যানস্থ অবস্থায় একটা অনাস্বাদিত জগতের সন্ধান পায়। কিন্তু জগতটায় প্রবেশ করার জন্য চাই আরও অনেক মনযোগ। সেই জগতের কিছু একটা তাঁকে ডাকছে। ডাকটা স্পষ্ট অনুভব করে লোপা।

> ধ্যানে বসার পর প্রথমে বন্ধ চোখের অন্ধকারে কয়েকটা হলুদ বিন্দু এলোমেলো দৌড়োতে থাকে। তারপর সেগুলি মিলেমিশে পরিণত হয় হলুদ একটা আলোর বৃত্তে। ক্রমশঃ সে বৃত্ত আকারে বড় হতে হতে পুরো অন্ধকার ঢেকে ফেলে। তার রঙ বদলায়। একের পর এক স্তর সৃষ্টি হয়। লোপা সেই স্তরগুলি ভেদ করে যেন উঠে যেতে থাকে ওপরের দিকে। আলোর স্তরগুলি সংখ্যায় যেন অসীম।

লোপা জানে না এসব ভাল না খারাপ। কিন্তু এখন তাঁর আর পুজোয় মন নেই। কুসুমী সেদিন বলছিল, 'তুই তো দিদি বাসী কাপড়েই আজকাল ঠাকুর ঘরে ঢুকে ধ্যানে বসে পড়ছিস! তুই তো এমন ছিলি না!'

লোপা কিছু বলেনি। আসলে ঠাকুর ঘরটা ধ্যানের পক্ষে খুব ভাল জায়গা। ঠাকুরের মূর্তি, ফোটো, পুজোর বাসন এসব সরিয়ে দিয়ে ঘরটাকে ফাঁকা করতে পারলে সব চাইতে ভাল হত। কিন্তু সেটা করতে চাইলে বাড়াবাড়ি হবে। কিন্তু লোপা কিছু না বলায় কুসুমী বেশ অবাক হয়েছিল। সে দেখছিল যে লোপাকে ভারি সুন্দর দেখায় আজকাল। ধ্যান সেরে বেরিয়ে আসার পর তাঁর মুখে আশ্চর্য পবিত্রতা ফুটে ওঠে। চোখ দুটো ভারি শান্ত হয়ে থাকে।

দিদি কি সন্ন্যাসী হয়ে যাবে শেষকালে? কুসুমীর কেমন অস্বস্তি হয়েছিল। জামাইবাবুর সঙ্গে দিদির দূরত্বটা সে বোঝে। কিন্তু সেটুকু বাদ দিলে লোপার জীবনে একটা ছন্দ ছিল বলে মনে হত কুসুমির। তাঁর বিবেচনায় পৃথিবীতে কেউ পুরো সুখী হয় না। দিদি অতি সাধারণ পরিবারের মেয়ে। দেখতে মোটামুটি ভাল হলেও এতটা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তাঁর জোটার কথা নয়। একটা শিশুকে দত্তক নিলে নিশ্চই জামাইবাবুর সঙ্গে দিদির দূরত্বটা কেটে যাবে।

কুসুমী নিজেও অস্বচ্ছলতার মধ্যে বড় হয়েছে। তার ওপর সৎ মায়ের সংসার। দিদির আশ্রয়ে থেকে সেও অনেক কিছু পাচ্ছে। সে সব সে হারাতে চায় না।

রাতে ক্লাব থেকে ফিরে অসীম দেখল লোপা বাথরুম থেকে স্নান সেরে বেরিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছে। শরীরে একটা সাদা তোয়ালে জড়ান। অসীম বেডরুমের দরজার সামনে এসে থমকে গেল। লোপা ঘুরে তাকিয়েছে। ভেজা শরীর আর চুলে তাঁকে অন্যরকম লাগছে। যে কোনও পুরুষ এই মুহূর্তে তাঁর আধখোলা, ভেজা শরীরের টানে বিহ্বল হয়ে যেত। কিন্তু অসীম কেবল তাকিয়ে দেখছিল।

কিন্তু লোপা ঘরে থাকল না। আলতো পায়ে চলে গেল পাশের ঘরে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অসীমের মনে হল সীমন্তিনীর কথা। লোপা কি কিছু আন্দাজ করে? সে কি কিছু বোঝে? নাকি এই প্রাচুর্যে ভরা জীবন নিয়ে সে বেশ সুখেই রয়েছে?

৪

সীমন্তিনীর সঙ্গে শেষবার কালিম্পং-এ কয়েকটা উদ্দাম রাত কাটিয়েছিল অসীম। এবার এসেছে গ্যাংটকে। চমৎকার মনোরম আবহাওয়া। সমতলে ভাল গরম পড়লেও এখানে তার চিহ্ন পর্যন্ত নেই। হালকা সবুজ টি-শার্ট আর গোলাপি হাফ প্যান্ট পরে সীমন্তিনী সোফায় আধ শোয়া হয়ে মোবাইল ঘাঁটছিল। রাত মোটে আটটা হলেও সেটা পাহাড়ের পক্ষে অনেক রাত। অসীমের একটু শীত লাগছিল বলে গায়ে হালকা জ্যাকেট চাপিয়ে বিছানায় বসে বলল, 'একটা কথার মানে একটু জেনে দেবে?'

সীমন্তিনী কৌতূহলের চোখে তাকায়। বলে, 'কথা মানে? কোনও ওয়ার্ড?'

'হুঁ।'

'দেন আস্ক গুগুল।'

'ওয়ার্ডটা আমি বাঙলায় পড়েছি। কিন্তু সেটা মনে হয় না বাংলা শব্দ।'

'কী শব্দ?'

'ফ্রবাশি।'

'ফ্রবাশি?' সীমন্তিনী সোজা হয়ে বসে। একটু ভেবে নিয়ে বলে, 'আগে শুনিনি। মিনিংটা এখনই জানতে হবে?'

'নট নেসেসারি। আমরা বেড়াতে এসেছি। ফিরে গিয়ে পরে জানিয়ে দিলেও চলবে।'

'কোথায় পেলে ওয়ার্ডটা?'

'না, মানে— ।' একটু ইতস্ততঃ করল অসীম। তারপর বলল, 'লোপা একটা বই পড়ছিল। বাংলা। বইটার নাম ফ্রবাশি।'

'হুঁ।' সীমন্তিনী আবার মোবাইলে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

'লোপা আজকাল ধ্যান করে। সকাল বিকেল মিলিয়ে চার ঘণ্টা।'

'আমার সঙ্গে এলে তুমি তো লোপামুদ্রার কথা বল না!' মোবাইল থেকে মুখ তুলে সীমন্তিনী একটু বিস্মিত স্বরে কথাটা বলল। 'গিল্টি ফিলিংস হচ্ছে নাকি?'

'গিল্টি ফিলিংস-এর কোনও প্রশ্নই নেই।' অসীম হাসার চেষ্টা করে। 'আই লাভ টু সেক্স। তুমি জানো। লোপার কাছ থেকে এটা পাওয়া যায় না। সে দিতে পারলে আমি তোমার কাছে আসতাম না।'

'তুমি যে বিছানায় ফাইনালি একটা জন্তু হয়ে যাও সেটা আমার ভাল লাগে।'

'লোপারও খারাপ লাগত না। অন্ততঃ বিয়ের পর কিছুদিন তো তাই মনে হত। তারপর থেকে সে কেন জানি না গেটিং ফ্রিজিড। আমি আর পরের দিকে জোর করতাম না। জোর করলে এনজয়মেন্টটা নষ্ট হয়ে যায়।'

সীমন্তিনী মোবাইল রেখে সোফা থেকে উঠে এসে অসীমের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার হয় না।'

তারপরেই সে টি-শার্টটা খুলে সোফায় ছুঁড়ে দিয়ে অসীমকে জড়িয়ে ধরে আদুরে গলায় বলল, 'ফ্রবাশির মিনিং আমি খুঁজে দেব ডার্লিং। নাউ গেট ওয়াইল্ড।'

বেশ কয়েক মিনিট পর কামতপ্ত সীমন্তিনীর গভীরে প্রবেশ করার জন্য অসীম যখন উদ্যত, তখন তাঁর একটা শীতল অনুভূতি হল। তাঁর মনে হল আলিঙ্গনাবদ্ধ সীমন্তিনীর শরীরে কোনও তাপ নেই। সে যেন এক ঠান্ডা হয়ে যাওয়া শরীর ঠেসে ধরেছে তাঁর নিচে। হতভম্ব অসীম সীমন্তিনীর শরীর থেকে ছিটকে উঠে বসে বলল, 'তুমি এত ঠান্ডা কেন?'

'ঠান্ডা?' প্রচণ্ড বিস্ময়ে সীমন্তিনী নিজের নগ্ন শরীরে একবার হাত বুলিয়ে তাকাল অসীমের দিকে। 'ঠান্ডা কেন হবে? এই তো!'

অসীমের একটা হাত টেনে নিয়ে নিজের বুকে চেপে ধরে সীমন্তিনী বোঝাতে চাইল তাঁর শরীরের উত্তাপ। অসীম অবাক হয়ে অনুভব করল সেই উষ্ণতা।

'আমার যে খুব ঠান্ডা মনে হল!' বোকার মতো বলল অসীম। 'বিলিভ মি। খুব ঠান্ডা। যেন বরফ দিয়ে তৈরি।'

'তুমি মনে হয় খুব ক্লান্ত ডার্লিং!' অসীমের গলা জড়িয়ে চুমু খেতে খেতে সীমন্তিনী তাঁকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করল। 'জাস্ট গেট ওয়াইল্ড অ্যান্ড ডিগ মি— ।'

প্রাণপণ চেষ্টা করল সীমন্তিনী। কিন্তু অসীম আর জাগল না। পরদিন সকালে রুম সার্ভিসের দিয়ে যাওয়া ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে অসীম মৃদু গলায় সীমন্তিনীকে বলল, 'কালকের ঘটনার জন্য সরি। আমি সত্যিই টায়ার্ড ছিলাম।'

'আজ কেমন ফিল করছ?'

'ভাল।'

সারা দিন বেশ ফুর্তিতেই কাটল অসীমের। অনেক ঘোরাঘুরি করে রাতে হোটেলের বিছানায় সে সীমন্তিনীকে পোশাকের আড়াল থেকে যখন একটু একটু করে বের করে আনছিল, তখন গত রাতের ব্যাপারটা তাঁর মাথাতেই এল না। প্রচণ্ড রমণে সীমন্তিনীকে পাগল করে দিয়ে সে এক সময় ফুরিয়ে গেল। ঘর্মাক্ত শরীরে রতিক্রিয়ার অবশিষ্ট রেশটুকু উপভোগ করে অসীমের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে সীমন্তিনী বলল, 'তুমি বলছিলে বইটার সঙ্গে কোনও একটা ধর্মের যোগ আছে। গ্যাংটকে প্রোফেসর রাই থাকেন। কাল ওনার কাছে যাব।'

তৃপ্ত অসীম কোনও কথা বলল না। সীমন্তিনী বড় উষ্ণ। কাল রাতে তাঁর হ্যালুসিনেশন হয়েছিল।

৫

ধ্যানে বসার পর প্রথমে বন্ধ চোখের অন্ধকারে কয়েকটা হলুদ বিন্দু এলোমেলো দৌড়োতে থাকে। তারপর সেগুলি মিলেমিশে পরিণত হয় হলুদ একটা আলোর বৃত্তে। ক্রমশঃ সে বৃত্ত আকারে বড় হতে হতে পুরো অন্ধকার ঢেকে ফেলে। তার রং বদলায়। একের পর এক স্তর সৃষ্টি হয়। লোপা সেই স্তরগুলি ভেদ করে যেন উঠে যেতে থাকে ওপরের দিকে। আলোর স্তরগুলি সংখ্যায় যেন অসীম। লোপা একের পর এক পেরিয়ে যায়। সে যেন শুনতে পায় কেউ একজন ডাকছে। হয় তো আলোর স্তরের শেষে কেউ অপেক্ষা করছে তাঁর জন্য। কিন্তু স্তরের শেষে পৌঁছোতে পারে না লোপা। অগণিত রঙের আলোর বলয়ের মধ্যে আটকে গিয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে এক সময় আবার ফিরে আসে ঠাকুর ঘরে।

লোপা বোঝে সে প্রতিদিন একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে। আলোর স্তরগুলি অতিক্রম করে যেতে আর বেশি বাকি নেই। এখন কেবল দরকার আরও একটু মনোসংযোগ। টানা কয়েক ঘণ্টা ধ্যানে বসলেই সে চলে যেতে পারবে আলোক স্তরের ওপাড়ে থাকা জগতে। ফ্রবাশির জগৎ।

অসীম কাল সকালে গ্যাংটক গেছে। লোপা কিন্তু সেই স্বপ্ন দেখেনি। অসীম বেরিয়ে যাওয়ার পর কুসুমীকে ব্যাগ গোছাতে দেখে লোপার মনে পড়ল কাল তাঁর বান্ধবীর বিয়ে। কুসুমী তাই আজ যাবে পরশু ফিরবে। দুপুরে সে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোপা এ বাড়িতে একা। নিশ্চিন্তে টানা কয়েক ঘণ্টা ধ্যানে বসতে পারবে সে।

কুসুমী বেরিয়ে যেতেই লোপা ম্যানেজারকে ডেকে বলে দিল কেউ যেন রাত আটটার আগে তাঁকে না ডাকে। জ্বর জ্বর আর মাথা ধরার কারণে সে বেশ কয়েক ঘণ্টা ঘুমোতে চায়। দোতলায় কেউ যেন না যায়। ব্যাপারটার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। মধুবাবু তক্ষুনি ফরমান জারি করে দিলেন। লোপা নিশ্চিত মনে ঠাকুর ঘরে ঢুকল। তারপর সে হারিয়ে যেতে শুরু করল সেই অপার্থিব আলোকময় জগতের অভ্যন্তরে। সে যেন এক অনন্ত যাত্রা। এতদিন লোপার মনে হত যে সে আর পারছে না। আলোর বলয়গুলি তাঁকে বিভ্রান্ত করে দিচ্ছে। সে হারিয়ে ফেলছে পরবর্তী স্তরে পৌঁছোবার পথ।

কিন্তু আজ তাঁর কোনও সংশয় নেই। আলোর বলয়গুলি নিজেরাই সরে সরে পথ করে দিচ্ছে তাঁকে। একটু একটু করে উদ্ভাষিত হচ্ছে এক শান্ত-স্নিগ্ধ আলোর রাজ্য। সে আলোর রং বর্ণনাতীত। মানুষের জানা কোনও রঙের আওতায় সে রং পড়ে না। লোপা সারা শরীরে অদ্ভুত শিহরণ অনুভব করতে থাকে।

ডাকটা শোনা যাচ্ছে। স্পষ্ট। কেউ তাঁর নাম ধরে ডাকছে। গলাটা খুব চেনা। কিন্তু গলার স্বরের সঙ্গে জড়িত মুখটা মনে করতে পারছে না সে। কার গলা? এত পরিচিত, কিন্তু অচেনা!

আলোর নতুন জগৎটা লোপার চারপাশে। লোপা আর চলছে না। সামনে একটা পাকিয়ে ওঠা ধোঁয়ার মত কুণ্ডলী। ডাকটা আসছে সেই কুণ্ডলীর পেছন থেকে। লোপা এগিয়ে যেতে চাইল, পারল না।

'আর এগিও না। এর বেশি আসা যায় না।' ধোঁয়ার ওপাড় থেকে শোনা গেল চেনা অথচ রহস্যময় কণ্ঠ। 'ফ্রবাশির জগতে স্বাগতম। এ জগৎ অপার্থিব, অচিন্তনীয়, অবাঙমনসগোচর। তুমি যা জানো, যা জানো না, যা জানবে— তার সব কিছুর ঊর্দ্ধে এই জগতের অবস্থান। শুনতে পারছ?'

'পারছি।'

'কেন এলে এ জগতে?'

'জানি না। একটা বই পড়লাম। কী পড়লাম জানি না, কিন্তু পড়লাম। তারপর থেকে ধ্যানে বসতে ইচ্ছে হল।'

'কোনও বিশেষ ইচ্ছে নিয়ে আসোনি?'

'না।'

'মিথ্যে বলো না। যদি না বলতে পারো তবে আমি জিগ্যেস করছি তোমাকে।'

'আপনি কে?'

'ফ্রবাশি। সর্বশেষ মানব জন্মে আমার একটা নাম ছিল।'

'আপনি জানেন আমি কেন এখানে আসলাম?'

'জানি। বলব?'

'বলুন।'

'স্বামীকে নিয়ে তোমার সমস্যা আছে। তুমি তাঁর সঙ্গে স্বপ্নে মিলিত হতে ভালবাসো। বাস্তবে পারো না— ঠিক বলেছি?'

'বলেছেন।'

'কারণটা তুমি জানো?'

'জানি।'

'এখন তো সে চলে গেছে। তুমি আবার আগের মতো ভাবতে পারো। বিয়ের পরপর যেমন ভাবতে।'

'আপনি জানেন এসব?'

'লজ্জা পেও না। ফ্রবাশির জগতে লজ্জা নেই। এ জগতে লজ্জা পাওয়ার মতো কিছু হয় না।'

'আপনার গলার স্বর এত চেনা কেন?'

কোনও উত্তর নেই। লোপা দেখল অপূর্ব আলোর জগত ধূসর হয়ে যাচ্ছে। সে বুঝতে পারল তাঁকে ফিরে আসতে হবে। চোখের সামনে সব কিছু অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পর লোপা একটা শব্দ শুনল। চোখ খুলে কয়েক সেকেন্ড স্তব্ধ হয়ে বসে থাকার পর ধীরে ধীরে বুঝতে পারল বাইরে তুমুল ঝড় উঠেছে। কোনও একটা জানলা খোলা থাকার কারণে হাওয়ার ধাক্কায় দুমদাম শব্দ করছে। রাত এখন আটটা বাজতে সাত।

লোপা ধ্যানে বসেছিল তিনটে নাগাদ। আলোর স্তরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় সময়ের গতি বেড়ে যায়। তখন এক ঘণ্টাকে মনে হয়

কয়েক মিনিট মাত্র!

লোপা হাত মুখ ধুয়ে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে চৈত্রের ঝড় দেখতে লাগল। হাওয়ার দাপটে দাঁড়িয়ে থাকতে অসুবিধে হচ্ছে— তবুও দাঁড়িয়ে থাকল। ধ্যানে বসে সে পৌঁছে যেতে পেরেছে ফ্রবাশির জগতে। কিন্তু ফ্রবাশি কী— সেটা তাঁর অজানা। সত্যিই কি সে ধ্যানের মাধ্যমে সে জগতে চলে যাচ্ছে? সত্যিই কি রহস্যময় কিন্তু পরিচিত এক কণ্ঠস্বরের সঙ্গে কথা হল তাঁর? নাকি সব কিছু তাঁর মনের ভাবনা?

ঝড়ের সঙ্গে এবার শুরু হলো বৃষ্টি। আর দাঁড়ান চলে না। লোপা বেডরুমে ফিরে এসে বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে। ক্লান্ত লাগছে। কিছু খেতে হবে। কাজের লোককে ওপরে আসতে বলতে হবে।

লোপা তবুও শুয়ে থাকল। অসীম গ্যাংটকে। কী করছে? বাইরে ঠিকঠাক খাওয়া দাওয়া করে তো? এই ঘরে, এই বিছানাতেই ফুলশয্যা হয়েছিল তাঁদের। গোড়ার দিকে কত রাত্রি সে পিষ্ট হয়েছে অসীমের দুরন্ত পৌরুষের নিচে। সে সব ভয়মেশান সুখের মুহূর্তগুলি লোপাকে এখনও আচ্ছন্ন করে দেয়। তারপর সব বদলে গেল। ঠান্ডা হয়ে গেল লোপা। অসীম বলতে শুরু করল, 'তুমি কামশীতল! ফ্রিজিড! এটাই আমাদের সন্তানহীনতার কারণ লোপা!'

লোপা টের পেল তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে গাল বেয়ে। সে অস্ফুটে স্বরে বলল, 'তুমি জান না অসীম! আমি বলিনি! কোনও দিনও বলিনি! কী করে বলব?'

সেদিন হামলে পড়ে লোপাকে চুমু খাচ্ছিল অসীম। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল কন্ডোমের প্যাকেটটা ডাইনিং রুমের টেবিলে ফেলে রাখা হাত ব্যাগের মধ্যে রয়ে গেছে। লোপা তখন নগ্ন। রাত তখন প্রায় একটা। তোয়ালেটা কোনও রকমে গায়ে জড়িয়ে বেডরুমের দরজা খুলে বাইরে বের হতে গিয়ে থমকে যায়। কেউ কোথাও নেই। সেটাই স্বাভাবিক। অস্বাভাবিক যেটা ছিল তা হল একটা মিষ্টি গন্ধ। হালকা গন্ধটা চুলে মাখার তেলের।

গন্ধটা চিনতে পেরে লোপা হিম হয়ে যায়। এরপর থেকে প্রতিটি মিলনের কালে সেই গন্ধ লোপাকে আড়ষ্ট করে এসেছে। অসীমকে এই গন্ধের কথা বলা যায় নি। সে বিশ্বাস করবে না। সে বিশ্বাস করতে পারে না।

৬

প্রফেসর কে রাই তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব পড়াতেন সরকারি কলেজে। অবসরের পর নিজের বিষয়ে লেকচার দিতে বিভিন্ন সেমিনারে ঘুরে বেড়ান। বয়স আটষট্টি। টুক টুকে ফর্সা, সাড়ে পাঁচ ফুট উচ্চতার মানুষটি তাঁর নিজের জগতে যথেষ্ট খ্যাতিমান। গাছপালায় ঢাকা একটা জনবিরল কিন্তু চমৎকার পাড়ায় ছবির মতো একটি বাড়িতে ছেলে-বউ-নাতি-নাতনি নিয়ে আনন্দেই আছেন। সীমন্তিনী আর তাঁর সঙ্গীর জন্য তিনি বাইরের বাগানে টেবিল চেয়ার পেতে অপেক্ষা করছিলেন।

'এবার তোমাকে চিনতে পারছি।' সীমন্তিনীকে গেট দিয়ে ঢুকতে দেখে তিনি বললেন। 'ফোনে কথা বলার সময় পারিনি।'

'কেমন আছেন স্যার?' সীমন্তিনী প্রণাম করল। অসীমও। তিনি দু'-জনকে আশির্বাদ করে বসতে বললেন।

'আমার বন্ধু অসীম। এর একটা কৌতূহল মেটাতেই আপনার কাছে আসা।'

'কিছু খাবে?'

'না স্যার।'

'তা বললে কি হয়? তুমি চার বছর আগে মাদুরাই-এর সেমিনারে আমার ইন্টারভিউ নিয়ে একটা লেখা লিখেছিলে সেটা আমার বেশ লেগেছিল। তুমি কি এখনও মিডিয়াতেই আছ?'

'না স্যার।' সীমন্তিনী হাসল। 'একটা কনসালটেন্সি ফার্ম খুলেছি। ছোট ফার্ম।'

'নাইস।' প্রফেসর রাই ওদের অপেক্ষা করতে বলে উঠলেন। মিনিট দশেক বাদে ভেতর থেকে ফিরে এসে চেয়ারে বসে বললেন, 'বলো কী জানতে চাইছ? আমার বিষয় কি?'

'আমার বন্ধু একটা শব্দের অর্থ জানতে চায়। ফ্রবাশি।'

প্রফেসর রাই একটু নড়ে চড়ে বসলেন। 'এ তো প্রাচীন পারস্যের দার্শনিক ভাবনার একটা টার্ম। জরাথুষ্টের অনুগামিরা এক সময় মনে করতেন যে এই জগতের নারী-পুরুষ, জীবজন্তু, গাছপালার প্রত্যেকের একটা করে আদর্শ রূপ আছে। সে রূপগুলোই হল ফ্রবাশি।'

'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'বুঝিয়ে দিচ্ছি। ধরো তুমি, তোমার আইডিয়াল ফর্মটা আছে স্বর্গে। সেই ফর্মটা হল তোমার ফ্রবাশি। তুমি হলে তোমার ফ্রবাশির ইমেজ বা প্রতিরূপ।'

'এবার বুঝলাম।'

'কিন্তু আপনি এ শব্দটা কোথায় পেলেন?' অসীমের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন অধ্যাপক রাই।

'একটা বাংলায় লেখা বই পেয়েছি বাবার লাইব্রেরিতে।'

'বাংলা?' অধ্যাপক রাই একটু অবাক চোখে তাকালেন। 'লেখকের নাম কি তাজউদ্দীন আনসারি?'

'আপনি পড়েছেন?' অসীম অবাক হয়।

'আমার কাছে এর ইংরিজি অনুবাদটা আছে।' বাড়ির ভেতর থেকে লোক এসে চায়ের ট্রে আর কুকিজ দিয়ে গিয়েছে এর মধ্যে। টি পট থেকে চা ঢেলে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন অধ্যাপক। 'তাজউদ্দীন আনসারি ছিলেন একজন ফকির। কিন্তু তিনি লেখাপড়া জানতেন। ফ্রবাশ কনসেপ্ট নানা ভাবে ছড়িয়েছিল। অনেক পরে সূফী সম্প্রদায়ের একটা গোষ্ঠি ধ্যানের মাধ্যমে ফ্রবাশির জগতে নিজেদের চেতনাকে স্থাপন করার কৌশল আবিষ্কার করেন। তাজউদ্দীন ছিলেন সেই সম্প্রদায়ের একজন। এরা সংখ্যায় খুব কম হত। নিজেদের সাধনার গুপ্ত রহস্য শিষ্যের বাইরে জানাতেন না। কিন্তু তাজউদ্দীন একটা বই লিখে সেটা জানিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।'

'কেন?'

'মনে হয় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ফ্রবাশির জগতে প্রবেশ করার কৌশল জানা লোক পৃথিবীতে আর থাকবে না। তখন বিদ্যাটাও হারিয়ে যাবে। তাই বইটা লিখেছিলেন। বইটা খুব বেশি ছাপা হয়নি। প্রচারও তেমন পায়নি। কিন্তু একজন বাংলা জানা সাহেব ভারতীয়দের কুসংস্কারের দৃষ্টান্ত হিসেবে বইটা অনুবাদ করেন। এখন সে অনুবাদটা আমাদের মতো কিছু লোকের কাছে পাবে।'

'সত্যি কি সে বই পড়লে ফ্রবাশির জগত অনুধাবন করা যায়?' সীমন্তিনী জিগ্যেস করল। অধ্যাপক রাই একটু হাসলেন। 'বই পড়ে সাধনা হয় না।' বললেন তিনি। 'তোমার বন্ধু চাইলে বাংলা বইটা পড়তে পারেন। কিন্তু সেটা খুবই ধোঁয়াটে বিষয়ে ভরা। ভুমিকায় কী বলা আছে জান?'

'কী?'

'যে পারবে সে বইটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পারবে। যাঁর শরীর উপযুক্ত আধার, সে বইটা পেলেই পারবে। বাকিদের কাছে বই-এর আলোচ্য বিষয় এক কথায় দুর্বোধ্য।'

'আপনি এটা বিশ্বাস করেন?'

'আমি গোটা ব্যাপারটাই অবিশ্বাস করি। আমার কাজ ধর্মের সঙ্গে ধর্মের তুলনা করে মানব চিন্তার মূল ধারাটিকে বোঝার চেষ্টা করা। এর জন্য অলৌকিক বিষয় বিশ্বাস করার কোনও দরকার নেই। বাট দ্য কনসেপ্ট ইজ ভেরি বিউটিফুল। প্রতিটি মানুষের নিয়ন্তা হল তাঁর ফ্রবাশি। সদ্য জন্মান শিশুর ফ্রবাশি সব চাইতে শুদ্ধ। ভেরি নাইস পোয়েট্রি ইনডিড!'

অসীম মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। কেন জানি তাঁর মনে হয়েছিল যে বইটা লোপার পক্ষে ভাল নয়। কিন্তু এই সব ভাবনার কোনও কারণ নেই। বাজারে বশীকরণ বিদ্যে শেখার জন্য অনেক বই পাওয়া যায়। তাজউদ্দীন আনসারির বইটাও সে জাতীয় একটা কিছু। লোপা যেভাবে ভক্তিমতি হয়ে উঠেছে তাতে এই ধরনের বই তাঁকে আকৃষ্ট করতেই পারে।

সেদিন রাতে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা অসীমের নাভির নিচে জিভ বোলাতে বোলাতে সীমন্তিনী দেখল কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। সে মুখ তুলে দেখল অসীম সিলিঙের দিকে তাকিয়ে আছে। সে বুঝতে পারল

অসীমের স্নায়ু ঠিক সতেজ নেই। তার মধ্যে লোপা ঢুকে পড়ছে। আগামি কাল তারা যে যার কাজে ফিরে যাবে। তার আগে এই পুরুষটার একবার বুনো হয়ে ওঠা প্রয়োজন। আজ প্রচণ্ড রমণ চাই।

সীমন্তিনী হুইস্কির আয়োজন করতে গেল।

৭

গ্যাংটক থেকে সরাসরি বাড়ি ফেরার কথা ছিল না। অসীম ভেবেছিল জলপাইগুড়িতে অফিস হয়ে সন্ধের পর বাড়িতে ঢুকবে। কিন্তু শিলিগুড়িতে সীমন্তিনীকে নামিয়ে সোজা ফিরে এল নিজের বাড়িতে। সীমন্তিনীর সঙ্গে গেলে সে নিজের গাড়ি নিয়ে যায় না। ড্রাইভারকে বলে দেয় ফেরার দিন জলপাইগুড়িতে অপেক্ষা করতে। সীমন্তিনী তার জীবনে বেশ কয়েক বছর হল রয়েছে। লোপার কাছে গোপন করে রাখা এই সম্পর্কটাকে মাঝে মাঝে প্রকাশ করে ফেলার কথা ভাবে অসীম। লোপা হয়ত মেনে নেবে। সীমন্তিনী ঠিকই বলেছিল। সতী টাইপ মেয়ে। এরা বঞ্চিত হতে ভালবাসে। এরা সাজানো ঘরের সাজানো বউ। সে কারণেই তো তাঁকে আনা হয়েছে।

দোতলায় উঠতে উঠতে অসীমের মনে হচ্ছিল লোপা ধ্যানস্থ থাকবে। অনুমানটা সত্যি হল। কুসুমী তার হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে বলল, 'খাবে না খেয়ে এসেছ? দিদি কিন্তু ধ্যানে বসেছে!'

'কতক্ষণ?'

'মিনিট দশেক।'

'ব্যাপারটা কেমন বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে না?'

'বাড়াবাড়ির কী আছে! কিছু তো একটা করতে হবে।'

'ইচ্ছে করলে ছোট একটা ব্যবসা করতে পারে। সময় কাটবে। হাত খরচের পয়সাটাও উঠবে।'

'সবাই সব পারে না জামাইবাবু! দিদি ঘরোয়া মেয়ে। এদ্দিন একসঙ্গে থেকে সেটা বোঝেন নি?'

'তুই তো এ ভাবে কথা বলিস না আমার সঙ্গে!' অসীম অবাক হল। 'কী হয়েছে?'

কুসুমী একবার অসীমের চোখের দিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে বলল, 'ব্যালকনিতে চলুন, বলছি।'

অসীম কৌতূহল চেপে ব্যালকনিতে এসে কুসুমীর দিকে তাকাল। কুসুমী মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে। বোঝাই যাচ্ছে কী ভাবে শুরু করবে তা নিয়ে চাপে আছে।

'আমি আজ সকালে দিদিকে জিগ্যেস করছিলাম আপনি গ্যাংটক থেকে কবে ফিরবেন।'

'সেটা লোপার জানার কথা নয়। আমি নিশ্চিত করে ফেরার ডেটটা বলে যাই নি।'

'আমি ক্যাজুয়ালি জিগ্যেস করেছিলাম— জাস্ট কথার কথা। দিদি বলল—।'

'কী বলল?'

'বলল, গ্যাংটকে এখন বেশ ঠান্ডা আর—।'

'আর?'

'যে মেয়েটার সঙ্গে আছে সে খুব গরম!'

কুসুমী মোটামুটি ফর্সা। শেষ বাক্যটা বলতে বলতে তাঁর মুখ লাল হয়ে গেল। অসীম খুব একটা চমকালো না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেবল ভাবল, লোপা তা হলে জানে। তাঁর যে কথাটা বলতে কুসুমী লাল হয়ে যাচ্ছিল সেটা অনুমানের ভিত্তিতেই বলা যায়। এ ক্ষেত্রে অনুমানটা নির্ভুল। সে যদি লোপার মতো শীতল হয়ে যেত তবে কি সন্দেহ করত না যে লোপার কেউ আছে। লোপা বাইরে যায় আসলে তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে।

'আপনি কিছু বললেন না?' কুসুমী অবাক হয় এবার। 'দিদি আপনাকে বাজে সন্দেহ করছে।'

'এ সব কি ধ্যান করার ফল?' অসীম বিষয়টাকে লঘু করার জন্য হাসল। 'ভাল করে চা বানিয়ে আন!'

'আপনি দিদিকে বকবেন না তো?'

'ভয় পাস না কুসু! বকাবকি করার জন্য কথা বলতে হয়। লোপা তোকে বলেছে। আমাকে বলবে না।'

'কেন?'

'সতী নারীরা স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে পাপানলে দগ্ধ হতে চায় না।'

কুসুমীতা কথাটা ধরতে না পেরে হেসে ফেলল। একটা সিগারেট ধরিয়ে ব্যালকনির কোণায় রাখা টুলের ওপর বসে আকাশের দিকে তাকাল অসীম। বেশ একটা হাওয়ার দিন। সামনেই পয়লা বৈশাখ। সেদিন লোপাকে নিয়ে জলপাইগুড়ির অফিসে যেতে হবে। সেখানে পুজো হবে। পুজোর দিন কর্তাকে গিন্নীসহ হাজিরা দেওয়ার প্রথা আছে। লোপা প্রতিবারই যায়।

ঠিক সেই মুহূর্তে লোপা ঠাকুর ঘরে তাঁর অপূর্ব আলোর জগতে বিচরণ করতে করতে শুনতে পারছিল রহস্যময় অথচ পরিচিত কণ্ঠস্বর। 'ফ্রবাশির জগতে স্বাগতম। তুমি আবার এসেছ।'

'আমি কি এতটুকুই যেতে পারব?'

'ভেতরে যেতে পারলে তুমি তোমার ফ্রবাশিকে পাবে।'

'আমার অধিকার আছে।'

'ফ্রবাশির জগতে অধিকার বলে কিছু নেই। কিন্তু নিজের ফ্রবাশিকে পাওয়া মানে সমস্ত জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়া। এতে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে।'

'আমি মুক্তি চাই।'

'মিথ্যে বলো না। তুমি এখনো বেঁচে থাকতে চাও। সংসার চাও। সুখ চাও।'

'তা হলে কি আমি ভেতরে যেতে পারব না?'

'আসলে তুমি ভাবছ ভেতরে যেতে পারলে অনেক শক্তি পাবে। তা দিয়ে তুমি সীমন্তিনীকে মেরে ফেলবে।'

'মেয়েটার নাম কি সীমন্তিনী?'

'নামে কী আসে যায়। সে একজন নারী। তোমার মতো।'

'সে আমার শত্রু।'

'ভুল ভাবছ।'

'আমি তাঁকে ঠান্ডা করে দেব। আমার মতো ঠান্ডা।'

'এটা তোমার গভীর অবচেতনের পরিকল্পনা। এটা তুমি একটু হলেও করতে পেরেছিলে। কিন্তু করো না। আমি জানি তুমি কেন ঠান্ডা হয়ে গেলে।'

'কেন?'

'তুমিও জান।'

'তবু বলুন। মিলিয়ে নেব। আমার এখন মনে হয় যে আমি ভুল।'

'সে রাতে তুমি দরজা খুলে মিষ্টি একটা গন্ধ পেলে। কিন্তু কেউ ছিল না।'

'কেউ না। আমরা দু'-জন আর ওর মা।'

'গন্ধটা চুলে মাখার তেলের।'

'হ্যাঁ।'

'তোমার শ্বাশুড়ির প্রিয় কেশতেল। চারুকেশী তৈল।'

লোপার কষ্ট হল। ধরা গলায় বলল, 'মিলে যাচ্ছে। উনি দরজায় আড়ি পেতেছিলেন। আমার ধারণা উনি নিয়মিত দরজায় কান দিয়ে শোনার চেষ্টা করতেন। তারপর থেকে আমার মনে হত উনি বাইরে দাঁড়িয়ে শুনছেন—।'

লোপা টের পেল তাঁর বন্ধ চোখ দিয়ে জল পড়ছে টপ টপ করে। সে ফিরে আসতে শুরু করল। শেষ সময়ে শুনতে পেল কণ্ঠস্বর বলছে, 'ফ্রবাশি মনকে শুদ্ধ করে। কিন্তু তুমি ভেতরে আসতে চেও না। শ্বাশুড়ি তো এখন চলে গেছেন। জীবন আবার শুরু করা যায়। তুমি পারবে।'

'কী করে পারব?' বলতে বলতে লোপা হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ে। সেই হু হু অথচ চাপ্পা কান্নার সঙ্গে সঙ্গে সে ফিরে আসে ঠাকুর ঘরে। বেশ খানিকক্ষণ অঝোরে কাঁদার পর এক সময় শান্ত হয়।

৮

পরশু পয়লা বৈশাখ গেছে। শিলিগুড়িতে আজ বেশ গরম। সীমন্তিনী

নিজের ফ্ল্যাটে অপেক্ষা করছিল। অসীম যে কোনও সময় চলে আসবে। গত কয়েক বছরে সে আর অসীম অনেক বার মিলিত হয়েছে, তবুও অসীম আসবে জানলে উত্তেজিত বোধ করে সীমন্তিনী। অসীম ছাড়াও আরও দু'-জন পুরুষের সঙ্গে দু'-এক রাত কাটিয়েছিল সে এই বছরগুলিতে। কিন্তু অসীমের কাছে তাঁদের পানসে মনে হয়েছে। সেটা জানার পর অসীম হো হো করে হেসে বলেছিল, 'আমি তাহলে সার্টিফায়েড লাভ মেকার, কী বলো?'

সীমন্তিনী বুঝতে পেরেছিল যে হাসিটা ছিল নির্ভেজাল। অসীমের মধ্যে এক ধরনের সততা আছে। যদিও সে যা করছে তা সামাজিক বিচারে ব্যাভিচার। কিন্তু অসীমের অতৃপ্তিটা তাঁর কাছে ন্যায্য মনে হয়েছিল। লোপাকে কখনও দেখেনি সীমন্তিনী। অসীমের মুখ থেকে তাঁদের দাম্পত্য জীবনের খুঁটিনাটি শোনার পর সীমন্তিনীর মনে হয়েছে যে, লোপা তাঁর শ্বশুরবাড়ির চাপটা ঠিক নিতে পারেনি। অতি সাধারণ পরিবার থেকে উচ্চবিত্ত পরিবারের একমাত্র বৌ হয়ে সে কুঁকড়ে গেছে। মেয়েরা সাধারণত এমনটা করে না। সেক্ষেত্রে লোপার ব্যাপারটা অস্বাভাবিক বলতে হবে। যৌন মিলনের সময় অসীমের উন্মত্ততা কি লোপাকে সঙ্কুচিত করে ফেলেছে? এটাও একটা সম্ভাবনা বলে মনে হয় সীমন্তিনীর। অসীম নিজেও এই থিওরি কিছুটা বিশ্বাস করে। লোপার বাবা প্রাইভেট কোম্পানিতে সাধারণ চাকরি করতেন। জ্যোতিষ চর্চা করেও অল্প-স্বল্প আয় হত তাঁর। এই ধরনের পরিবারের মেয়েরা শৈশব থেকেই পতিভক্তির পাঠ নেয়। পতির সুখ-সুবিধের তত্ত্ব তাঁদের মাথায় যে ভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, সেখানে যৌনতা প্রায় ব্রাত্য। সেটা স্রেফ সন্তান লাভের একটা অপরিহার্য শর্ত।

কিন্তু অসীম তাঁর সঙ্গিনীর কাছ থেকে সক্রিয়তা আশা করে। লোপা হয় তো এইখানেই ব্যর্থ।

চা ঠান্ডা হচ্ছিল। লোপা কাপটা টেনে নিল। অসীম স্বীকার করে যে লোপা শুরু থেকেই ঠান্ডা ছিল না। বিছানায় সে বিপর্যস্ত, আক্রান্ত বোধ করলেও সঙ্গত করার চেষ্টা করত স্বামীর দুরন্ত রতিসঙ্গীতের সঙ্গে। গোড়ার দিকে অসীমের মনে হত না যে সে একটি রক্তমাংসের পুতুলের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে। লোপা তখন জীবন্ত ছিল। তারপর কি কিছু ঘটেছিল?

এই প্রশ্নটার উত্তর অসীমের স্বীকারোক্তি থেকে পায়নি সীমন্তিনী। অবশ্য সে কোনও দিন অসীমকে তাঁর দাম্পত্য নিয়ে জিগ্যেস করেনি। যা বলেছে অসীম নিজে থেকেই বলেছে। সীমন্তিনী প্রথম দিকে ভাবত যে অসীম তাঁর পরকীয়া নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি বৌ-এর জেরার মুখে পড়বে আর তাঁকে খুঁজতে হবে নতুন কোনও সঙ্গী। বরের পরকীয়া ধরে ফেলতে বৌদের সময় লাগে না। মেয়েরা এ ব্যাপারে যেন গন্ধ পায়। অথচ অসীম, কয়েক বছর হয়ে যাওয়ার পরেও, স্বচ্ছন্দে তাঁর সঙ্গে শরীর বিনিময় করেছে। যেন লোপা তাঁকে অনুমতি দিয়ে রেখেছে এ ব্যাপারে। সে কি সত্যি কিছু জানে না?

দার্জিলিং চায়ে চুমুক দিয়ে আরাম পায় সীমন্তিনী। আজ সে সত্যিই অসীম আর লোপার সম্পর্ক নিয়ে ভাবছে।

আরও আধঘণ্টা পর অসীম আসল। সীমন্তিনী লক্ষ্য করল অসীমকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ব্যাগটা ড্রইং রুমের সোফার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে সে বলল, 'খুব গরম!'

'স্নান করে নাও। ফ্রেশ হয়ে যাবে।'

অসীম যখন শিলিগুড়িতে তাঁর ফ্ল্যাটে রাত কাটাতে আসে তখন খুব হালকা পোষাকে তাঁকে ওয়েল কাম জানায়। আজও তাঁর পরনের বস্ত্রটাকে একটু লম্বা হয়ে যাওয়া গেঞ্জির মতো দেখাচ্ছিল। অসীমের মতে সীমন্তিনীর পায়ের গঠন অসমান্য। পা দুটো ভালভাবেই সে মেলে তুলেছিল অসীমের কাছে।

বিচিত্র, বাক্যের অতীত সেই আলোর জগতে একটা স্পন্দন জাগল। ক্রমশঃ একটা চলচ্ছবি ফুটে উঠছিল। একটা ঘর। হালকা আলো। টিভি চলছে। বিছানায় দুটি নগ্ন শরীর তুমুল রমণে মত্ত। শীৎকারে শীৎকারে মুখরিত চারদিক। পুরুষটি লোপার বহু পরিচিত। সে একদৃষ্টে নারী দেহটিকে দেখতে লাগল। অসীমের ছন্দোময় কোমর সঞ্চালনের আঘাতে নারীটি যেন সুখে জর্জরিত হয়ে যাচ্ছে।

'চা খাবে?'

সীমন্তিনী লক্ষ্য করল যে অসীমের চোখে কোনও বিদ্যুৎ খেলে গেল না। সে খানিকটা উদাসীন ভাবে দেয়ালে টাঙান একটা ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, 'দাও।'

'স্ট্রেস যাচ্ছে নাকি?'

'কেন?'

'লুকিং টায়ার্ড।'

'কয়েক দিন হল একটু অস্থির লাগছে।'

'একটা ভাল কমেডি মুভি আছে। স্নান করে এস। একসঙ্গে দেখি।'

অসীম চা খেয়ে স্নান করে এল। তাঁর ক্লান্ত ভাবটা অনেকটা কেটে গেছে দেখে নিশ্চিন্ত হল সীমন্তিনী। কাজের চাপ নিজেরও যথেষ্ট যাচ্ছে। টেনশন কাটাতে সেক্সের মতো ওষুধ নেই। অসীম চাঙ্গা থাকলে চাপমুক্ত হতে সময় লাগবে না। হুইস্কি আর স্ন্যাক্স নিয়ে বেডরুমে ছবিটা দেখতে দেখতে সীমন্তিনী এক সময় লক্ষ্য করল অসীম খুব হাসছে। কোমরে সাদা একটা তোয়ালে জড়িয়ে বালিশে আধশোয়া হয়ে ছিল অসীম। মেদহীন বলশালী শরীরটা হাসির দমকে কাঁপছিল। সীমন্তিনী তাঁর ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, 'তোমাকে খুব ভাল দেখাচ্ছে?'

'রিয়েলি?'

'আমি বোধহয় তোমার প্রেমে পড়ছি।'

'তা হলে তো চুক্তিভঙ্গ হবে।' অসীম চিন্তিত হওয়ার অভিনয় করে। 'এমনিতেই স্ট্রেস যাচ্ছে।'

সীমন্তিনী কথা না বাড়িয়ে নিজের ঠোঁট ডুবিয়ে দিল অসীমের ঠোঁটে। তারপর চড়ে বসল তাঁর ওপর।

ঠিক তখন ঠাকুর ঘরে বসে ধ্যানের জগতে ভ্রমণরত লোপা সেই রহস্যময় অপরিচিত কণ্ঠ শুনতে পারছিল।

'আবার এসেছ?'

'এসেছি।'

'এমন করো না।'

'তোমার পরিচয় জানতে চাই।'

'এই মুহূর্তে তুমি সেটা চাইছ না। তুমি চাইছ সীমন্তিনীকে দেখতে।'

'হ্যাঁ।'

'এখনই দেখতে চাও?'

'চাই।'

'সহ্য করতে পারবে?'

'না পারার কিছু নেই। আমি সব রকম ভেবেছি। ওরা কি এখন বিছানায়?'

'চরম মুহূর্তে।'

'আমাকে দেখাও।'

বিচিত্র, বাক্যের অতীত সেই আলোর জগতে একটা স্পন্দন জাগল। ক্রমশঃ একটা চলচ্ছবি ফুটে উঠছিল। একটা ঘর। হালকা আলো। টিভি চলছে। বিছানায় দুটি নগ্ন শরীর তুমুল রমণে মত্ত। শীৎকারে শীৎকারে মুখরিত চারদিক। পুরুষটি লোপার বহু পরিচিত। সে একদৃষ্টে নারী দেহটিকে দেখতে লাগল। অসীমের ছন্দোময় কোমর সঞ্চালনের আঘাতে নারীটি যেন সুখে জর্জরিত হয়ে যাচ্ছে। তাঁর বন্ধ হয়ে আসা চোখে অপূর্ব সুখাবেশ। এক সময় সে ঘাড় ফিরিয়ে আলতো ভাবে খুলল চোখ দুটো। যেন সে তাকাল লোপার চোখের দিকে।

তারপর সব অন্ধকার।

৯

অঙ্গ সঞ্চালনের প্রতিটি ধাপে একটু একটু করে সুখের সপ্তম স্বর্গে

পৌঁছোতে পৌঁছোতে অসীমের কানে আসছিল সীমন্তিনীর অস্ফূট শীৎকার। আচমকা একটা চাপা চিৎকার তাঁকে চমকে দিয়ে থামিয়ে দিল। রতিসুখের আবেশে চিৎকার করে ওঠা নয়। সীমন্তিনী ভয় পেয়েছে। তাঁর চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল। এখন সে অবিশ্বাসী চোখে পাশের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে। হাঁফাচ্ছে। খোলা বুক দুটো দ্রুত ওঠানামা করছে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে।

‘কী হল?’ অসীম একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেয়ালের দিকটা দেখে নিয়ে খুব অবাক গলায় জিগ্যেস করল। সীমন্তিনী ততক্ষণে একটা হাত দিয়ে চোখ দুটো ঢেকে ফেলেছে। যেন শান্ত করার চেষ্টা করছে নিজেকে। তাঁর গোটা শরীরে বিন্দু বিন্দু ঘাম। অসীম বিস্ময়ে সীমন্তিনীর শরীর থেকে উঠে এলো।

‘শরীর খারাপ লাগছে?’

‘সরি।’ চোখ থেকে হাত সরিয়ে সীমন্তিনী এদিক ওদিক তাকাল। ‘ভেরি সরি অসীম। ইউ মে ক্যারি অন।’

‘ও ইয়েস।’ সীমন্তিনীকে আবার জাপটে ধরল অসীম। কিন্তু সে যেন কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেছে। প্রায় এক তরফা উদ্যোগ নিয়ে নিজেকে ঢেলে দেওয়ার পর অসীম হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, ‘কিছু একটা হয়েছে। ইউ ওয়ার নট রেসপন্ডিং।’

কিছু না বলে সীমন্তিনী বিছানা থেকে উঠে বাথরুমে চলে গেল। ঘণ্টাখানেক বাদে সীমন্তিনীর সুউচ্চ ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে বসে রাতের ঘুমিয়ে পড়া শিলিগুড়ি দেখতে দেখতে সীমন্তিনী বলল, ‘একটা কথা জিগ্যেস করব?’

‘করো।’

‘লোপার গজদাঁত আছে?’

‘হ্যাঁ।’

সীমন্তিনী চুপ করে থাকল। ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছিল তখন শিলিগুড়ি শহরে। বেশ আরাম লাগছিল। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর অসীম বলল, ‘গজদাঁতের কথা বললে কেন? তুমি তো লোপার ছবিও দেখতে চাওনি কখনও। আমি বলেছিলাম কি?’

‘না।’

‘তবে?’

‘তুমি বিশ্বাস করবে না।’

‘তুমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলে। তুমি কি কিছু দেখেছিলে?’

সীমন্তিনী জবাব না দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, ‘একটা মেয়ে। বিছানার পাশে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল। এতটাই আমি তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ পাচ্ছিলাম। মেয়েটো কিছু বলতে চেয়ে মুখ খুলল। আমি দেখলাম তাঁর গজদাঁত আছে।’

অসীম স্তব্ধ হয়ে রইল। সীমন্তিনীর গভীর হ্যালুসিনেশন হয়েছে। সে নিশ্চই লোপাকে নিয়ে খুব চিন্তা করে। হ্যালুসিনেশনটা নিশ্চই তাঁর অপরাধবোধের ফসল।

‘যাঁকে দেখেছ সে তোমার মনের তৈরি। গজদাঁতের ব্যাপারটা হয় তো আমি কখনও বলেছিলাম তোমাকে। কিন্তু তোমার হ্যালুসিনেশন হয়েছে লাভ মেকিং-এর সময়। আমার ধারণা লোপার কথা ভেবে তোমার অবচেতনে গিল্টি ফিলিংস হচ্ছে।’

‘হয় তো তাই।’ সীমন্তিনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ‘আমাদের এই সম্পর্কটা আর কন্টিনিউ করা ঠিক হবে না। আমাদের মধ্যে লোপা ঢুকে পড়ছে। উই শুড স্টপ।’

‘আমার আপত্তি নেই। তবে তোমাকে মিস করব।’

‘যদি তুমি ফ্রিজিড হতে আর লোপা ঘরের বাইরে কোনও পুরুষের সঙ্গে সেক্স করত— তুমি মানতে?’

‘তুমি এথিকাল হচ্ছ।’

‘হওয়াটা উচিত হচ্ছে না, বাট জাস্ট নাউ আই থিঙ্ক সো। লোপার ছবি আছে তোমার কাছে?’

‘না।’

সীমন্তিনী আর কিছু না বলে বাইরের দিকে তাকাল। হাওয়ার জোর বেড়ে গেছে। বেশ একটা শিরশিরে ভাব। দূরে এনজেপি জংশনের আলোয় আকাশ উদ্ভাসিত। চারদিকে জমাট নৈস্তব্ধ্য। এই নিস্তব্ধ রাত্রির সঙ্গে চুপ করে থাকাটাই যেন মানায়।

সীমন্তিনী চুপচাপ বসে রইল অন্ধকারে। অসীমের ব্যাখ্যা তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তাঁর সঙ্গে নিয়মিত শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত থাকার জন্য সীমন্তিনী কখনওই নিজেকে অপরাধী ভাবেনি। লোপার বিষয়ে সে মাঝে মাঝে চিন্তা করলেও সেটা স্রেফ কৌতূহলের কারণে। তার জন্য এই রকম প্রবল হ্যালুসিনেশন অসম্ভব। অথচ বাস্তব ঘটনাটা হলো সে একটা মেয়েকে দেখেছে দাঁড়িয়ে থাকতে। ভীষণ জীবন্ত ছিল মেয়েটার উপস্থিতি। ভাবতে গিয়ে এখনও সে শিউরে উঠছে মনে মনে। সেই মুহূর্তে তাঁর মনে হয়েছিল যে সত্যি সত্যি লোপা তাঁর বেডরুমে ঢুকে পড়েছে।

কিন্তু লোপাকে সে দেখেনি কখনও। তাহলে কি লোপার একটা চেহারা সে অবচেতনে কল্পনা করে নিয়েছিল? সেটা অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু সঙ্গমের চূড়ান্ত স্তরে যেতে যেতে এমন একটা হ্যালুসিনেশনের ব্যাখ্যা কী হতে পারে?

‘তোমার ভয় পাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে আমি একটা গন্ধ পেয়েছিলাম। খুব চেনা গন্ধ। কিন্তু মনে করতে পারিনি।’

নীরবতার ওপাড় থেকে যেন শোনা গেল অসীমের গলা। সীমন্তিনী অলৌকিকতাকে কখনওই গল্প-কাহিনির বাইরে ভাবতে পারেনি। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর গা একটু ছম ছম করে উঠল।

> ‘সীমন্তিনী বুঝতে পেরেছিল যে হাসিটা ছিল নির্ভেজাল। অসীমের মধ্যে এক ধরনের সততা আছে। যদিও সে যা করছে তা সামাজিক বিচারে ব্যাভিচার। কিন্তু অসীমের অতৃপ্তিটা তাঁর কাছে ন্যায্য মনে হয়েছিল। লোপাকে কখনও দেখে নি সীমন্তিনী। অসীমের মুখ থেকে তাঁদের দাম্পত্য জীবনের খুঁটিনাটি শোনার পর সীমন্তিনীর মনে হয়েছে যে, লোপা তাঁর শ্বশুরবাড়ির চাপটা ঠিক নিতে পারে নি।’

১০

বাড়ি ফেরার তিন দিনের মাথায় অসীম লক্ষ্য করল লোপা আর ধ্যানে বসছে না। কুসুমীকে জিগ্যেস করতে সে বলল, ‘যেদিন ফিরলেন তার আগের দিন লাস্ট বসেছিল।’

‘কখন?’

‘ন-টা সাড়ে ন-টা হবে। হ্যাঁ সাড়ে ন-টা। টিভিতে বাংলাদেশের মেয়ে সিরিয়ালটা শুরু হল।’

‘কতক্ষণ ছিল ঠাকুরঘরে?’

‘আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। দিদি যখন ডাকল তখন প্রায় একটা বাজে। তখন খাবার গরম করে খেলাম।’

‘ঠিক আছে। তুই যা।’

অসীম চুপ করে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকল। আর কিছুক্ষণ পরে সে জলপাইগুড়িতে অফিসে চলে যাবে। লোপা সম্ভবত রান্নাঘরে। ড্রইং রুমের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অসীমের মনে হল তাঁর ভেতরে একটা অস্বস্তি শুরু হয়েছে। অলৌকিকতা নিয়ে তাঁর আর সীমন্তিনীর ধারণার মধ্যে কোনও তফাৎ নেই। সীমন্তিনীর হ্যালুসিনেশনের প্রত্যক্ষ কারণ লোপা হতেই পারে, কিন্তু তাঁকে প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে চিন্তা করা আর অলৌকিক কিছু ভাবার মধ্যে পার্থক্য নেই। সে যে লোপাকেই প্রত্যক্ষ করেছে সেটাও নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। কিন্তু সে সময়ে লোপা ধ্যানে বসেছিল। এই দুয়ের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক স্থাপন করতে যাওয়াটা বোকামি। তা সত্ত্বেও একটা অস্বস্তি হচ্ছিল অসীমের।

সোফা ছেড়ে উঠে অসীম সিগারেট ধরাল। নিকোটিনের প্রভাবে যেন স্থিরতা এল তাঁর চিন্তা তরঙ্গে। লোপার ধ্যান আর সীমন্তিনীর ভূত দেখার মধ্যে সম্পর্ক থাকাটা অসম্ভব। আসলে সে এভাবে ভাবতে পছন্দ করছে। কিন্তু এর কারণ কী হতে পারে? লোপার প্রতি দুর্বলতা?

সিগারেটে ধোঁয়া পাক খেয়ে ঘরে ছড়িয়ে পড়ছিল বিচিত্র বিন্যাস ও সমবায়ে। অসীম তা দেখতে দেখতে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। লোপার প্রতি তাঁর দুর্বলতার প্রমাণ গোটা বাড়িটায় ছড়িয়ে আছে। তাঁর দেওয়া উপহারগুলো লোপা ব্যবহার করে। সে সব উপহার কি কেবল কর্তব্য

পালনের জন্য এনেছিল? বাড়িতে অসীমের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের খুঁটিনাটি খেয়াল রাখে লোপা। প্রায় নীরবে। এটা কি স্রেফ ডিউটি? দূরত্ব গড়ে ওঠার প্রাথমিক দিনগুলিতে লোপা মাঝে মাঝেই বলত ডিউটির কথা। এ বাড়িতে সে বউ-এর ডিউটি করে।

লোপা ঘরে ঢুকল। হাতে চায়ের ট্রে। অসীম বেশ অবাক হয়ে তাকাল সেদিকে। এ সময়ে সে চা খায় না, কিন্তু একটু আগে একবার মনে হয়েছিল চা খাবে। হয় তো কুসুমীকে ডেকে বলত চা দেওয়ার কথা।

'চা আনলে যে?'

'মনে হল খেতে পারো।' কাপে চা ঢালতে ঢালতে জবাব দিল লোপা। কচি কলাপাতা রঙের হাউজকোট পরে আছে সে। বুকের কাছটা খোলা। স্তনসন্ধি বেশ প্রকট। লোপা চোখ তুলতেই সেখান থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে অসীম লজ্জা পেল। সে লোপার বুকের দিকে তাকাচ্ছে, অথচ চুরি করে তাকাচ্ছে!

লোপা চোখ তুলে বলল, 'কুসুমী দু'-তিন দিন থাকবে না। বাড়ি যাবে।'

'কবে?'

'কাল সকালে।'

লোপা বেরিয়ে গেল। তাঁর চলে যাওয়ার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল অসীম। সে ভেবেছিল লোপা একটু বসবে। লোপাও কি তাই ভেবে চা নিয়ে এসেছিল?

অসীম হঠাৎ ক্লান্ত বোধ করল। সে যেন এক অতি জটিল আবর্তে পড়ে গেছে। যুক্তিবুদ্ধির জগতের সঙ্গে সেখানে মিশে যাচ্ছে অবোধ্য এক অলৌকিকতার স্রোত। হ্যালুসিনেশন কি তাঁরও হয়নি? সঙ্গমকালে সীমন্তিনীকে বরফের মতো ঠান্ডা বলে মনে হয়েছে তাঁর। একটা অজানা হালকা মিষ্টি গন্ধ তাঁর নাকে এসেছিল সীমন্তিনীর ভূত দেখার আগের মুহূর্তে। এসব কিছুই হয় তো ক্লান্ত মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়া।

অসীম চায়ে চুমুক দিল। উন্নত মানের দার্জিলিং চায়ের উষ্ণতা আর সুবাস তাঁকে সতেজ করল কিছুটা। পুনরায় সিগারেট ধরিয়ে সে ভাবতে লাগল সেই হালকা মিষ্টি গন্ধের পরিচয়। খুব চেনা।

'এত সিগারেট খাচ্ছ?'

অসীম একটু চমকে উঠে মুখ ফেরায়। লোপা ঘরে ঢুকেছে টের পায়নি। অসীম ধূমপান করলেও দিনে চার-পাঁচটা বড়জোর। পরপর সিগারেট খেতে দেখে লোপা হয়ত অবাক হচ্ছে।

'চা খেয়ে ইচ্ছে হল।' অসীম আঙুল ধরা সিগারেটের দিকে একবার তাকিয়ে বলল কথাটা। 'বসো।'

লোপা বসল। মুখোমুখি। অসীম দেখল সে মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে। কপালে আর নাকে ঘামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু। লোপার চুল বেশ লম্বা। এখন সেটা মাথার পেছনে আলগাভাবে বেঁধে রাখা। সিঁথিটা খানিকটা এলোমেলো। এক ইঞ্চি সিঁদুর লেগে আছে। অলঙ্কার বলতে ডান হাতে মধ্যমায় একটা হিরের আঙটি। মাস কয়েক আগে অসীম এনে দিয়েছিল মুম্বই থেকে।

কী বলবে অসীম ঠিক খুঁজে পেল না। বিয়ের আগে লোপাকে প্রথমবার দেখার কথাটা মনে পড়ছিল বারবার। এ ভাবেই মেঝের দিকে তাকিয়ে বসেছিল। অসীমের মা হুকুম দিয়েছিলেন মেয়েকে অতি সাধারণ ভাবে দেখাতে। লোপাকে সাধারণভাবেই দেখেছিল অসীম। তাঁর পছন্দ হয়েছিল। না হলেও বিয়েটা হত কারণ মা পছন্দ করে ফেলেছিল। কিন্তু অসীমেরও মনে ধরেছিল লোপাকে।

'তুমি চা খেয়ে বের হবে তো?'

লোপাই শেষ পর্যন্ত কথা বলল। অসীম তাড়াতাড়ি কাপটা খালি করে নামিয়ে রেখে ব্যস্তসমস্ত ভাবে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ। জরুরি মিটিং আছে।' তারপর বেডরুমে ঢুকে পড়ল বাইরের পোশাক পরার জন্য। অন্যদিনের চাইতে একটু কম সময় নিল জামা-মোজা-প্যান্ট পরতে। শেষে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলে চিরুনি চালাতে লক্ষ্য করল টেবিলে রুপোর তৈরি সিঁদুরের কৌটোর মুখটা খোলা। মুখটা মেঝেতে পড়ে। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে কৌটোর মুখটা বন্ধ করতে গিয়ে হঠাৎ কী খেয়ালে কৌটোটা তুলে নিল অসীম। খোলা মুখটা নাকের কাছে আনতেই এক অজানা অনুভূতিতে পলকের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল সে।

সেই হালকা অথচ মিষ্টি গন্ধটা। সিঁদুরের গন্ধ। লোপা বরাবর একটা বিশেষ কোম্পানির সিঁদুর ব্যবহার করে আসছে।

সীমন্তিনীর সঙ্গে সঙ্গমের সেই ক্ষণে লোপা কি সত্যিই এসেছিল? এ কী সম্ভব?

মিনিট কুড়ি বাদে একটু হলেও ভূতগ্রস্তের মতো গাড়িতে উঠে বসল অসীম। ভাগ্য ভাল হাইওয়েতে জ্যামজট ছিল না। আধঘণ্টার মধ্যে জলপাইগুড়িতে নিজের অফিসে ঢুকে অ্যাকাউন্টেন্ট প্রবালবাবুকে ডেকে পাঠাল সে। পঞ্চাশোর্ধ ভদ্রলোকটি রুমালে মুখ মুছতে মুছতে অসীমের চেম্বারে ঢুকে বললেন, 'জিএসটি-র কাজ তো পরশুই নেমে গেছে। কোনও প্রবলেম?'

'ব্যাপারটা আপনার ডিউটি নিয়ে নয়। বসুন।'

অভিজ্ঞ মানুষটি বেশ কৌতূহল নিয়ে চেয়ারে বসলেন। অসীমকে তিনি স্নেহ করেন। অতি ভদ্র মানুষ। অনেক দূর যাবে। বাপের উপযুক্ত ছেলে। বৌটিও চমৎকার। তবে কানাঘুষোয় শুনেছেন বর-বৌতে নাকি মিল নেই। ডিভোর্সের মামলা হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। তেমন কিছু না হলেই তিনি খুশি হবেন।

'আপনি কী একটা সংস্থার মেম্বার বলেছিলেন— ধ্যান ট্যান করে।' অসীম ক্যাজুয়ালি শুরু করতে চাইল। প্রবালবাবু একটু হেসে বললেন, 'বিশ্ব যোগপ্রচার কংগ্রেস'। সারা বিশ্বে কয়েক লাখ মেম্বার। এখন বোধহয় কোটিতে চলে গেছে।'

'ধ্যানকে আপনারা খুব গুরুত্ব দেন। আমি আপনার দেওয়া কাগজটা পড়েছিলাম। আমার ধ্যান নিয়ে একটা জিনিস জানার ছিল।'

'বলুন।'

'এমনটা কি সম্ভব যে আপনি এখানে বসে ধ্যান করছেন কিন্তু অন্য কোথাও কেউ একজন তাঁর সামনে আপনাকে দেখতে পারছে। —মানে আমি বলতে চাইছি যে—।'

'ধ্যানের মাধ্যমে নিজেকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া সম্ভব।' প্রবালবাবু নড়েচড়ে বসলেন। তিনি তাঁর মালিকের মধ্যে এতদিন আধ্যাত্মিক বিষয়ে কোনও উৎসাহ লক্ষ্য করেননি। প্রথমবার লক্ষ্য করে সিরিয়াস হলেন। 'এমন অনেক এক্সাম্পেল আপনি পাবেন। আমি বই এনে দেখাতে পারি।' তিনি ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। 'ধ্যানের মাধ্যমে এটা ঘটান সম্ভব— কিন্তু খুব কম লোক সেই জায়গাটায় যেতে পারে। মহাপুরুষরা পারতেন। আমাদের যোগপ্রচার কংগ্রেসের ফাউন্ডার অমোঘানন্দ যোগী পারেন। আমাদের এক সদস্য তাঁকে রাত আড়াইটের সময় পানাগড়ের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে দেখেছিলেন— অথচ সেদিন সে সময় অমোঘানন্দ ছিলেন জাপানে।'

'ফ্রবাশি বলে কোনও কিছু জানেন?'

'ফ্রবাশি? সংস্কৃত শব্দ মনে হচ্ছে না তো!'

'সংস্কৃত নয়। এটা একটা প্রাচীন পার্সিয়ান কনসেপ্ট।'

'জানি না। তবে আমাদের মূল কনসেপ্ট হলো ইন সার্চ অফ ট্রুথ থ্রু ধ্যান। সত্য স্বীকার করার জন্য যে মানসিক জোর দরকার তা ধ্যানের মাধ্যমে পাওয়া। এই জোরটা পেলেন মানে আপনি রাজযোগের কোয়ালিটি অর্জন করলেন। তখন আপনি ধ্যান করবেন ব্রহ্মের টেস্ট জানার জন্য। ফিল করবেন যে ব্রহ্ম হলেন সকল সত্যের সত্য। এই কারণে আমরা ধ্যানে বসি সাদা পোশাক পরে।'

'আপনি কখনও সত্যকে স্বীকার করেছেন?'

প্রবালবাবু আচমকা থেমে গেলেন অসীমের প্রশ্নে। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন, 'স্বীকার তো করাই যায়, কিন্তু কঠিন হল বিশ্বাস করা।'

'মানে?'

'ধরুন আপনি জানেন সত্যিটা কী, কিন্তু বিশ্বাস করলেন না। বিশ্বাস করার জন্য শক্তি চাই। আমরা সাধারণ মানুষ। অন্ধকারে ঢাকা থাকি। একমাত্র ধ্যানযোগই পারে আমাদের আলো দেখাতে।'

অসীম কয়েক সেকেন্ড স্তব্ধ হয়ে থাকার পর মৃদু গলায় বলল, 'অনেক ধন্যবাদ।'

১১

অফিসে সারাদিন অন্যমনস্ক ভাবে কাজকর্ম করে অসীম বাড়ি ফিরে দেখল লোপা নেই। কুসুমীর সঙ্গে বেরিয়েছে। এটা অবশ্য নতুন কোনও ঘটনা নয়। কুসুমীকে নিয়ে বিকেল বা সন্ধের দিকে মাঝে মাঝেই বাজারে যায় লোপা। অসীম বাড়িতে একটু ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে পড়ল ক্লাবের পথে। পঁচিশে বৈশাখ উপলক্ষ্যে প্রতিবার ক্লাবের তরফ থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। আজ তার ফাইনাল মিটিং। মিটিং শেষ হল রাত ন'টা নাগাদ। এরপরে আরও কিছুক্ষণ কাটান যেত কিন্তু আকাশের অবস্থা খারাপ হতে থাকায় অসীম ফিরে এল। রাতে ঝড়বৃষ্টি হতে পারে।

অসীমের বাড়িটা একটু সেকেলে ধরনের। তাঁর বাবা বানিয়েছিলেন প্রায় চল্লিশ বছর আগে। বড় বড় ঘর। মোটা দেয়াল। দোতলার চওড়া বারান্দায় পাশ দিয়ে পরপর ঘর। প্রথম ঘরটায় কুসুমী থাকে। অসীমকে বারান্দায় জুতো খুলতে দেখে সে বলল, 'কাল কিন্তু বাড়ি যাচ্ছি।'

'কখন যাবি?'

'সকাল সকাল।'

'আমার সঙ্গে বের হতে পারিস। আমি কাল একটু সকালেই বের হব।'

অসীম ড্রইং রুমে ঢুকল। এরপর প্রতিদিনের নিয়ম অনুযায়ি সে হাতমুখ ধুয়ে হুইস্কি আর টিভি নিয়ে বসবে। জল, আইস বক্সে বরফের টুকরো, গ্লাস, খাবার-দাবার লোপা রেডি করেই রেখে দেয়। মাঝরাত পেরিয়ে কিঞ্চিৎ টলোমলো অবস্থায় শুতে যাওয়ার সময় প্রায় দিনই লোপাকে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে দেখে অসীম। সে নিজেও ঘুমিয়ে পড়ে।

কিন্তু আজকে বাথরুম থেকে হাতমুখ ধুয়ে বেরিয়ে এসে অসীম আর হুইস্কির বোতল বের করায় আগ্রহ পেল না। লোপা পাশের ঘরে বরফ-গ্লাস ইত্যাদি রেডি করছিল। অসীমের হাতে বা টেবিলে কোনও বোতল না দেখতে পেয়ে জিগ্যেস করল, 'ফুরিয়ে গেছে নাকি?'

'ইচ্ছে করছে না।'

লোপা কিছু না বলে সরঞ্জামগুলি টেবিলে নামিয়ে রেখে নীরবে পাশের ঘরে চলে গিয়ে আধ মিনিটের মধ্যে হাতে একটা বোতল নিয়ে ফিরে এল। অসীম এতটা আশা করেনি। সে অপলকে লোপাকে দেখতে লাগল। হলুদ, পাতলা নাইটির আড়ালে একটি ভরন্ত নারী শরীর। তাঁরই বৌ। বোধহয় একটু আগেই স্নান করেছে। কপালে ছোট্ট সিঁদুরের টিপ। সেটার দিকে এক সেকেন্ডের বেশি তাকিয়ে থাকতে পারল না অসীম। লোপা কিন্তু নির্বিকার। বোতলটা টেবিলে রাখতে রাখতে শান্ত ও মৃদু গলায় বলল, 'হঠাৎ না খেলে রাতে ঘুমোতে পারবে না। কাল সকালে সমস্যা হবে।'

" লোপা কিছু না বলে সরঞ্জামগুলি টেবিলে নামিয়ে রেখে নীরবে পাশের ঘরে চলে গিয়ে আধ মিনিটের মধ্যে হাতে একটা বোতল নিয়ে ফিরে এলো। অসীম এতটা আশা করে নি। সে অপলকে লোপাকে দেখতে লাগল। হলুদ, পাতলা নাইটির আড়ালে একটি ভরন্ত নারী শরীর। তাঁরই বৌ। বোধহয় একটু আগেই স্নান করেছে। কপালে ছোট্ট সিঁদুরের টিপ। সেটার দিকে এক সেকেন্ডের বেশি তাকিয়ে থাকতে পারল না অসীম। লোপা কিন্তু নির্বিকার। বোতলটা টেবিলে রাখতে রাখতে শান্ত ও মৃদু গলায় বলল, 'হঠাৎ না খেলে রাতে ঘুমোতে পারবে না। কাল সকালে সমস্যা হবে।' "

অসীম কথা না বাড়িয়ে বোতল খুলে বড় একটা পেগ বানিয়ে খেয়ে ফেলল ঢক ঢক করে। সিগারেট ধরাল। কিন্তু কিছু বলতে পারল না। লোপাকে তাঁর খুব আশ্চর্য লাগছে। কোথাও জানি বদলে গেছে লোপা। তাঁর শরীর থেকে যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে হারিয়ে যাওয়া উষ্ণতার আদিম তরঙ্গ। অসীম সে তরঙ্গ ধরতে পারছে না।

কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে থেকে লোপা উঠে গেল। আধঘন্টা পরে দু'-প্লেট খাবার নিয়ে যখন ফিরে এল ততক্ষণে অসীম আরও খানিকটা পান করে টিভিতে মন দিয়েছে।

অসীমের মন কিন্তু টিভিতে ছিল না। সে আসলে ভাবছিল। বাইরে বেশ জোরে হাওয়া দিচ্ছে। বিদ্যুতের চমক টের পাওয়া যাচ্ছে মাঝে মাঝে। মেঘের ডাক অবশ্য সে ভাবে শুরু হয়নি এখনও। অসীম টিভির দিকে তাকিয়ে ভাবছিল ছাদে যাবে। ছাদে কোনও ঘর না থাকলেও ওপরটা ফাইবার গ্লাস দিয়ে ঢাকা। মাসে এক আধদিন রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে ছাদে আসে অসীম। এখন সে ছাদে যাওয়ার কথা ভাবছিল সীমন্তিনীকে ফোন করবে বলে। অসীমকে রাতের খাবার দিয়ে লোপা ঘুমোতে যায়। তারপরই ছাদে যাওয়ার কথা ভাবছিল অসীম।

আরও ঘণ্টাখানেক পর যখন একদফা ঝড়ের পর জোর বৃষ্টি শুরু হয়েছে অসীম তখন ছাদের সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল। স্ট্রিট লাইটের কারণে ছাদের অন্ধকারটা একটু পাতলা হয়েছিল। হাওয়ার ঝাপটা বাঁচিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে সীমন্তিনীর নাম্বার ডায়াল করল অসীম। তিন চারবার রিং হতেই সীমন্তিনীর গলা শুনল সে— 'কী ব্যপার? কিছু ঘটেছে নাকি?'

অসীম ফোন প্রায় করে না বললেই চলে। সীমন্তিনীই ফোন করে দেখা সাক্ষাতের ব্যপারটা ঠিক করে। সে টুকু বাদ দিলে দু'-জনের মধ্যে ফোনে কথা হওয়ার বিশেষ কিছু নেই। সীমন্তিনী তাই বেশ অবাক হয়েছিল।

'তোমাকে কিছু বলতে চাই।' অসীম বলল।

'বলো।'

'তুমি বলেছিল সেদিন যে মেয়েটাকে হ্যালুসিনেট করেছিলে সেটা লোপা। আমার সন্দেহ ছিল। কিন্তু এখন আর নেই।'

'কী করে সিওর হলে?'

'আমিও একটা গন্ধ পেয়েছিলাম সেই রাতে। তখন আইডেন্টিফাই করতে পারি নি, কিন্তু আজ সকালে পেরেছি। গন্ধটা সিঁদুরের। লোপা ইউজ করে সিঁদুরটা।'

'তার মানে তুমিও ওকে হ্যালুসিনেট করেছ।' সীমন্তির গলা উত্তেজিত শোনাল একটু। 'দু'-জনে একই সময়ে লোপাকে হ্যালুসিনেট করেছি— এর ব্যাখ্যা কী হতে পারে?'

'আমি জানি না। আমি বেশ আনকম্ফর্টেবল ফিল করছি। অনেকটা হুইস্কি খাওয়ার পরেও সেটা যাচ্ছে না। লোপার কি কোনও সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার আছে?'

'সেটা সম্ভব নয়। তবে তাঁর উইল পাওয়ার কাজ করতে পারে। আমার মনে হয় সে তোমাকে চাইছে।'

'সেটা নতুন কিছু নয়। লোপা আমাকে কখনও ত্যাগ করেনি।'

'হয় তো তাঁর চাওয়ার তীব্রতা বেড়েছে। তাঁর উইল ফোর্স আমাদের চিন্তা তরঙ্গে প্রভাব বিস্তার করছে।'

'এমন কি হতে পারে?'

'পারে। সেটা অলৌকিক কিছু নয়। অবশ্য আরও ব্যাখ্যা দেওয়া যায়।'

'কী?'

'তুমি অবচেতনে লোপার শরীরের কাছে ফিরে যেতে চাইছ। আমিও হয়ত তোমার ফিরে যাওয়ার ইচ্ছেটা ফিল করতে পারছি। সবই অবচেতনের খেলা। গেম অফ সাবকন্সাস। এইসব হ্যালুসিনেশন হয়ত এই খেলারই ফলাফল। ভেবে দেখ, আমরা দু'-জনে একই সময়ে লোপাকে হ্যালুসিনেট করেছি অ্যান্ড ইন দ্য টাইম অফ সেক্স।'

'হতে পারে।'

'সে জন্যই বলেছিলাম আমাদের সম্পর্কটা এন্ড করতে।'

'ঠিকই বলেছ। থ্যাঙ্কস ফর দ্য ডিশিসান।'

সীমন্তিনী কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, 'তুমি কি এখন

বাড়িতে?'

'হ্যাঁ। ছাদে।'

'লোপা কোথায়?'

'ঘরে। ঘুমোচ্ছে।'

'তুমি কি ওকে ভয় পাচ্ছ?'

'না। বাট আই অ্যাম কনফিউজড সীমন্তিনী। হোয়াট শুড আই ডু উইদ হার?'

'ট্রাই টু গেটিং আ ম্যান।'

'কী ভাবে?'

'সেক্সের ক্ষেত্রে লোপা কেন হঠাৎ ফ্রিজিড হয়ে গেল সেটা তুমি বোধহয় জান, তাই না?'

'জানি।'

'দেন ইউ মাস্ট নো ইওর ডিউটি অসীম।'

'সেটা স্বীকার করা খুব কঠিন সীমন্তিনী।'

'এবার বোধহয় সময় এসেছে।'

'আই উইল ট্রাই।'

'উইশ ইওর গুড লাক। গুড নাইট।'

কথা বলতে বলতে ছাদের কোণায় চলে এসেছিল অসীম। বৃষ্টির ছাঁট তাঁকে ভিজিয়ে দিল। সীমন্তিনী 'শুভরাত্রি' বলেই ফোন কেটে দিয়েছে। সে কি দুঃখ পেল? অসীম ভিজতে ভিজতেই নিজেকে জিগ্যেস করে। তারপর আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে বৃষ্টিমাখা হাওয়া মাখতে থাকে শরীরে।

জীবন এক সত্যমুখী প্রবাহ। অসীম ভাবল। সে আসলে প্রবাহচ্যুত। ভেজা শরীরে ধীরে ধীরে নেমে এসে বেডরুমে ঢুকল নিঃশব্দে। লোপা পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছে। অসীম চোখ সরাতে পারছিল না। খুব ধীরে বিছানায় উঠে পাশে শোয়া অবধি একবারও চোখ সরাতে পারল না নিদ্রামগ্ন স্ত্রীর শরীর থেকে। সে যেন কেমন একটা ঘোরের মধ্যে চলে যাচ্ছিল। বালিশে মাথা দিয়ে চিৎ হয়ে গভীর নিঃশ্বাস ফেলল একটা। অফিসে প্রবালবাবুও বলছিলেন 'ফেসিং দ্য ট্রুথ' নিয়ে। সীমন্তিনীও তাই বলল। কিন্তু কীভাবে?

বেশি ভাবতে পারল না অসীম। ঢলে পড়ল গভীর নিদ্রায়।

জীবন এক সত্যমুখী প্রবাহ। অসীম ভাবল। সে আসলে প্রবাহচ্যুত। ভেজা শরীরে ধীরে ধীরে নেমে এসে বেডরুমে ঢুকল নিঃশব্দে। লোপা পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছে। অসীম চোখ সরাতে পারছিল না। খুব ধীরে বিছানায় উঠে পাশে শোয়া অবধি একবারও চোখ সরাতে পারল না নিদ্রামগ্ন স্ত্রীর শরীর থেকে। সে যেন কেমন একটা ঘোরের মধ্যে চলে যাচ্ছিল। বালিশে মাথা দিয়ে চিৎ হয়ে গভীর নিঃশ্বাস ফেলল একটা। অফিসে প্রবালবাবুও বলছিলেন 'ফেসিং দ্য ট্রুথ' নিয়ে।

১২

ঘুম ভাঙতেই ছিটকে বিছানার ওপর উঠে বসল অসীম। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠে কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো বসে থেকে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করল। দশটা চল্লিশ। কাল ঘুমোতে যেতে দেরি হয়েছিল। কিন্তু তার পরিণামে বেলা সাড়ে দশটা পর্যন্ত ঘুমনোর কোনও যুক্তি নেই।

বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। হয়ত সেই কারণে বেলা বোঝা যাচ্ছিল না। তা সত্ত্বেও অসীম শেষ কবে এত বেলা করে ঘুম থেকে উঠেছে সেটা মনে করতে পারল না। কিন্তু যা ঘটার ঘটে গেছে। তাঁর শয্যা ত্যাগের সময় সকাল সাতটা। লোপা তার ঘণ্টা খানেক আগে উঠে পড়ে। আসলে কাল গোটা দিনটা বেশ চাপের ছিল। হুইস্কি পানের পরিমাণটাও মাত্রা ছাড়িয়েছিল। লোপাকে সকালে ডেকে দেওয়ার কথা বলে রাখলে নিশ্চই ডেকে দিত সে।

অসীম বাথরুমে ঢুকল। মিনিট পনের পর স্নান সেরে সতেজ দেহমন দিয়ে ঘরে এসে দেখল লোপা চায়ের আয়োজন শুরু করেছে। কুসুমী নিশ্চই চলে গেছে। কাজের লোক কেউ আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। অসীমের সিগারেট কাল রাতেই ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু লোপাকে দেখে সে কিছু না বলে থমকে দাঁড়াল। লোপা শাড়ি পরেছে। সকালের দিকে মাঝে মাঝে যে সে শাড়ি পড়ে না, তা নয়। কিন্তু এখনকার শাড়ি পরার ধরনটি বেশ প্ররোচনামূলক। সাধারণ ছাপা শাড়ি। ব্লাউজটা বেশ ছোট। পিঠের দিকে অনেকটা খোলা। অসীমের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে হাসল।

ও কি সত্যিই আসতে চাইছে?

অসীম হঠাৎ খানিকটা সাহস পেল মনে মনে। নিজেকে যতটা সম্ভব শান্ত রেখে জিগ্যেস করল, 'কাজের মাসীরা কেউ আছে নাকি? সিগারেট আনাতাম।'

'কুসুমী না থাকলে আমি ওপরে একাই থাকি।'

'শাড়ি পরেছ?'

'একেবারেই যে পরি না তা তো নয়।'

'এ ভাবে?'

কথাটা বলে অসীম দমবন্ধ করে থাকল। কিন্তু লোপা একবার কেবল চোখ তুলে তাকিয়ে চা ঢালতে লাগল পট থেকে।

'একটা কথা বলব?' অসীম আবার আত্মবিশ্বাস সঞ্চয় করে জিগ্যেস করল। লোপা চিনি মেশাতে মেশাতে স্বাভাবিক গলায় বলল, 'বলো।'

'তুমি কি আমাকে সন্দেহ কর লোপা?'

'কেন?'

'আমার কোনও রিলেশনের ব্যাপারে—।'

লোপার কোনও বিকার লক্ষ্য করা গেল না। সে সহজভাবে চায়ের কাপটা এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'আমার কোনও রাগ নেই ওকে নিয়ে। আমি তো জানি যে আমি পারতাম না।'

কাপটা এগিয়ে দিয়ে লোপা উঠতে যাচ্ছিল। অসীম প্রায় ধমকের সুরে বলল, 'উঠবে না! বসো!'

লোপা বসল না। চুপ করে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে থাকল। অসীমের মাথা তখন গরম হয়ে গেছে। লাফ দিয়ে উঠে লোপার কাঁধ দুটো চেপে ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, 'তুমি সব জান লোপা! তুমি সেদিন এসেছিলে! বলো? এসেছিলে, তাই না?'

লোপা অসীমের চোখের দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বলল, 'কোথায়? আমি কোথায় গেছিলাম?'

'আমি আর সীমন্তিনী একসঙ্গে টের পেয়েছি তুমি এসেছিলে! টেল মি! এটা কীভাবে করলে?'

'আমি জানি না। আমি কিছু করিনি।'

অসীম ধাক্কা দিয়ে লোপাকে ঠেলে নিয়ে দেয়ালের মধ্যে চেপে ধরে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বলল, 'আমি স্বীকার করছি লোপা আমি শরীরের জন্য সীমন্তিনীর কাছে অনেকবার গিয়েছি।'

'পুরনো কথা থাক।' নিজেকে একবারের জন্য মুক্ত করার ইচ্ছে প্রকাশ না করে আগের মতই নরম ভাবে বলল লোপা। অসীম এবার দু'-হাতের তালুতে লোপার গাল দুটো নিয়ে তাঁর কপালে চুমু খেল। চুমু খেতে খেতেই বলল, 'আমি জানি তুমি কেন আদরের সময় ঠান্ডা হয়ে যেতে। আই নো দ্য কজ লোপা!'

'ভুলে যাও প্লিজ!'

'তুমি সেদিন দরজা খুলে চুলে মাখার তেলের গন্ধ পেলে। গন্ধটা সত্যিই ছিল লোপা!' অসীম স্মরণাতীত কাল পরে বৌকে গভীর ও প্রাণবন্ত চুম্বনে ভরিয়ে দিচ্ছে। কোথাও কোনও শীতলতা নেই। এক অপার্থিব উষ্ণতার জন্ম হচ্ছে।

'অসীম প্লি-জ!'

'সত্যি স্বীকারে ফল হাতে হাতে পাচ্ছি লোপা! তুমি জীবন্ত হয়ে উঠছ!'

লোপা আর কিছু বলল না। নিজেকে ছেড়ে দিল অসীমের হাতে। ছেড়ে দিয়ে যেন নিশ্চিন্ত হল। সে টের পাচ্ছে শরীরের জেগে ওঠা। শরীরকে বহু আকাঙ্ক্ষিত নিশ্চিন্ত সমর্পণ করার জন্য আঁচলটা ফেলে দিয়ে আহ্বান জানাল অসীমকে। এক ডাকেই বুনো অসীম খোলস ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল মুহূর্তে। ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল দুরন্ত রমণের উচ্ছ্বাস। শীৎকার ও গোঙানিতে থর থর করে কাঁপতে লাগল দোতলার হাওয়া।

তারপর সব শান্ত হল। লোপার ঘামে ভেজা নিরাবরণ শরীর বুকের নিচে রেখে তৃপ্ত অসীম ফিস ফিস করে বলল, 'কথা দাও আর ধ্যান করবে না।'

'আর একদিন।'

'কবে?'

'বলব। তারপর আর না।'

'প্রমিস?'

'প্রমিস।'

বাইরে বৃষ্টি পড়েই চলেছে। লোপার চোখেও বৃষ্টি নামল। না। সেই ফ্রবাশির জগত সে চায় না। সে চায় স্বামীসঙ্গ, সংসার। কিন্তু আর একবার তাঁকে যেতেই হবে। কে সেই কণ্ঠস্বরের মালিক? কেন তাঁর এত দয়া হলো?

১৩

কয়েক সপ্তাহ পরের কথা। লোপা-অসীমের জীবন ধূসর দূরত্বের অভিশাপ কাটিয়ে আলোকোজ্জ্বল চাদরে ঢেকে নিয়েছে নিজেকে। গোটা বাড়িটায় অনেক দিন পর ফিরে এসেছে মুক্ত জীবনের উল্লাস। খুব তাড়াতাড়ি তাঁরা গোয়া যাচ্ছে। অসীমের কাছে প্রতিটা সকাল যেন বয়ে নিয়ে আসছে অনন্ত সম্ভাবনা। সংক্ষেপে তাঁদের জীবন এখন প্রকৃতই 'মধুর'।

লোপা শেষবার ধ্যানে বসল ঠাকুর ঘরে। সারা দিন প্যাচপ্যাচে গরমের পর বিকেলের দিকে সামান্য স্বস্তি দিয়ে হাওয়া বইতে শুরু করেছিল। কুসুমীর জ্বর জ্বর ভাব। তাঁর মাথা ধরে আছে। অসীম জলপাইগুড়ি থেকে মিটিং সেরে আটটা-ন'টার আগে ফিরবে না। তাঁকে অবশ্য দুপুরের দিকে ফোনে লোপা জানিয়ে দিয়েছে ধ্যানে বসার কথা। আজকের পরে আর কোনও দিন সে যেতে চাইবে না ফ্রবাশির জগতে। দিনটার জন্য সে মনে মনে প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। একটা সংবাদের জন্য অপেক্ষা করেছিল এই ক'টা দিন। সেই খবর তাঁর জানা হয়েছে গতকাল।

লোপা শেষবার ধ্যানে বসল ঠাকুর ঘরে। সারা দিন প্যাচপ্যাচে গরমের পর বিকেলের দিকে সামান্য স্বস্তি দিয়ে হাওয়া বইতে শুরু করেছিল। কুসুমীর জ্বর জ্বর ভাব। তাঁর মাথা ধরে আছে। অসীম জলপাইগুড়ি থেকে মিটিং সেরে আটটা-ন'টার আগে ফিরবে না। তাঁকে অবশ্য দুপুরের দিকে ফোনে লোপা জানিয়ে দিয়েছে ধ্যানে বসার কথা। আজকের পরে আর কোনও দিন সে যেতে চাইবে না ফ্রবাশির জগতে। দিনটার জন্য সে মনে মনে প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে।

দরজা বন্ধ করে দিলে ঠাকুর ঘরটা বেশ গরম হয়ে ওঠে। লোপা মনোসংযোগ করার চেষ্টা করল। তারপর এক সময় সে প্রত্যক্ষ করল সেই অবিশ্বাস্য আলোর জগৎ আর সেই সঙ্গে অতি মনোরম পরিবেশে থাকার অনুভূতি। বাইরে থেকে কেউ লোপাকে দেখতে পেলে বুঝতে পারত ঠাকুর ঘরের ভ্যাপসা গরমে বসে থাকা সত্ত্বেও তাঁর শরীরে এক ফোঁটা ঘাম নেই এবং মুখে ফুটে উঠেছে তৃপ্তির ছাপ।

'এখন তুমি সুখি।'

পরিচিত কিন্তু রহস্যময় কণ্ঠটি শুনতে পেল লোপা।

'তাই তোমার আর এ জগতে আসার দরকার নেই।'

'আজই শেষ।' লোপা বলল। 'আপনি নিশ্চই বুঝতে পারছেন আমি আজ কী জানতে চাইব?'

'আমার পরিচয়, তাই তো?'

'কে আপনি? এসব কেন ঘটালেন?'

'বলছি। আসলে আমার পরিচয় হয় না। এখন আমি বিশুদ্ধ ফ্রবাশি। আমার কোনও জন্ম নেই। কোনও প্রতিরূপ নেই। শেষ জন্মে আমার নাম ছিল তাজউদ্দীন আনসারি। —অবাক হচ্ছ?'

'আমার সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক?'

'তুমি ছিলে আমার শেষ জন্মের সাধনসঙ্গিনী।'

'এ ও কি সম্ভব?'

'আমি মুক্তি পেয়েছি। তুমিও পেতে পারতে। তোমার সে যোগ্যতা ছিল। কিন্তু তুমি চাওনি।'

'আমি স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখে বাঁচতে চাই।'

'এটা কোনও অপরাধ নয়। কিন্তু এক রাতে দরজা খুলে খুব চেনা কেশতেলের গন্ধ পেলে। তোমার মনে ভয় ঢুকে গেল।'

'অসীমকে আকারে ঈঙ্গিতে বলেছিলাম। কিন্তু তাঁর পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব ছিল না। কোনও ছেলের পক্ষে তা সম্ভব নয়।'

'বিশ্বাস করেছিল। তোমার কাছে স্বীকার করেনি। নয় তো তোমার শীতলতা সে দূর করে দিত অনায়াসে। আসলে কেশতেলের গন্ধ তাঁকেও তাড়া করে বেরিয়েছে। তোমরা দু'-জন খুব অসহায়ের মতো পরস্পরের কাছ থেকে কেবলই দূরে চলে যাচ্ছিলে।'

'সে কারণেই কি বইটা পড়ালে?'

'তুমি খুব ভাল মেয়ে। গতজন্মে কেবল ভালবেসেই আমার সঙ্গে ছিলে। তোমাকে সঙ্গিনী হিসেবে না পেলে আমার মুক্তিলাভ হত না। তাই মনে হল তোমাকে এ জগতে আনতে হবে। অসীমের মনকে সত্যের দিকে ঠেলে দিতে হবে। তুমি পেরেছ। না পারলে আজীবন ধ্যানের জগতে অন্ধের মতো ঘুরে বেড়াতে হত তোমাকে। তুমি পাগল হয়ে যেতে।'

'আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।'

'এবার ফিরে যাও। আর কোনও দিন ধ্যানের মাধ্যমে এখানে আসতে চেও না। পারবে না।'

'আসব না। কথা দিয়েছি।'

'আর কিছু জানতে চাও?'

'না। শুধু আশীর্বাদ চাই।'

'মনে রেখ, প্রতিটি সদ্যজাত শিশুর মধ্যে তাঁর ফ্রবাশি সব চাইতে শুদ্ধরূপে অবস্থান করে। তুমি আজ শেষবারের মতো এখানে আসার আগে অপেক্ষা করেছিলে।'

'আমি গর্ভবতী। কাল নিশ্চিত হয়েছি।'

'আমার আশীর্বাদ রইল নাজনীন।'

'নাজনীন?'

'তোমার গত জন্ম। বিদায়।'

লোপা চোখ খুলল। ঠাকুর ঘরের দরজা খুলল। এক ঝলক হাওয়া তাঁকে জুড়িয়ে দিল যেন। অন্ধকার হয়ে আসছে। ঘরের আলোগুলো জ্বালিয়ে দিতে হবে। কিন্তু লোপা আবছা অন্ধকারের মধ্যেই হাঁটতে হাঁটতে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। সামনে খোলা আকাশ। ছায়াময় সেই আকাশের পশ্চিমপ্রান্তে ঝুলে থাকা একফালি মেঘের নিচে এখনও অস্ত যাওয়া সূর্যের শেষ নিঃশ্বাসটুকু লেগে আছে। সেই রঙের টুকরোর দিকে তাকিয়ে লোপার ভারি আনন্দ হলো। পৃথিবী বড় সুন্দর।

লোপা তাঁর ডান হাতটা খুব মোলায়েম ভাবে পেটের ওপর বোলাতে লাগল। সেখানে, জরায়ুর নিরাপত্তায় কয়েকটি কোষে আসতে শুরু করেছে সঙ্কেত। ফ্রবাশির সঙ্কেত।

অসীম আজ খুব খুশি হবে।

অলঙ্করণ: দেবরাজ কর

শালবনে রক্তের দাগ

চেয়ারটা আমাকে মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেয়। সত্যম-রুক্মিণী যে বাপ-বেটি নয় তা আমি কিন্তু জানি। আমি জানি সুন্দর মুখ সহজে বিক্রি করে দেওয়া যায়। কিন্তু আমাকে খেলাচ্ছে কে? ভবিষ্যতে কাজে লাগবে বলে আমি অনেক কিছুই রেখে দিই গুপ্ত রুমে। শ্যামল জামিন পেয়ে ফিরে এল ছায়ার মতো। আমি খোলা জানলায় বেশিক্ষণ দাঁড়াই না, হয় তো ওয়ান শটার আমার দিকে তাক করা আছে। আর সেই ফিসফিসে কণ্ঠস্বর আমাকে সাবধান করে দেয়, কাঁটা সরাও! কাঁটা! —তারপর? **সাগরিকা রায়ের** ধারাবাহিক থ্রিলার।

২৮

শরীর বড্ড খাই খাই করছে। কতদিন উপোষী আছি! মায়া চলে গেল, তা সেও হয়ে গেল প্রায় তিন মাস। রুক্মিণীও ব্যস্ত। এজেন্সির ফোন নম্বরে ফোন করে সময় কাটাচ্ছি। মেয়েগুলো ফ্যান্টাস্টিক। দারুণ জমিয়ে কথা বলে। কথা বলাই সার। ওদের বাড়িতে এনে বেড পার্টনার করতে চাই না।

ফোন এসেছে। কার ফোন এই নম্বরে? এটা তো সাজিদ জানে না। তাহলে... উম, সত্যম! সত্যমের ফোন। কোথায় সত্যম? শয়তানের কথা ভাবছি, আর শয়তান চলে এল। এখন সত্যম ফোন করল কেন?

—আরে ভাই, ফোনটা রিসিভ করতে ভয় পাচ্ছ নাকি? হা হা হা! ফোন ধরো ফোন ধরো। ভয় কী?

—তুমি কোথায়? পাত্তাই নেই! খুব ব্যস্ত নাকি? রুক্মিণী কোথায়?

—আছে আছে! সব আছে। তোমার পাশেই আছি। একটু চোখ মেলে তাকাও। হা হা হা।

সত্যম এখানে এসেছে? কোথায় ও?

—এসেছ নাকি এখানে? তাহলে কোথায় আছ?

—যদি বল তোমার বাড়িতে যেতে, তাহলে যাচ্ছি।

—এস এস। এটা আবার একটা প্রশ্ন হল? আমি ওয়েট করছি।

আশ্চর্য! সত্যম এখানে এসেছে! আমাকে জানতে দেয়নি কেন? শ্যামলের সঙ্গে যোগাযোগ আছে ওর! কেন আসছে সত্যম? অস্ত্র নিয়ে জবাবদিহি করবে? আসুক।

ব্যালকনিতে বসে হুইস্কিতে চুমুক দিচ্ছি, সত্যমের গাড়ির আওয়াজ পেলাম। আসছে লোকটা। আমার সামনে দাঁড়িয়ে জবাব চাইবে।

—হ্যাললো ডিয়ার! হুইস্কি? একা একা? আমি আছি মনে রেখ। সত্যম সোফায় শরীর ছেড়ে দিল —দাও। ভারি টায়ার্ড ফিল করছি।

আমি তাকিয়ে দেখলাম রুক্মিণী আসেনি। ধুস!

—হা হা হা। হেসে উঠল সত্যম —আসেনি আসেনি। যার জন্য উতলা হয়ে আছ, সে আসেনি।

—ভেরি ব্যাড সত্যম। তুমি জান, আমি উপোষ করে আছি।

—ওহ মাই ডার্লিং! আমি এখানে। রুক্মিণী মদালসা। দূরে দাঁড়িয়ে হাসছিল। গোলাপি ও সোনালি কম্বিনেশনের অ্যাসিমেট্রিক্যাল কাটের কুর্তা আর সঙ্গে পালাজো। এমব্রডারি করা নেটের দোপাট্টায় উদ্ধত যৌবনের তীব্র আহ্বান।

—আরে সুন্দরী! ওপরলাকে খুশি রাখতে গিয়ে নীচেওলাকে ভুলে গেলে?

—নটিই রয়ে গেলে। হেসে সোফায় বসে পড়ল রুক্মিণী।

—হল দেখা? এবারে কাজের কথায় আসি। সত্যম গেলাস ভরে নিল —অস্ত্রগুলো গেল কোথায় বলতো? অতগুলো অস্ত্র! চোরের সাধ্য নেই সেগুলো খুঁজে বের করে! কম ঝামেলা যায়নি ওগুলো এককাট্টা করতে। শ্যামল আর আমি ছাড়া কেউ জানতো না।

—তাহলে তোমরাই বল, কোথায় গেল অস্ত্র। যেহেতু তোমরা দু'জন ছাড়া আর কেউ জানতোই না! দেখ সত্যম, শ্যামলকে তুমি যা জানতে বলেছিলে, যেভাবে উসকে ছিলে, শ্যামল তার সবটা করেছে। এর জন্য ওকে এক্সট্রা নোট দিও। বেচারা এই লোভেই তো ডাবল এজেন্টের কাজটা নিয়েছিল! কিন্তু তোমাদের জোর করে আমাকে ফাঁসানোর প্রোগ্রামটা এবারে বন্ধ কর। ওটা এখন ক্লোজ চ্যাপ্টার। শ্যামল নিশ্চয় সবটাই বলেছে

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:15,000
Full Page, B/W: 9,000
Half Page, Colour: 8,000
Half Page, B/W: 6,000
Back Cover: 30,000
Front Inside Cover: 20,000
Back Inside Cover: 20,000
Double Spread: 30,000

Special Rates for Local Trade only
Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {18.9cm (W) X 27.07 cm (H)}, Non Bleed {15.5cm (W) X 23 cm (H)}, Half Page Horizontal {15.5cm (W) X 11.2 cm (H)}, Vertical {7.5 cm (W) X 23 cm (H)}, Strip Ad Vertical {4.8cm (W) X 23 cm (H)}, Horizontal 15.5 cm (W) X 5.2 cm (H), 1/4 Page 7.5 cm (W) X 11 cm (H), 1/6 Page {4.8 cm (W) X 11.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2017 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

তোমাকে?

—তুমি যে সত্যি বলছো তার কী প্রমাণ?

—প্রমাণ আমি জোগাড় করে রাখতে যাব কেন? পুরো ব্যাপারটাই আমার অজানা যখন! ইডিয়টের মতো কথা বল না সত্যম। বুদ্ধি খরচ করো। আমি গেলাসে হুইস্কি ঢেলে নিলাম। রাগ জমছে ভেতরে। আমার ইমেজ জলের মত স্বচ্ছ। সোনা পাচারের বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ করে ফোন করে পাচারকারীদের ধরিয়ে দিয়েছি। নারী পাচার করেছে সত্যম দিনের পর দিন। শ্যামলের থেকে তার তালাশ নিয়ে সময়, তারিখ, কোথা থেকে এনেছে সব লিপিবদ্ধ আছে। সত্যম আমাকে রোয়াব দেখাতে এলে নিজেই ফাঁদে পড়ে যাবে বেচারি।

—তুমি অস্ত্র এনেছিলে কোথা থেকে?

> আসলে সত্যমের ফন্দিটা আমি বুঝতে চেষ্টা করছিলাম। ও কেন এসেছে? শ্যামল সত্যমকে কী এমন খবর দিল? পুকুর থেকে অস্ত্র তোলার খবর নিখিল ছাড়া কেউ জানতো না। যদিও নিখিল অস্ত্রের খবর জানতো না। ও জানতো পুকুর থেকে কয়েকটা প্ল্যাস্টিকের বস্তা তোলা হয়েছে।

বাংলাদেশ? নেপাল? চিন? যতদূর জানি, কলকাতার বন্দর ও পার্ক সার্কাসের ঘিঞ্জি এলাকাতে অস্ত্র-কারখানা তৈরি করেছে কারবারিরা। মুঙ্গের থেকে কারিগর আর মেসিন নিয়ে ওই সব কারখানায় সেভেন এম এম, নাইন এম এম পিস্তল ও ওয়ান শটার বানাচ্ছে। পনের-কুড়ি হাজারে সেভেন এম এম পাবে। কেন অযথা বাইরে থেকে চোরাই মাল আনছো?

—সত্যম ভ্রু তুলে ফিচেল হাসি হাসল —লোক ঠাকাচ্ছ? নাইন এম এম শুধু না, অন্য মালগুলোর কথাও বল প্রফেসর।

—কিচ্ছু বলার নেই। আমার এবারে বলার কথা। আমার অনুমতি না নিয়ে আমার পুকুরে অস্ত্র লুকিয়েছিলে কেন? সেই অস্ত্র নিজেই সরিয়ে শ্যামলকে ভাগ থেকে আউট করে দিতে দোষটা আমার ঘাড়েই চাপালে? আমি তোমাকে বুঝতে পারছিনা। সোনা পাচারের সময় কে বাঁচিয়েছে তোমাদের? এখন এসেছ আমাকে ফাঁসাতে? আমার গলা চড়ছে। সত্যম একটু ভয় পেল যেন —আঃ! হচ্ছে তোমার আমার কথা, এর মধ্যে শ্যামল আসে কেন?

—কেন আসে? তুমিই বল দেখি। কাল শ্যামলকে পাঠিয়ে আমাকে শাসাতে বলেছিলে?

হা হা হা শব্দে হেসে উঠল সত্যম —আরে গুরুদেব! তুমি তো জিনিয়াস।

মন কষাকষি তখনকার মতো ঢাকাচাপা পড়ে গেল। রুক্মিণী আমার হাত ধরে পাশে বসে এলিয়ে পড়ল কোলে —ঝগড়া না। আমার ভাল লাগে না! চুপ কর তোমরা প্লিজ।

আমি সত্যি সত্যি চুপ হয়ে গেলাম। আসলে সত্যমের ফন্দিটা আমি বুঝতে চেষ্টা করছিলাম। ও কেন এসেছে? শ্যামল সত্যমকে কী এমন খবর দিল? পুকুর থেকে অস্ত্র তোলার খবর নিখিল ছাড়া কেউ জানতো না। যদিও নিখিল অস্ত্রের খবর জানতো না। ও জানতো পুকুর থেকে কয়েকটা প্ল্যাস্টিকের বস্তা তোলা হয়েছে। ওগুলোতে কী আছে নিখিল জানতোই না! তাহলে সত্যম কিসের ভিত্তিতে আমাকে সন্দেহ করছে? যারা অস্ত্রগুলো কিনেছে, তারাই কি? নিশ্চয় তারাই জানিয়েছে। যদিও এই অন্ধকার জগতেরও একটা নিয়ম আছে গদ্দারি না করার। বিশ্বাসঘাতকতাকে এখানে সহ্য করে না কেউ। তাহলে? তাহলে? আবেগ বিসর্জন দিয়ে ভাবতে হবে। অস্ত্র যারা কিনে নিয়ে গেল, তাদের সূত্র থেকেই খবরটা পেয়েছে সত্যম। এছাড়া অন্য অপশন নেই। নিখিল বেঁচে থাকলে ওর নামটাই আগে আসতো। কিন্তু এই খবর ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়েই কি নিখিলকে সরিয়ে দিতে হয়নি? তাহলে লাভটা হল কী?

—আমি এতদিন পরে এলাম, তুমি আমার সঙ্গে কথা না বলে ঝগড়া করছো? রুক্মিণী ছদ্মকোপে তাকাল। আমি ওর ঠোঁটে আমার গেলাস ছুঁইয়ে দিলাম। এক ঢোক হুইস্কি গিলে রুক্মিণী ইশারা করল ওকে দিতে। ব্যালকনিতেই আসর বসে গেল। রুক্মিণী বেহেড হয় না কখনও। আজও হল না। একটু পরেই আসছি বলে চলে গেল। ওয়াশরুমে যাচ্ছে। ওর দোপাট্টার অনেকটা মেঝে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। পিঠের অনাবৃত অংশে আলো পড়ে ঝলকে উঠছে। আমি সেদিকে তাকিয়ে দেখছি বলেই সত্যম ফের জোরে হেসে উঠল।

—আরে, নেশা তোমার হাতে লাজুক হাসছে, তুমি অন্যদিকে কেন নেশা খুঁজে মরছো?

চোখ সরিয়ে হাসলাম —কিন্তু সত্যম, তোমার ব্যাপারটা খোলাখুলি বলছো না! আমার বিরুদ্ধে কেন শ্যামলকে লাগিয়েছ তুমি?

—কারণ, তুমি ছাড়া আর কেউ অস্ত্রপাচার করেনি। সত্যম গম্ভীর।

—সত্যি? প্রমাণ?

—প্রমাণ নিখিল। তুমি নিখিলকে দিয়ে মাল তুলিয়েছ। তারপরে ওকে হাপিস করেছ। শ্যামল নিখিলের বাড়িতে গিয়েছিল। তুমি নাকি নিখিলকে কলকাতায় পাঠিয়েছ? কবে পাঠালে? ওর বোনটাকে বিয়ে দিয়েছ? আরে বাবা, এসব ভাল খবরগুলো বলতে হয়। লুকিয়ে রাখতে নেই। লুকিয়ে রাখলেই সন্দেহ হবে। ঠিক করে বলতো, বোনটাকে পাচার করেছ, তাই না? হা হা হা! তুমি আমার গুরুদেব ভাই।

আমি স্থির হয়ে রইলাম। সত্যম যুক্তিগুলো

ভাল সাজিয়েছে। শ্যামল নিখিলের বাড়িতে গিয়েছিল? আমাকে কিছু বুঝতে দেয়নি!

২৯

আমার ঘুম আসছে না। আমার চারপাশে একটা সূক্ষ্ম জাল আমি টের পাচ্ছি। এত শত্রু থাকলে কতজনকে সরিয়ে দেব? সত্যমের সঙ্গে কথা বলতে হবে। অস্ত্রের পাচারের ব্যাপারে ওকে কিছু বুঝতে দেব না। সামান্যতম সূত্র যাতে ও বুঝতে না পারে, সেদিকটা খেয়াল রাখতে হবে। সত্যমকে গলায় সুতো বেঁধে নাচাবো। ও নাচবে আমার ইশারায়। উত্তেজক ভঙ্গিতে রুক্মিণী অসাড়ে ঘুমোচ্ছে। সেদিকে দেখেও দেখলাম না। মন অন্যদিকে আছে। আমি আস্তে উঠে বসলাম। অন্ধকার ঘরে বসে সামনের দিনগুলো স্পষ্ট দেখার চেষ্টা করছিলাম। সত্যমের কীর্তিকলাপের অনেক প্রমাণ রেখেছি আমার কাছে। সেই কথা কি বলবো সত্যমকে? না, না, সেটা এখনই বলা ঠিক হবে না। আর সত্যমকে নিয়ে বিশেষ ধরনের কাজ করা অসম্ভব বললেই হয়। ও যদি একবার বুঝতে পারে যে আমি ওকে নিয়ে বিশেষ কিছু ভাবছি, তাহলে সত্যমই চেষ্টা করবে আমাকে নিয়ে বিশেষ কিছু ভাবতে।

সত্যমের সঙ্গে কথা বলে দেখি ও কী ভাবছে অস্ত্রগুলো নিয়ে। উঠে দাঁড়িয়ে থেমে গেলাম। এখন আমি নিজে থেকেই যদি সত্যমের কাছে যাই, সত্যম আমার মনের ভেতরটা দেখে ফেলবে। বুঝে যাবে আমি দুর্বল। ভয় পাচ্ছি আমি। তাহলে? কী করবো এখন! বিষবৃক্ষ ঘরে বাড়বে, আর আমি সেটা বসে বসে দেখবো?

না। আমাকে ঘুমিয়ে থাকলে হবে না। সত্যম আমাকে ব্ল্যাকমেইল করে যাবে সারাক্ষণ! সাজিদ, তোমার কাজ বেড়ে যাচ্ছে!

শ্যামলকে সরাতে হবে। শ্যামল সবচেয়ে বড় প্রমাণের খবর রাখে। ও সত্যমের কাছে আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ যোগান দিচ্ছে। নিখিলের বাবাকে খেপিয়ে তুললে আমি ফাঁদে পড়ে যাব। সারারাত কাজে লাগাও সুভদ্র। বসে থেক না। ভাবো!

সুভদ্র, দেরি করো না। জল অনেক দূর গড়িয়ে যাওয়ার আগেই থামাতে হবে। এবারে বড় কাজ করতে হবে। তোমার মাথা খাটাও।

চোখের সামনে ভোরের আলো ফুটে উঠছে। চুপচাপ বিছানায় শুয়ে পড়লাম। সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হবে। কিছু কাজ আজ এগিয়ে রাখতে হবে। সত্যম লেট রাইজার। রুক্মিণীও। একটুখানি সময় চাই। মাত্র দুটো ফোন করতে হবে। আমার নিজস্ব গুপ্ত ঘরে ঢুকে পড়লাম। রবিকে চাই। রবি ছাড়া কেউ পারবে না এই কাজটা। সেভক রোডে যেতে হবে রবিকে। মাস্টার-কি আছে ওর কাছে। সেটা আজ দরকার। আর সাজিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেললাম। কাল ব্যস্ত থাকবো। পরশু কাজের বায়না দিয়ে রাখলাম।

রুক্মিণী আমাকে ঘুমন্ত ভেবে আলতো পায়ে নেমে গেল বিছানা থেকে। কোথায় যাচ্ছে ও? সত্যমের কাছে? হাফ মিনিট অপেক্ষা করে খাট থেকে নেমে পড়লাম। আস্তে বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে। রুক্মিণীর চিহ্ন নেই কোথাও। জানা কথা ও সত্যমের ঘরেই গেছে, কিন্তু কেন? শরীরী সখ্যতা? মন মানছে না কথাটা। সারারাত কি রুক্মিণী আমাকে জেগে থাকতে দেখেছে? সেই খবর দিতে গেছে সত্যমকে? নাকি আমার অজানা আরও কিছু আছে?

নিঃশব্দে এগিয়ে গেলাম। সত্যমের ঘরে কোনও শব্দ নেই। দরজায় কান পেতে কিচ্ছু শোনা গেল না। এই ঘরে ঢোকার গোপন দরজা আছে, যা আমার ঘরের সঙ্গে যুক্ত। আমি দ্রুত ফিরে এলাম নিজের বেডরুমে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। এবারে গুপ্ত দরজা

“তোমাকে দেখে খুশি হয়েছিল। সেই সুযোগটা কাজে লাগালে না? ওকে উত্তেজিত করা তোমার কাজ ছিল। লাস্ট চান্স কাল। কথা বের করো। এখন যাও। জেগে উঠে তোমাকে না দেখলে...! বিরক্তিতে বিড়বিড় করছে সত্যম। আমি দ্রুত বেরিয়ে এলাম গুপ্ত ঘর থেকে। বেডরুমের দরজা খুলে রেখে বিছানায় চলে গেলাম।”

খুলে পাশের ঘরের কাঠের দেওয়ালের একটা ছোট্ট টুকরো খুলে দেখলাম রুক্মিণী সত্যমের কাছে বসে আছে। কানে কানে কথা হচ্ছে। প্রেমের কূজন নয়। সিরিয়াস দুজনেই। কী বলছে ওরা?

সত্যম চুপ করে শুনছে। একসময় বিরক্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠল —তাহলে তোমাকে কী করতে এনেছি? একটা কথাও বের করতে পারনি ওই লোকটার থেকে আজ পর্যন্ত! তোমাকে দেখে খুশি হয়েছিল। সেই সুযোগটা কাজে লাগালে না? ওকে উত্তেজিত করা তোমার কাজ ছিল। লাস্ট চান্স কাল। কথা বের করো। এখন যাও। জেগে উঠে তোমাকে না দেখলে...! বিরক্তিতে বিড়বিড় করছে সত্যম।

আমি দ্রুত বেরিয়ে এলাম গুপ্ত ঘর থেকে। বেডরুমের দরজা খুলে রেখে বিছানায় চলে গেলাম। রুক্মিণী আসছে। ওর পোশাকের খসসস খসস পাচ্ছি শুনতে।

এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল —উমম, এই সেক্সি! বলতে বলতে আমার ঘাড়ে গলায় ওর ঠোঁট ছুঁইয়ে যাচ্ছিল। আমি সুযোগটা ছাড়লাম না। ওকে জাপটে ধরেছি —আজ খুব এনজয় করি চল। খুব এনজয়!

—ওয়াও, কোথাও যাবে?

—যেতেই পারি। চল নাইট ক্লাবে। স্ফূর্তি করে আসি। হোল নাইট! সত্যমও যাবে। নাহলে ও এখানে বোর ফিল করবে। ওর পার্টনার জুটিয়ে দেব।

আত্মহারা হয়ে গেল রুক্মিণী। চুমুতে ভরিয়ে দিল আমাকে। ভোর রাত জমে উঠল মধ্য রাতের মতো।

সত্যম খুশি হল। নাইট ক্লাবে যেতে ভাল বাসে সত্যম। এখানে এসে বোর ফিল করছিলই। আমি হালকা হওয়ার সুযোগ দিলাম। সত্যম ভাবছে রুক্মিণীর ফাঁদে পড়েছি। নাইট ক্লাবে গিয়ে উন্মাদনায় পেট খুলে বসব। বা আমার ইচ্ছেতে না বলতে পারছে না এমনও হতে পারে।

বিকেলের দিকে রেডি হলাম। এখান থেকে দূর বলে আগেই রওনা দিতে হবে। রুক্মিণী কালো পার্টি ওয়্যার পরেছে। উন্মুক্ত প্রায় বক্ষদেশ। দেখে উল্লাস প্রকাশ করে উঠল সত্যম।

আমি আর রুক্মিণী আমার গাড়িতে, সত্যম নিজের গাড়িতে, চললাম। ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে পৌঁছে গেলাম ক্লাবে। স্মোকি লাইটের মধ্যে কিছু নারী-পুরুষ অভিন্ন হয়ে নাচছে। সুরা ও সাকি অফুরান। আমরা গিয়ে ঢুকতেই ওয়েটার চলে এল। সত্যম ইশারা করে চোখ টিপল আমাকে। তারপর একটি সুন্দরীর বক্ষলগ্ন হয়ে গেল। রুক্মিণীকে ওয়াইন দিয়ে ওয়াশরুমে যাচ্ছি বলে আড়াল হলাম। রবি হাজির হয়ে গিয়েছে। সত্যমের গাড়ির নম্বরটা বলে রুক্মিণীর কাছে চলে এলাম। মদ আর মেয়ে মানুষের মাংসের মোচ্ছবে রাত দুটোর সময় রুক্মিণীকে বাড়ি ফেরার কথা বললাম। অনেক রাত হয়েছে। এবারে ফিরি চল। রুক্মিণী নেচে কুঁদে হাঁপিয়ে পড়েছিল। একটি সিকিমিজ যুবকের সঙ্গে সারা সময় কাটিয়েছে ও। নেশায় জম জম করছিল। সত্যমের একই দশা। যাহোক ফিরে যাব বলে যে যার গাড়িতে উঠেছি। সত্যমকে বলেছি —তুমি কি পারবে ড্রাইভ করতে? নেশা হয়ে গেছে মনে হচ্ছে! গাড়ি রেখে যাও। কাল এসে নিয়ে যেও। আমার গাড়িতে চল।

পরিকল্পনা মতো ছিটকে উঠেছে সত্যম। জানতাম। আঁতে ঘা লেগেছে —না না। আমার এসব বাঁয়ে হাথকা খেল। বলে গাড়ি স্টার্ট দিল। ও বেরিয়ে গেল। আমার গাড়ির চাবিটা পাচ্ছিলাম না বলে মিনিট পনেরো দেরি হল। স্টার্ট দিচ্ছি, বিকট শব্দে রাত ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

৩০

শব্দ কতখানি বিরাট হতে পারে, সেই মুহূর্ত ছাড়া বোঝা অসম্ভব ছিল। এক পলকের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল প্রাণের উল্লাস। যারা তখনও কানে শুনতে পাওয়ার অবস্থায় ছিল, তারা নড়েচড়ে কোনও ক্রমে বেরিয়ে এল। কী হয়েছে এটা প্রশ্নচিহ্ন হয়ে ঝুলছে মানুষের চোখে। শব্দ

লক্ষ্য করে কেউ কেউ এগিয়ে গেল। আমিও গাড়ি নিয়ে এগিয়ে গেলাম। বেসামাল রুক্মিণী জানতে চাইল আমরা কোথায় যাচ্ছি। বেশ খানিকটা গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। এই রাতেও লোক জড়ো হয়েছে। অ্যাকসিডেন্ট শব্দটা কানে এল। কার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে?

সামনে এগিয়ে গেলাম। সত্যমের গাড়ি উলটে আছে। ভেতরে সত্যম আছে কি? বেঁচে আছে? উলটো দিক থেকে আসা একটি ট্রাক গাড়িটাকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তার একধারে ফেলে দিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী একটি স্থানীয় লোক জানাল ট্রাকটির ব্রেক ফেল করে থাকতে পারে। পুলিশকে ফোন করা হল। জানি না সত্যম বেঁচে আছে কিনা। পুলিশ এসে গাড়ি ক্রেনে তুলে নেওয়ার আগে গাড়ির ভেতরে খুঁজে দেখল। সত্যমকে বের করা হচ্ছে। রুক্মিণী এখন সম্পূর্ণ সজাগ। সত্যমের রক্তাক্ত চেহারা দেখে ভয়, বিস্ময়ে গোঙাতে শুরু করেছে।

এই রাত ততক্ষণে ভোরের দিকে যাচ্ছে। সত্যম এখন একটা বডি ছাড়া আর কিছু নয়। ক্লাব থেকে বেরিয়ে সোজা যাচ্ছিল। গাড়ির স্পিড খুব বেশি ছিল। কন্ট্রোল হারিয়ে ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। প্রচণ্ড নেশাগ্রস্ত ছিল সত্যম। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিল না। একটু খোঁচা দিতে হয়েছিল ওর পৌরুষে। রবি ট্রাকটাকে ঠিক সময়ে হাজির করেছিল। আর একটা কাজ করেছিল রবি। সত্যম যখন ক্লাবে মদ খেয়ে সাকীর সঙ্গে মত্ত, রবি তখন সত্যমের গাড়ির ব্রেক নষ্ট করে দিয়েছে! খুব পুরনো ধাঁচের ক্রাইম। কিন্তু এখনও চলে বেশ।

ঝামেলা হল কম নয়। রুক্মিণীর বাবা, সুতরাং রুক্মিণীকে অনেক ঝুট ঝামেলা পোহাতে হল। বডি পোস্টমর্টেম হবে। ভিসেরা টেস্ট হতে পারে। মদ খেয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল কিনা। এর আর কিনা কী? নাইট ক্লাব থেকে বের হয়েছে, সে কি লেবু জল খেয়ে? যাক, শিলিগুড়ির এক খ্যাত নার্সিং হোমে নিয়ে গেলাম সত্যমকে। লাভ হবে জানতাম। ডাক্তার ওকে মৃত ঘোষণা করল। রুক্মিণী কেমন বিহ্বল চোখে চারপাশে তাকাচ্ছে। নিজের ভবিষ্যত নিয়েই ভাবছে আর কি! ও সত্যমের বাঁধা রক্ষিতা। সত্যম ওকে প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতো। বিজনেসটাই যে এরকম ওর।

হইচই, হাঁকডাক চলছে। এরই মধ্যে সাজিদের লোককে ফোন করে দিলাম। হিসেব বড্ড সোজা। এই খবরটা দ্রুত পেয়ে যাবে শ্যামল। ও সকালেই সত্যমের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে না পেয়ে প্রথমেই রুক্মিণীকে ফোন করবে। রুক্মিণী স্বাভাবিকভাবেই খবর পৌঁছে দেবে শ্যামলকে। শ্যামল বুঝে যাবে সত্যমের মৃত্যু সহজ পথে আসেনি। শ্যামল অনেকদিন ধরে আছে আমার কাছে। ও আমাকে খানিকটা চিনেছে। লতার অন্তর্ধান রহস্য একমাত্র শ্যামলই জানে। নিখিলের ব্যাপারটা ও জানতো। অন্তত নিখিলকে নিয়ে আমি কী ভাবছি, সেটা জানতো। সত্যমের অঙ্কটা কষে ফেলবে শ্যামল। পরবর্তী স্টেপ হল, খবর শুনেই ও নিখিলের বাড়িতে যাবে। আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র বলতে নিখিল। নিখিলের বাপ-মা, গ্রামের লোকদের খেপিয়ে তুললে আমাকে প্রশাসনের মুখোমুখি হতে হবে। আর কে জানে না যে কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরিয়ে আসতে পারে?

তাহলে, সবটা মিলিয়ে কী দাঁড়াল? শ্যামল! শ্যামল এখন নিখিলের গ্রামে যাবে। সাজিদের চপার না, এবারে ব্যবস্থা অন্য রকম। যে রাস্তায় শ্যামল যাবে, সেখানে একটা ট্রাক থাকতে পারে। রাস্তাটা নির্জন। শ্যামলকে পিষে ফেলতে কতক্ষণ লাগবে? সেজেগুজে দাঁড়িয়ে আছে সাজিদের লোক। যাও শ্যামল। আস্তে আস্তে যাও। বাই। এখন রইল নিখিলের বাপটা।

❝ শিলিগুড়ির এক খ্যাত নার্সিং হোমে নিয়ে গেলাম সত্যমকে। লাভ হবে জানতাম। ডাক্তার ওকে মৃত ঘোষণা করল। রুক্মিণী কেমন বিহ্বল চোখে চারপাশে তাকাচ্ছে। নিজের ভবিষ্যত নিয়েই ভাবছে আর কি! ও সত্যমের বাঁধা রক্ষিতা। সত্যম ওকে প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতো। বিজনেসটাই যে এরকম ওর। ❞

তাকেও আজই নিকেশ করতে হবে। আজ হাটবার। হাটে যাওয়ার সময় একজন বাইক নিয়ে মোড়ের মাথার শাল গাছের নীচে অপেক্ষা করবে। ঠিকানা নিয়ে, ছবি দেখে নিখিলের বাপের সঙ্গে কালই আলাপ করে এসেছে। এক বস্তা মিনিকিট চাল নিয়ে দিয়ে এসেছে সে। দেবে না কেন? সে না নিখিলের বন্ধু? নিখিল বলে দিয়েছে বাড়িতে মিনিকিট চাল পৌঁছে দিতে। আর হাজার টাকা। নিখিলকে বাইরে যেতে হচ্ছে। সে এখন আসতে পারবে না। তাই বন্ধুকে বলেছে সাহায্য করতে। সাজিদের বন্ধু ছেলের মতো আপ্যায়ন পেয়েছে। আজ নিখিলের বাপ ওকে খেতে বলেছে। মাগুর খেতে চেয়েছে নিখিলের বন্ধু। মাগুর আনতে যাবে নিখিলের বাপ। হাটে। বাইক নিয়ে অপেক্ষা করবে ছেলের বন্ধু মোড়ের মাথায়। বাইকে চাপিয়ে নিখিলের বাপকে হাটে নিয়ে যাবে । হাট! সে হাট থেকে কেউ ফেরে না। বাইক নিয়ে কে এসেছিল, কেন এসেছিল, কোথা থেকে এসেছিল কেউ জানে না। এর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই! নিখিল কোথায় গেছে, তার বোন কোথায় গিয়েছে আমি কী জানি তার? নিখিলের মা দু'দিন কাঁদবে। খোঁজ করবে। দু'দিন পরে আমার কাছে গিয়ে দরবার করবে। নিখিল আমার সঙ্গে দেখা করে না। ও আমার চাকরি ছেড়ে অন্য চাকরিতে জয়েন করেছে। ইচ্ছে করলে নিখিলের মা আমার বাড়িতে ঘরের কাজ করতে পারে। কাজের লোক একটা দরকার আমার।

সত্যমের অন্ত্যেষ্টি করে দিল্লিতে চলে গিয়েছে রুক্মিণী। আমি জানি সত্যমের সম্পত্তি গ্রাসের ভাবনায় দিল্লিতে গেল রুক্মিণী। যাক। মাঝে মাঝে লোভী মানুষ খুবই কাজে লাগে। সম্পত্তি নিয়ে খুশি থাকলে সত্যমের মৃত্যুটা রুক্মিণীর কাছে আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। ও এখন মুক্ত! কোনও ঝামেলায় যাবেই না রুক্মিণী।

তাহলে? উফ, একসঙ্গে অনেক ঝামেলা পার করে ফেলবো দু'দিনে। শান্তি! ওম শান্তি! এবারে ছক কষা কাজগুলো শেষ করে কয়েকদিন রেস্ট। আমি দুটো দিন পরে আলিপুরদুয়ারে ফিরব। এত রক্তের গন্ধ সহ্য করা বিশ্রি কাজ বলেই মনে হয়। ধ্যাস! ভাল লাগে না। আমি হলাম অন্য ধাঁচের মানুষ। কতদিন কবিতা লিখিনি! কতদিন ভাল করে নদীর দিকে তাকাইনি। এখন কোনও নদী দেখলে মনে হয় এর গভীরতা কতটা? একটা মানুষকে ডুবিয়ে দেওয়া যাবে? ভাবা যায়! অথচ নদী দেখলে আগে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। একটা নদীর ওপরেই প্রথম আমার তুতো বোন তৃণাকে শরীরের স্বাদ দিয়েছিলাম। মাঝে মাঝে সেই উন্মাদনা মনে পড়ে। তৃণা! ভালবাসায় ডুবে মরেই গেল! ধ্যাত তেরিকা! মৃত্যু হল ভারি পবিত্র, ভারি সুন্দর! তাকে কেন বিশ্রি করে দেখাল তৃণা! হায়, ইয়ে মায়া! হা হা হা!

গয়েরকাটার বাড়িতে এসে আছি এখন। ক্লাস নিচ্ছি। পড়াশোনার মধ্যে ডুবে আছি। বাইরে ঝমর ঝমর বৃষ্টি পড়ছে। শোভনবাবুর সঙ্গে দেখা করে এসেছি। না, কেউ আর আসেনি। তবে ব্যাপারটা ভীতির সৃষ্টি করেছে পাড়ার লোকেদের মধ্যে। একেই এই গলিটা অসম্ভব নির্জন। কে এসে এখানে একটা বাড়িতে ঢুকে আরামে কাটিয়ে গেল, কেউ সন্দেহ করতেই পারেনি! এই বিষয়টা আমাকেও যথেষ্ট ভাবিয়েছে। সেই মেয়েটা আমার জীবনে আছে। আমি নিশ্চিন্ত হচ্ছিলাম কী করে? আমি নিজেই খুঁজে বের করব সেই মেয়েকে। মেয়েটা আমার জীবনের শেষ শত্রু। ও অনেক কিছু জানে বলেই আমার ধারণা।

সত্যমের অ্যাকসিডেন্টের খবরটা শোভনবাবুদের দিলাম। এ নিয়ে নানারকম অ্যাকসিডেন্টের আলোচনা হল। কথাবার্তা বলে ফিরে এসেছি বাড়িতে। আজ কবিতা পড়ব। বিমল ভট্টাচার্যের কবিতা —সাত সিঁড়ি ভেঙে শিলাসনে মুহূর্ত বিশ্রাম / হাই তোলা / আড়ভাঙা / বালুর আস্তর সেঁচে বক্সাদুয়ার / এসে গেল বন্দীনিবাস / কুয়াশা ধূমল মাঠে গিরি শিরা / অরণ্য পরিখা / থেকে থেকে গেয়ে যায়...

(ক্রমশ)

স্কেচ: দেবরাজ কর

সেই রেললাইন ধরেই হারিয়ে যেতে চেয়েছিলাম

মেয়ে বেলার ডুয়ার্স

"তখন আকাশ জুড়ে তারাদের ফুল
আহা সে হৃদয় জুড়ে বকুল বকুল"

সে মেয়েবেলার দিকে এতগুলো বছরের পরে ফিরে তাকালে এমনই একটা ছবি একেবারে চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাই! হ্যাঁ বকুলগন্ধের মায়া জড়ানো সে বাল্যকাল রূপকথার মতোই মনে হয়; যেন সত্যি নয় কল্পলোকের গল্প বুঝি! কী এমন ছিল আমার সে জন্মগ্রামে, সে যৌথ পরিবার, বন্ধু-স্বজন সে পরিবেশের মধ্যে? যা এমন করে টানে পেছন পানে? কী ছিল মাথার ওপর বিস্তারিত মায়াবী নীলে, অজস্র তারকাখচিত রাতের আকাশে? মাঠের পর মাঠ ফসলের খেতের ওপর বাতাসের ঢেউ আর সকাল থেকে সন্ধে পালটে পালটে যাওয়া রোদ্দুরের রঙে? কী ছিল যে! একেবারে মাটির কাছাকাছি থেকে বড় হতে হতে মাটির, ধানের, আমের মুকুলের, শিউলির, কুয়াশার, পাট পচানো জলের, কাঁচা গুয়া-র, বৃষ্টির গন্ধ সব ভিন্নতা বুঝি চিনে নিচ্ছিল ঘ্রাণেন্দ্রিয়! রকমারি সবুজ, রোদ্দুরের নানা রং বুঝি কী এক মনোজগৎ নির্মাণ করছিল একান্তে!

গ্রীষ্মের ঘুঘু ডাকা দুপুর লাল সিমেন্টের মেঝেতে পাটি পেতে শোওয়া সারি সারি আত্মজন, কারো হাতে হাতপাখা। ছোটোরাও স্কুল থেকে ফিরে সেখানেই। বড়রা তাদের ফেলে আসা দেশের বাড়ি নিয়ে আলাপ করেন কোন সে কুমিল্লার ভাষায়। সে ভাষা আর গল্পের পথ বেয়ে মনে মনে পৌঁছে যাই ওপার বাংলার অদেখা বেলঘর নামের গ্রামে। কল্পনার চোখে দেখি অদেখা বাড়িঘর গাছপালা নদী স্বজন প্রতিবেশী জলেডোবা বর্ষার পথঘাট, নৌকো, বিরাট এক উঠোন দুর্গাপুজো, শুনি ঢাকের আওয়াজ। সব ছবির মতো সাজানো মনের ভাঁজে শুধু শুনে শুনেই।

স্কুল থেকে ফিরে খেয়েদেয়ে ওই মেঝেতে ঘুমের ভান করে চোখ পিটপিট আর অপেক্ষা কখন তাদের হাতপাখা শিথিল হয় আর আমরা ঘর বারান্দা উঠোন পেরিয়ে এক্কেবারে বাইরে পেছনের চাষের জমিতে। ঘুরে ঘুরে বেড়াই মাঠেঘাটে বাড়ির সীমানা, শেষের গাছে চড়ে বসে থাকি। ভেরেন্ডা গাছের পাতা ভেঙে জমাই আর তার ডাঁটি ভেঙে বাবল ওড়াই। স্বরচিত কথায় ও সুরে তাইরে নাইরে না গাই। চষা জমি থেকে মাটির ঢেলা কুড়িয়ে দু'-দলে বিভক্ত হয়ে রাম-রাবণের যুদ্ধ যুদ্ধ খেলি। ধুলি ধূসরিত আপাদমস্তকে সে যুদ্ধ কখনও কান্নাকাটি অবধি গড়ায়। বাড়ি ফেরা, নালিশ-বালিশ আর একপ্রস্থ ঘরের শাসন। বিকেল গড়াতে আবার মাঠে; প্লেটবল, 'উপেন টি বাস্কপ' সুর করে গেয়ে গেয়ে, আবার লুকোচুরি চলতেই থাকে। ঝমঝম শব্দে ট্রেন যায় আর কেন কে জানে নিত্যই নেচে গেয়ে, উঠবস করে আর নানা ধরনের কসরত দেখাই ট্রেনযাত্রীদের! আদৌ কেউ দেখতো কি? আবার সেই ট্রেন লাইনের ধারেই অম্বুবাচীর সময় ছোট কলাগাছ পুঁতে, টগর বা করবীফুলে সাজিয়ে, রেললাইনের পাথর দিয়ে আলাদা আলাদা খোপে বস্তা বিছিয়ে বসি কচিকাঁচার দল। ঘনঘন বাড়ির দিকে তাকাই, মা দেখলে ঘোর সর্বনাশ। সোমবার আর বৃহস্পতিবারে রেললাইনের পাশের পায়ে হাঁটা পথ ধরে সবজি, ডিম, দই, হাঁস-মুরগি, গরু-বাছুর, ছাগল নানা কিছু কেনা-বেচার জন্যে লোকেরা রাজারহাটে যায়, আমরা হামলে পড়ি হাটযাত্রীর ওপর, দাও দাও করে। তিনি পাঁচ-দশ পয়সা বা লটকা ফল বা অন্যকিছু দিয়ে যান। কী জানি কে শিখিয়েছিল এমনধারা কাণ্ড। বাড়ির লোক টের পায়নি কখনও পেলে কী ছিল কপালে!

পাগলা দেউনিয়ার বাড়ির হাতি মাঝে মধ্যে স্কুল, পোস্ট অফিসের সামনের রাস্তা ধরে এসে রেলের মাঠ আড়াআড়ি পাড় হয়ে স্টেশনের পাশ দিয়ে কোথায় যেন যেত। আমরা নিরাপদ দূরত্ব থেকে সুর করে গাইতাম 'হাতি তোর পায়ের তলায় কুলের বিচি'। একদিন মাহুত ভাই হাতি নিয়ে বাড়ির সামনে হাজির। বাবা পয়সা দিলেন তাকে, মনের ভয় জয় করে ক'জন করে হাতির পিঠে চেপে খানিক দূর অবধি ঘুরে এলাম আমরা! ওই বিশাল শরীর কুতকুতে চোখ কেমন দুলকিচালে ঘুরিয়ে এনে বাড়ির সামনে বসে পড়ে নামিয়ে দিল? ঠাকুমা এক ধামা চাল দিলেন সামনে, ওমা মুহূর্তে সোঁওও করে শুঁড়ে টেনে খেয়ে নিল! ক'দিন বাদে স্কুলের পথে আবার দেখা, জলপাইতলায় দাঁড়িয়ে আমি একাই। মাহুত ভাই চিনলো ডেকে বলে, 'অগে মাই ইস্কুল যাছেন? হাতিত উঠিবেন তো আইসো।' এক কথায় রাজি, স্কুলের কথা মনে রইল না। বইঠ বলতেই সে ঐরাবত পথের ধারে বসে পড়ে, আমিও মহা উত্তেজিত হাতির পিঠে চড়ে বেড়াতে যাই। সেদিনের ওইটুকু যাত্রায় মন ভরেনি; পরিণতির কথা মনে আসে না। বেশ খানিক ঘুরিয়ে হাতিওয়ালা বাড়ির সামনে নিয়ে এলে হুঁশ ফেরে। নামিয়ে দিয়ে মাহুত ভাই বলে, 'যা মাই চাইল আর পাইসা ধরি আয়'। এবারে কান্না পায়, কোথায় পাবো পয়সা? মায়ের ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকি। সে যাত্রায় ঠাকুমা বাঁচালেন, চাল আর দুটো টাকা দিয়ে মাহুত ভাইকে বেশ ধমকেও দিলেন, একা ছোট মেয়েকে হাতিতে চড়িয়েছে বলে।

বিরাট এক ভালুক নিয়ে ভালুকওয়ালা আসতো গ্রামে ডুগডুগি বাজিয়ে, সে ভালুকের মাঝেমাঝেই আবার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসতো; পেছন পেছন ঘুরে বেড়াই তাদের। ঝুড়িতে সাপ নিয়ে সাপুড়ে আসতো খেলা দেখাতে, জমির আলে বাড়িতে পথে-ঘাটে দাঁড়াশ, গোখরো, ঘেন্টি, লাউডগা সাপ দেখেছি বিস্তর। আর সবচেয়ে কাঙ্খিত জন ছিল বুঝি বাক্স বোঝাই লাল, সাদা বরফ নিয়ে আগত বরফওয়ালা। কত সামান্য আয়োজনে বুঁদ হয়ে থাকতাম সে গাঁয়ে ভাবলে আশ্চর্য লাগে! যা কিছুর অনুষঙ্গে বড় হয়ে উঠছি সবই বিস্ময় মিশ্রিত অপরূপ আনন্দের আর বিশ্বাসের! ১৫ই আগস্ট, ২৬ শে জানুয়ারি, ২৩ শে জানুয়ারি

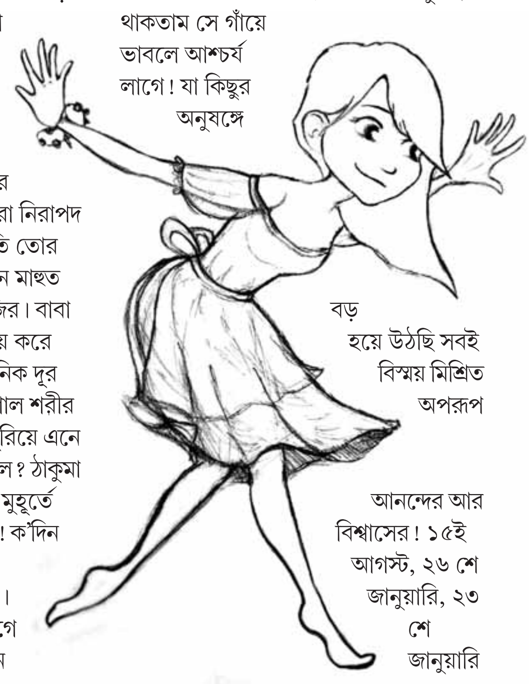

বাড়ির সামনে পতাকা তুলতেন বাবা, তাঁর সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমরাও চিৎকার করতাম, বন্দে এ মাতরম। অন্যতর বোধের জন্ম হ'ত। আমাদের আসাম প্যাটারনের টিন, কাঠ আর লাল সিমেন্টের মেঝের সে বাড়ির প্রবেশমুখে নুড়ি বিছানো একটু পথ, দু'পাশে মায়ের সযত্নে রচিত বাগান। বাড়ির ডানধারের ঘরগুলো সেন্ট্রাল এক্সাইস অফিস ভাড়া। বারান্দার ধার ঘেঁষে দু'পাশে দুটো ঝাউ, লাল সিমেন্ট বাঁধানো দুটো বেঞ্চ মাঝে ডানহাতের বাগানের পুবকোণে স্বাস্থ্যবান এক লিচুগাছ, যার তলে পিকনিক হল এ বাড়িতে ছোটমার প্রথম আগমনে, তাঁরই উদ্যোগে। কলকাতার ঘটিবাড়ির মেয়ে, ছোটকাকার ইউনিভার্সিটির ক্লাসমেট, তো সেখানেই প্রেম তারপর বিয়ে। পড়াতেন সিটি কলেজে, অপূর্ব গাইতেন তিনি। বারান্দায় বসে গাইলেন, শাওন গগনে ঘোর ঘনঘটা সহ ভানুসিংহের পদাবলী থেকে আরও কিছু গান, সে উদাত্ত সুর মাঠ পেরিয়ে, দূরের বাঁশবন পেরিয়ে কোথায় যেন ভেসে গেল! তখন অবশ্য কলেজে, হোস্টেলে থাকি বাংলা অনার্সের ছাত্রী, আমায় পড়িয়ে দিলেন পাঠ্য কল্পনা কাব্যগ্রন্থের কিছু কবিতা, বৈষ্ণব পদাবলীর খানিক অংশ। কী অপূর্ব পড়াতেন। মনে মনে বড় হলাম যেন এতদিনে! সে ছোটমাও বহুদিন হল চলে গেছেন তারাদের দেশে।

ফিরি সে ছোটবেলায় আবার; ভেতরের উঠোনে একধারে তুলসীতলায় পাশাপাশি শিউলিগাছ আর এক আমগাছ দাঁড়িয়ে। ধান মাড়াই চলত উঠোনে, কলাপাতায় নারায়ণ পুজোর সিন্নি খেত গ্রামের মানুষ হ্যাজাকের আলোয় এই উঠোনে, ব্যাস্ত-সমস্ত হয়ে পরিবেশন করেছি মহানন্দে। তুলসীতলার পাশের মাটির উনুনে সন্ধেরাতে পায়েস রান্না হত, নারকেল নাড়ু, মুড়ির মোয়া, মুড়কি কী সুন্দর সব গন্ধ, কাঠের উনুনের কমলা নীল আভা খুব ঘুম পেলেও বিছানায় যেতে ইচ্ছে করত না মোটে। তো সেই সেন্ট্রাল এক্সাইস অফিসে আগত লোকেরা সাইকেল রেখে ভেতরে গেলেই তক্কেতক্কে থাকা আমরা সে সাইকেল নিয়ে রাস্তায় হাফপ্যাডেল থেকে ফুল প্যাডেল, লোকেদের গাল খেয়েই। বিকেলে বাবার সাইকেল নিয়ে সামনের রাস্তা ধরে শনশন বাতাসে ভর করে যেন উড়ে যাওয়া। আর কী লজ্জার কথা কাদের ফেলে যাওয়া বিড়ির টুকরো কুড়িয়ে দু' আঙুলের মাঝে চেপে মাঝেমাঝে টানমারা, আবার পরস্পরকে ভয় দেখানো বাড়িতে বলে দেব কিন্তু! হায়!

রেল স্টেশনে মাঝেমাঝেই দাঁড়িয়ে থাকতো মাল গাড়ি, সে চত্বরেও খেলে বেড়াতাম দল বেঁধে। স্টেশনের জানালার কাচে গাল ঠেকিয়ে ওই ভেতরের টরেটক্কার চমৎকার বুঝতে চাইতাম। স্টেশন মাস্টার অনিলকাকু কখনও ডেকে নিতেন ভেতরে, 'দেখবি আয় সব, চুপ করে দাঁড়া এখানে'। হাইস্কুলের একেবারে প্রথম পর্ব, অংক শেখাতেন তিনি;তাঁদের বাড়ির বিশেষ মান্যতা ছিল গ্রামে। খুব উঁচু ভিটের মাটির পরিচ্ছন্ন সে গোস্বামী বাড়িতে ওনার বাবা পুঁথি লিখতেন, বাঁকা বাঁকা চমৎকার অক্ষরে কালো কালিতে কলম ডুবিয়ে। সে কালি নিজে বানানো, খাতা নিজে সেলাই করা। এখন ভাবি কোথায় সেসব খাতা? কী লিখতেন তিনি?

মায়ের কঠোর শাসন এড়িয়ে কত কাণ্ডই করেছি। বাড়ির সামনের তখনও কাঁচা রাস্তা দিয়ে গরু বা মোষেব গাড়ি গেলেই তার একেবারে শেষ অংশের চওড়া বাঁশটি ধরে দোল খেতাম আর সে গাড়োয়ান হাতের পেন্টি (লাঠি) উঁচিয়ে এই মারে তো সেই মারে। তার গাড়ি পেছন দিকে

উলটে যাওয়ার যোগার! আবার বর্ষার কাদামাটির রাস্তায় ট্রাক চলে গেলে চাকার দাগে নির্মিত মাটি খণ্ড এনে মিষ্টির দোকানের সন্দেশ সাজিয়ে মিছিমিছি বিক্রি করি। ওবাড়িতে নতুন বাচ্চা হয়েছে শুনে ছুটে গিয়ে কাঠের বেড়ার ফাঁকে চুপিসাড়ে চোখ পাতি, অমন ধোঁয়া ভরা ঘরে কাপড় জড়ানো এত্তটুকু লালরঙ্গা মানব শিশু আর তার মিউ মিউ কান্না শুনে ভয়ে আঁতকে উঠে প্রাণপণে বাড়ির দিকে ছুট লাগাই। পইপই করে মা বারণ করেছিল ওবাড়ি যেতে।

আমাদের কালি গাই বাচ্চা দিল সামনের মাঠেই, তুলসিতলার পাশের উনুনে টিন ভর্তি গরম জল ফোটে। দাদু, মাগুনি ভাই ব্যস্ত হয়ে থাকে, তার গলকম্বলে হাত বুলিয়ে ঠাকুমা ঠাকুরকে ডাকেন, ভীষণ উদ্বিগ্ন আমরাও জটলা পাকিয়ে দাঁড়াই সেখানে আর বলি, হে ঠাকুর রক্ষা করো। প্রথমে দুটো পা, ক্রমে মাথা কপালে সাদা টিপ ফুটফুটে বাছুরটি টুপুস করে মাটিতে পড়ে আমরা আনন্দে নাচি। কালি গাই ব্যাগ্র হয়ে তার শিশুর গা চাটে, প্রথমে একটু টলমল করে খানিক বাদে সে দাঁড়িয়ে যায় মায়ের গা ঘেঁষে। প্রকৃতির সহজপাঠ সানন্দে গ্রহণ করা এভাবেই।

সন্ধে নেমে আসে ধীরে, গাছপালার ঘন ছায়ার আড়ালে অল্পসংখ্যক বাড়িঘরগুলো যেন লুকিয়ে পড়ে। শাঁখ বাজে এবাড়ি-ওবাড়ি। সে সবুজ মাঠে শুয়ে-বসে আমরা আকাশের তারাদের ফুটে ওঠা দেখি। সাতটি তারা না দেখলে ঘরে ফেরার নিয়ম নেই! গরুগুলো গোয়ালে ঢুকিয়ে কোমরে হাত রেখে অন্য হাতের লাঠি নাচিয়ে ওড়িয়া টানে মাগুনি ভাই আমাদের তিন ভাইবোনকে ডাকে, 'চন্দন, লিটন, তাপস ঘরে আস্যো বলতেসি, আন্ধার হই গেলা।' তাকে মোটে গ্রাহ্য না করে আমরা সুরে সুরে বলি 'আমি দুইটা তারা দেখেছি ওই যে, আমি তিনটা তারা দেখলাম।' সন্ধ্যার আকাশে কত রং, রহস্যময় নেশা ধরানো! মাইকে কোথায় বাজতো রূপবানের গান; ভাওয়াইয়ার সুর ভেসে আসতো হাওয়ায় হাওয়ায়, উৎসুক শুনতাম। ঢোলক বাজতো রেললাইনের ধারের মুচিটোলায়।

বাড়ি ফিরে হাতমুখ ধুয়ে বারান্দায় পাটি বিছিয়ে লণ্ঠনটি ঘিরে বই খুলে বসি, স্লেটে কাটাকুটি খেলি তিন ভাইবোন। দাদুর হোমিওপ্যাথি ওষুধের আলমারি থেকে মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া বা ছোট সাদাগুলির শিশি ফাঁকা হয়ে যায় আমাদের দৌরাত্মে! মা-ঠাকুমা, মেজঠাকুমা সব রান্নাঘরে। সামনের মাঠে কাকু মেজদাদুরা মায়ের বিয়েতে পাওয়া রেডিও ঘিরে বসে, গল্প করে গান শোনে। স্বপ্নের ছবি আঁকেন হেমন্ত 'দূর নীলিমায় ওঠে চাঁদ বাঁকা, শুধু এই পথ চেয়ে থাকা ভালো কি লাগে', সত্যি সত্যি হেলাপাকড়ি মোড়ের বিশাল সে আমগাছের ওপাশ থেকে উঠে আসতো বিরাট অতি উজ্জ্বল এক চাঁদ! আর জ্যোৎস্নাধোয়া মাঠ

কোণাকুনি পেরিয়ে সাদা জামার শান্তিকাকু পড়াতে আসতেন কিন্তু আমার মন পড়ে থাকতো সে গানের কথায়-সুরে।

রাত গভীর না হতেই গ্রামটি কেমন স্তব্ধ! খালি ঝিঁঝিঁর ডাক, অজস্র জোনাকির চলে বেড়ানো, গড়িয়ে নামা আকাশের অদ্ভুত আলোয় অপরিচিত কোন জগতের বার্তা! ভেতরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে অদূরের স্কুলবাড়িটা রাতের আঁধারে কেমন অচেনা, পাকারাস্তার ওধারে মরা নদীর সোঁতার পাশে শ্মশান, পারতপক্ষে সেদিকে চাইতাম না।

কত যে দৌরাত্ম সহ্য করেছে আমাদের স্কুলমাঠের সে বিশাল বটগাছটি। তার ডাল নানা কসরতে টেনে নামিয়ে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে দোল খাওয়ার সে মজা। গাছতলেই ছুটির আগে নামতা পড়া। সে গাছের কোটর থেকে পাখির ছানা এনে দিল জয়দেব, পুষবো বলে বাড়ি আনতে আনতেই সে গেল মরে আর মায়ের পিটুনি। পাকারাস্তা পেরিয়ে ভর দুপুরে কুলবনে পরিক্রমা, ধূলিধূসরিত হয়ে বিকেলে বাড়ি ফিরে পিট্টি খাওয়া। স্কুলের সরস্বতী পুজোর মন্ডপ মাটিলেপা, কাগজের শেকল বানিয়ে সাজিয়ে কী সে আনন্দ। আর কলার ডোঙায় গরম গরম পুজোর খিচুড়ি খেতেই হবে যেন। যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি তখনও মাঠে লাইন দিয়ে বসে খিচুড়ি খেয়ে এসেছি, সে যেন জন্মসিদ্ধ অধিকার! এমনই ছিল সে গাঁয়ের মানুষের আত্মীয়তার ওম! সত্যি অবাধ স্বাধীনতায় বড় হয়ে উঠেছি সে গাঁয়ে। লালিত হয়েছি প্রকৃতির আঁচলের ছায়ায়, পরিবার, পরিজন, প্রতিবেশীদের প্রশ্রয়ে। মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলে দাদা-ভাইয়ের সঙ্গে খুব কিছু অন্তর তেমন বুঝিনি বাবা বা দাদুর থেকে। ঠাকুমা মাঝে মধ্যে বলতেন 'এই মাইয়ার বিয়া হইব ক্যামনে, একে কালা রং তায় উইড়া বেড়ায় সারাদিন, হায় হায় রে।' মনে মনে বেশ নিশ্চিন্ত যাক আমার বিয়ে হবে না, তবে কালো বলায় খুব রাগ হয়েছিল ঠাকুমার ওপর।

জোরপাকড়ির লাইব্রেরি থেকে একজন কাপড়ের ঝোলায় দুটো করে বই নিয়ে সাইকেলে চেপে আসতেন প্রতি সপ্তাহে। চা, পান খেয়ে গল্প করে চলে যেতেন। ময়নাগুড়ির রাধিকা লাইব্রেরি থেকে মা নিজে গিয়ে বই আনতেন। আশাপূর্ণা, শরদিন্দু, বুদ্ধদেব বসু, সমরেশ বসু, গজেন্দ্র কুমার মিত্র আর ভ্রমণের বইও আসতো; সুযোগ মতো চোখ বোলাতাম মায়ের নজর এড়িয়ে, এভাবেই রম্যাণী বীক্ষ্য, তারাশংকরও অল্প, খানিক বুঝে বেশিটাই না-বুঝে। আসতো দেশ, নবকল্লোল, উল্টরথ আর একদিনের বাসি আনন্দবাজার। আমরা হাতে পেয়েছি শুকতারা গোয়েন্দা দীপক-রতন, টারজান, সোভিয়েত রাশিয়ার অতি চমৎকার ছোটদের সব বই। আর নেশা ছিল অরণ্যদেব, যাদুকর ম্যানড্রেক, ডায়না পামার। বাড়ির বারান্দায় রবীন্দ্রজয়ন্তী কাপড় টাঙিয়ে; কবিতা, নাচ, গান, নাটক। অনেক পরে শ্যামা নৃত্যনাট্য করেছিলাম আমরা সে এমএ-র রেজাল্ট বেরেনোর আগে। খুব প্রশংসা হয়েছিল তার।

আমাদের বাড়ি থেকে বাঁ-হাতের মেটে রাস্তা ধরে পুবদিকে এগোলেই প্রাইমারি স্কুল। পথ অল্প, কিন্তু পা টেনে ধরে পাশের ডাক্তার দাদুর বাড়ির কাঁচামিঠে আম, টুকটুকে ডালিম, ঝাপড়া কুলগাছ। বসাক বাড়ির জলপাইগাছ, পুলিন দাদুর বাড়ির জামগাছ যে ঋতুতে যেমন। পথের ধারে সাদা ফুটফুটে টগর, ভাঁটফুলের ঝোপ ঢেঁকিশাকের বন তাদের গায়ের কেমন এক মনমাতানো গন্ধ! প্রজাপতিদের ওড়াউড়ি, অজস্র পাখির ডাক কত সব নাম না জানা জংলি লতা।

ঘনঘোর বর্ষায় দৈত্যের মতো গর্জনরত

> "সত্যি অবাধ স্বাধীনতায় বড় হয়ে উঠেছি সে গাঁয়ে। লালিত হয়েছি প্রকৃতির আঁচলের ছায়ায়, পরিবার, পরিজন, প্রতিবেশীদের প্রশ্রয়ে। মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলে দাদা-ভাইয়ের সঙ্গে খুব কিছু অন্তর তেমন বুঝিনি বাবা বা দাদুর থেকে।"

কালো কালো মেঘের ছায়ায়, বিদ্যুতের চাবুকের নীচে কেমন জড়সড় হয়ে থাকত গোটা গ্রাম। সন্ধেয় লণ্ঠন আর কেরোসিন কুপির আলোয় কিসের যে ভয়! 'খাইতে আসো চন্দন, লিটন, তপু...' লণ্ঠনের আলোয় সামনে বই খুলে ঠাকুমার এই ডাকটুকুর অপেক্ষায়ই তো ছিলাম, উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরের দিকে ছুট। খিচুড়ি আলুভাজা, মাছভাজার গন্ধ ভাসছে সারা বাড়িতে, সেদিকেই তো মন পড়েছিল এতক্ষণ! পরদিন ঘুম ভাঙছে ব্যাঙেদের গম্ভীর কনসার্টে, জল থৈথৈ চারিধার। বাড়ির সামনের রেলের মাঠ একরাতেই যেন একটা নদী! আর ব্যাঙের দল, সত্যি বৃষ্টির জল পেলেই ডাক শুরু, সারা বছর কোথায় থাকত ওই বড় বড় হলুদ-সবুজরঙা ভেকের দল? ডাকলেই কেমন ফুলে উঠত ওদের দু'পাশের গাল? সত্যি কি এদের মধ্যে ডাইনির অভিশাপে কোনও রাজকুমার ব্যাঙ হয়ে আছে? কী মায়াই হত; শ্যামলের সঙ্গে লড়াই লাগতো জোর। ভারি দুষ্টু আর মারকুটে, খুব ঢিল ছুঁড়ত ব্যাঙগুলোর দিকে। কলাগাছ দিয়ে ভেলা বানাত শ্যামল, রঞ্জু, মিহির আরও সব দলবল। দু'জন করে ভেলায় চড়ে ওপাশের রেললাইন অবধি যাওয়া আর ফিরে আসা, ঝুপুস করে জলে পড়া, আহা কী সে আনন্দ! তারপর ভেজা জামাকাপড়ে চুপিচুপি বাড়ি ফেরা মায়ের পিট্টি আর রক্ষাকর্তা সেই ঠাকুমা বা দাদু।

একদিন কালো মেঘের দল ভেসে যেত কোথায় আর আকাশ গভীর নীল তাতে হাল্কা সাদার ছোঁয়া। পুজো আসছে, ধানখেতের পরে পাকা রাস্তা, মাঠ সব ছাড়িয়ে উত্তরে পাহাড়, আলে বসে দেখতাম। ফসলের খেতে ঢেউ দিয়ে যেত হাওয়া। নাগরু ঋষি এসে পড়তো কাঁধে ঢাক নিয়ে। প্রতিদিন ঠাকুর বানানো দেখতে গিয়েছি আর পুজো শুরু হতেই সকালে ফুল কুড়িয়ে মন্ডপে দিয়ে আসা চাইই। সব বাড়ি থেকেই ভেসে আসতো নারকেল নাড়ু, মুড়কির গুড় পাক দেওয়ার মিঠে গন্ধ। একটু বড় হতেই সব কাজে হাত লাগিয়েছি মহা উৎসাহে। নতুন পোশাক পরে সবাই একসঙ্গে অঞ্জলি দিতে যাওয়ার চল ছিল আমাদের বাড়িতে। সন্ধ্যায় নাগরু কাকার ঢাকের তালে আরতি, ধুনুচি হাতে নাচতাম কেউ কেউ। দশমীর মেলাকে আমরা হাটি বলতাম। জিলিপি খাওয়া, বেলুন কেনা, লঙ্কা বোম তারাবাতি এসবেই এত মজে থাকতাম কী ভাবে? স্থানীয় বীণাপাণি অপেরার যাত্রাপালা হত। পুজোতে একটা কষ্ট লেগে থাকতো মনের কোণে, সব বন্ধুদের পুজোর জামা কেনা হত না। আমার কেমন লজ্জা হত।

শীতেই কলকাতার প্রায় সব বড়বড় যাত্রা কোম্পানি আসতো আমাদের গ্রামে, প্রতিটি যাত্রাই দেখেছি। বৈশাখে কীর্তনের আসর, বাঁশির সুর খুব প্রিয় সে তখন থেকেই। গ্রামের হাইস্কুল সরকারি স্বীকৃতি পায়নি তখনও, এদিকে বৃত্তি পরীক্ষা পাশ করেছি। এল শেকড় ছেঁড়ার পর্ব। বুকের ভেতর কী সে যন্ত্রণা, রোদের রং ফ্যাকাশে যেন! সে গ্রাম, সে বাড়ি ছেড়ে যেতে হল পাশের শহরে, হাইস্কুলে ভর্তি হলাম। মানিয়েও নিলাম। বৃত্ত ক্রমে বড় হল, এরপর তিস্তাপাড়ের জল-শহরে কলেজ বেলা, বালাসন নদী পেরিয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, তিন্ধারিয়া পাহাড়, ঝাউবন, টিয়ার ঝাঁক, হৃদয় নন্দন বনে বেজে ওঠা বাঁশি, তিস্তাপাড়ে ফিরে এসে বিএড, হন্তদন্ত হয়ে চাকরি খুঁজে হন্যে হওয়া তারপর একদিন গরুমারার জঙ্গল পেরিয়ে ছোট এক শহরতলি, রুটিরুজির ব্যবস্থা হল।

মেয়েবেলার সবচেয়ে প্রিয় সময়টুকুর কথা এ লেখার বেশিটা জুড়ে। দূর থেকে দাঁড়িয়ে খোলাচুল উড়িয়ে সাইকেল ছোটানো মেয়েটাকে এখনও স্পষ্ট দেখি, আরও দেখি খুব স্পষ্ট করে হারিয়ে যাওয়া মানুষ, বাড়ি-ঘর, মায়াবী উঠোন, লণ্ঠনের আলো, প্রিয় গাছ-পালা , পথ-ঘাট। বাস্তবে তাদের অনেক কিছুর অস্তিত্বই কোথাও নেই আর! মৃদু বাষ্প রেখার মতো অব্যক্ত কিছু তো রয়ে গেছে তবু কোথাও। কী এমন ছিল সে অখ্যাত গ্রামে যা আর কোথাও নেই, মনে মনে যার খোঁজ আজও, মনখারাপের ক্ষণে তার কাছেই মনপাতা, মায়া মেশানো বকুলগন্ধি ভালবাসা আর উৎফুল্ল হয়ে ওঠা!

তনুশ্রী পাল

আরও ভাসা-র বারোমাস্যা

এ হল ভাসমান বাজারের গপ্পো। সেখানে পাল্লা থেকে লাফিয়ে মুরগি পালায় সাঁতার কেটে। কলকাতার ভাসন্ত বাজারের গল্প শুনে লেখকের মনে পড়ছে নিজের শহরের দিনবাজারে প্রবেশের তিন নম্বর পথের কথা। সেখানে বাজার করার পাশাপাশি জলবিহারের রোমাঞ্চ। তবে স্থির সিমেন্টের জাহাজে দাঁড়িয়ে কখনও তুমুল ঝড়ের মুখোমুখি হয়েছেন? সাধের বিজ্ঞাপণি ফ্লেক্সের দফারফা করা ঝড় সে সব। তারপর ধরুন মাত্র একজোড়া কিডনি দানের সিদ্ধান্তের কথা লাখো লাখো মানুষের মধ্যে ভাইরাল করার অনুরোধ। এই পর্বে লেখক ভাসমান বাজার থেকে স্মৃতির স্রোতে ভাসতে ভাসতে বয়ে গেছেন ইচ্ছেমত।

চার রাস্তার মোড় পেরোতেই সামনেটা দেখি, লোকে লোকারণ্য। যেদিকে তাকাও সেদিকেই লোক। একেবারে কার্নিভ্যালের মেজাজে, থোকা থোকা মানুষ ফুটপাথ থেকে উপচে পড়ে, রাস্তাতে গিজগিজ করছে। এবারের শীতে, পাটুলি মাঠের সার্কাসে এত জনসমাগম দেখা যায়নি, প্রতি ছুটির সন্ধ্যায় ফ্লোটিং মার্কেটের সামনে যা দেখছি। অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু নেই। সার্কাসের চেয়ে এইখানে সেলফি তোলায় মজা নিঃসন্দেহে অনেক বেশি।

শাক সবজি আর মাছ মাংস কেনা কাটার সাধারণ এক বাজার, হঠাৎ করে একেবারে খানদানি এন্টারটেনমেন্ট পার্কের স্টেটাস পেয়ে গিয়েছে। সেখানে এমন প্রচণ্ড রকম সাজগোজ করে দলে দলে মানুষ আসছেন, যে বিয়ে বাড়ির সাজগোজ তার সামনে হালে পানি পাবে না।

বারুইপুর বারাসাত রুটের বাস থেকে বউ ছেলে মেয়ের বিরাট পল্টন নিয়ে নেমে এলেন এক বিশাল বপু ভদ্রলোক। রাস্তার দিকে পেছন করে তিনি স্বয়ং বাসের দরজা দিয়ে নেমেছেন এবং সেই ভঙ্গীতেই এবার গুণে গুণে পরিবারের বাকিদের নামিয়ে হিসেব মেলাচ্ছেন। এমতাবস্থায় তার পশ্চাৎ অংশের সঙ্গে সরাসরি ধাক্কা কোনওমতে এড়িয়ে আমি নিজের পথ দেখতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু কেটে পড়ার আগেই ভদ্রলোক আমার হাতটা টেনে ধরে বললেন,

—ও দাদা, ভাসমান বাজারটা কোনদিকে?

—এই তো, পাশেই।

আমি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সেই হাত তুলেই দেখিয়ে দিলাম 'মাছরাঙ্গা' রেস্টুরেন্টের পাশে বাজারের প্রবেশপথটি। ভাল মতো খুঁটিয়ে না দেখলে অবশ্য এই অ্যাঙ্গেল থেকে সেখানে ঢোকার পথটা ঠিক চোখে পড়বে না। কারণ তা আড়াল করে পসরা সাজিয়ে একদিকে বসে পড়েছে আইসক্রিমওয়ালা ও বেলুনওয়ালা আর অন্যদিকে ফুচকা এবং চানাচুরওয়ালা।

—বাঃ! কী সুন্দর করেছে গো! একদম দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল মনে হচ্ছে!

বিরাট উচ্ছ্বাসসহ এই কথাটি বললেন যে গোলগাল মহিলা, তিনি সম্ভবত ভদ্রলোকের স্ত্রী। ভদ্রলোক সম্মতিতে ঘাড় নাড়লেন। তারপর আমার দিকে জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

—টিকিট কাউন্টারটা কোথায় দাদা?

আমি আর কি করি! মুখে চওড়া হাসি ফুটিয়ে বললাম, এটা একদম উইদাউট টিকিট। নিশ্চিন্তে ভেতরে চলে যান।

সুন্দরের পুজারি আমরা সবাই। আর সেই সুন্দর একদম ঝাঁ চকচকে সাজানো গোজানো হলে তো কথাই নেই। এটা মেনে নিয়েও কিন্তু তারপর আর একটা কথা আছে। পরমা সুন্দরী উর্বশী, রম্ভা বা মেনকা সংগীতের তালে তালে নাচলে অতীব সুন্দর। কিন্তু সেই সুন্দরীগণ যদি ঘ্রাও ঘ্রাও করে সশব্দে চারটি ঢেকুর তুলে ফেলে, সেটা হজম করতে একটু বেগ পেতে হবে বইকি! তো, কলকাতার দক্ষিণ শহরতলীর এই নবতম আকর্ষণ ফ্লোটিং মার্কেটের ক্ষেত্রেও ব্যাপার কতকটা সেরকম। আলোকসজ্জা আর সৌন্দর্য্যায়নে প্রকৃতই একটা মহার্ঘ্য পার্কের মতো পরিবেশ। কিন্তু তার মাঝে মুরগি, মাছ, উচ্ছে, আলু, চাল, ডাল-এর বাজার মসৃণভাবে খাপ খায় কী ভাবে?

একটা গোটা ঝিল জুড়ে রেলিং দিয়ে পাটাতন পেতে সাঁকো পাতা হয়েছে। মাঝখানে আবার মহা ফুর্তিতে নেচে নেচে আকাশে জল ছুড়ছে একটি ফোয়ারা। সাঁকোর রাস্তাগুলো কাটাকুটি খেলে খোপে খোপে ভাগ করে দিয়েছে ঝিলটিকে। আর সে রকম এক একটি খোপে পেটমোটা বাহারি নৌকোতে বসে, দুলে দুলে দোকান চালাচ্ছে দোকানিরা।

পনেরো বছরের ওপর হল যারা, বাইপাসের ধারের শক্ত মাটিতে বসে বসে দাঁড়িপাল্লায় ওজন চাপিয়ে অভ্যস্ত, নৌকোয় দুলতে আজ তাদের কেমন লাগছে সেটা সহজেই অনুমেয়। এবং সেই সব জাত ক্রেতা, যারা শ্যেনদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরে পাল্লার কাঁটা রীতিমত পর্যবেক্ষণের পর তবেই মাপের বিষয়ে সন্তুষ্ট হন, এই বাজারে তাদেরও দুর্দিন! জলের জলসায় স্থির মাপ বলে কিছু হয় কি?

আমার বাড়ির পাশের ফুটপাথে উত্তমদার চায়ের দোকানে নিত্য আড্ডা দিতে আসেন এক নিপুণ গল্পবাজ দাদা। তার বিচিত্র অভিজ্ঞতা সর্বদাই শুনতে দারুণ। কিন্তু অভিজ্ঞরা জানেন, একটু ফিল্টার করে না নিলে তার গল্পগুলোর প্রকৃত বাস্তব অধরা রয়ে যায়। তো, প্রথমদিন ফ্লোটিং মার্কেট ঘুরে এসে তিনি বললেন,

—সিধু ব্যাটা আজ বউনি করার আগেই বিরাট লস করে ফেললো হে!

ফ্লোটিং মার্কেট হওয়ার আগে বাজারের নাম ছিল ঢালাই ব্রিজ বাজার। আর সিধু, সে বাজারেরই শুরুর দিককার প্রসিদ্ধ মুরগি বিক্রেতা। প্রতি সপ্তায় মুরগির দামের ওঠা নামার পরিপ্রেক্ষিতে সিধুর বিখ্যাত ডায়লগ হল, ব্যবসায় নেমেছি, ষাট টাকা কিলোর জমানায়। ব্যবসা ছাড়ব ট্রিপল সেঞ্চুরি মেরে!

গল্পদাদা চায়ে চুমুক দিয়ে, সেই সিধুর আজব লোকসানের গল্পটি শুরু করলেন,

—বুঝলে, আমি তো চিরকালই গোটা মুরগি কিনি। আজকেও তাই। একটা ভাল দেখে মুরগি বেছে নিয়ে সিধুকে বললাম, তোল এটাকে পাল্লায়। কিন্তু বিশ্বাস করবে না, জলের গন্ধ পেয়েই কি না কে জানে, পাল্লায় তোলা মাত্রই সে মুরগি হঠাৎ ঝটকা দিয়ে এক লাফে সোজা ঝিলের জলে!

হাত পা নেড়ে এমন অভিনয় করে মুরগির ঝাঁপ দেখালেন দাদা, যে দোকানের বাকি খদ্দেররা সবাই হকচকিয়ে হাঁ! একজন শুধু ঢোঁক গিলে বলল, আকাশে না উড়ে...মুরগি শেষে জলে ঝাঁপ দিল?

—হ্যাঁ গো। মুরগি যে এত ভাল সাঁতার কাটতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করতুম না! কেউ ধরার আগেই ব্যাটা ঝিল পেরিয়ে একেবারে পগার পার!

গল্পদাদা অতি পরিতোষের সঙ্গে তার কাহিনিতে উপসংহার টেনে, হাতের সিগারেটে টান লাগালেন! শ্রোতারা সবাই ততক্ষণে সেই গল্পের রেশ টেনে, জিওল মাছ নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠেছে। জ্যান্ত মাছ তো নিশ্চয় মুরগির চেয়ে বেশি করে জলের গন্ধ পাবে। তাহলে, তাদের সামলাতে কি ধরনের তেজী স্ট্র্যাটেজি নেয়া উচিৎ ফ্লোটিং মার্কেটের মাছওয়ালাদের?

ফ্লোটিং মার্কেটে বাজার করার অভিজ্ঞতা অবশ্য আমি আমার কিশোর বয়সেই সঞ্চয় করে ফেলেছিলাম জলপাইগুড়ির দিনবাজারে। আশির দশকের প্রথমদিকে আদি বাজারটির দুটি মাত্র প্রবেশপথ ছিল। হয় কামারপাড়ার দিক থেকে। নয় রায়কত পাড়ার দিকে করলা সেতুর মুখ থেকে। পুরনো মাছের বাজারের প্রকাণ্ড টিনের চালাটি করলা সেতুর দিক থেকেই কাছাকাছি পড়তো। আর যতদূর মনে পড়ে তখন সেই বাজারের মাত্র পাঁচ-ছয় শতাংশ দোকান ছিল নদীর ধার ঘেঁষে।

কিন্তু ওই একই দশকের মাঝামাঝিই যখন বাজারের সম্প্রসারণ ঘটল, নদী পাড়ের দিকটাতেই সেটা বেশি হয়েছিল। আমাদের কেরানিপাড়া থেকে তখন আর বেগুনটারি মোড় ঘুরে বাজার যাওয়ার দরকার পড়তো না। কারণ শিল্পসমিতি পাড়ার ভেতর দিয়েই সোজা করলার পাড় অবধি চলে এলেই পৌঁছে যাওয়া যেতো বাজারে ঢোকার নতুন এবং তৃতীয় প্রবেশ পথে।

এরপর, সেবার বর্ষায় করলার জল বাড়তেই, সেই নতুন বাজারটি একটা দেখার মতো ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। পর্যায়ক্রমে, মোটামুটি গোড়ালি ডোবা থেকে শুরু করে উরু পর্যন্ত জলের সম্মুখীন হতে হচ্ছিল বাজারের নানা এলাকায়। কোথাও সে জল নিস্তরঙ্গ তো কোথাও চপল স্রোতের স্বর খলবল খলবল করছে! এখানেও ব্যাপারটা খানিকটা পাটুলি ফ্লোটিং মার্কেটের মতো। বাজার করতে যত না লোক এসেছে, জল থই থই বাজারের দশা দেখতে তার চেয়ে বেশি ভিড়। কারণ সেই জল ঠেলে ঠেলে হাঁটার মধ্যে দিব্যি একটা অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ আছে। বিশেষতঃ পাশেই যেখানে দেখা যাচ্ছে, শান্ত করলা নদী একেবারে ভোল পাল্টে ওলটপালট ঘূর্ণি স্রোতের ডিপো হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাজারের দোকানিরা প্রমাদ গুনছে যে এই বুঝি সব পশরা ভেসে যায়। কিন্তু জনতার কাছে সেই সম্ভাবনার মধ্যেও মজার খোরাক রয়েছে। আলুর গুদাম পুড়লে যারা ফ্রি-তে পোড়া আলু খেতে পায়, তারা তো শুধোবেই... গুদাম আবার কবে পুড়বে? সেলফি যুগ ছিল না সেটা। তাই সেদিনের ওই ছবি, স্মৃতির ধূসরতায়, হয়ত অনেকের মন থেকেই হারিয়ে গেছে।

যেমন হারিয়ে গিয়েছে, তিস্তা উদ্যান তৈরি হওয়ার আগে কেমন দেখতে ছিল, ঠিক ওই জায়গাটার জলা জঙ্গুলে চেহারা। বাবুপাড়ার দিক থেকে করলা ব্রিজ পার হয়ে যখন ঢালু পথ দিয়ে পি-ডবলু-ডি মোড়ে গড়িয়ে নামত রিক্সা বা সাইকেল, ডানদিকে তাকালেই করলার বাঁধের গায়ে কচুরিপানা জমা একখানা বিরাট জলা চোখে পড়ত। সেখানে বিশেষ দ্রষ্টব্য ছিল দু'খানা পেল্লায় আকৃতির নৌকো। পরিত্যক্ত অবস্থায় যাদের সেই জলে কাত হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছি সেই বালক বয়স থেকেই। বয়স্কদের মুখে শোনা, ওই নৌকো দুটো নাকি আটষট্টির বন্যার সময় ত্রাণ কাজে ব্যবহারের জন্য আনা হয়েছিল। সেই কাজ মিটে যাওয়ার পর কুড়ি বছর ধরে ওখানেই পড়ে পড়ে তাদের রিটায়ার্ড জীবন কেটে গেল। এবং অবশেষে তিস্তা উদ্যান তৈরির প্রাক্কালে কবে যেন তাদের কঙ্কাল সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় যথোচিত ধামে।

এই তিস্তা উদ্যান, একটু একটু করে গড়ে উঠতে প্রায় দু' বছরের কাছাকাছি সময় লেগেছিল মনে হয়। মাধ্যমিক পাশ করে তখন আমরা যথেষ্ট লায়েক। তাই পাড়ার খেলার মাঠে আর তেমন ইন্টারেস্ট নেই। বিকেলের দিকে বরং করলা বাঁধ আর জুবিলি পার্ক এলাকার নানা নিষিদ্ধ আকর্ষণ আমাদের ফেভারিট টাইম পাস। তো সেই সূত্রে ব্রিজের মুখ থেকে বাঁধ ধরে জুবিলি পার্কে যাওয়ার পথে নজরে পড়ত, কী যেন এক কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে জলা জমিটায়। খোপ খোপ জালের বেড়া দিয়ে জায়গাটা ঘেরা থাকলেও, কপালক্রমে বাঁধের দিকটায় একটা গেট আবিষ্কার করা গেল। যেটা দিয়ে মজুররা যাতায়ত করত। কোনও দ্বারোয়ান টারোয়ানের বালাই নেই দেখে সুট করে ফাঁক গলে মাঝে মাঝে আমরাও ঢুকে পড়তাম সেই পথে।

আহা! সে এক মহা বিস্ময় মাখা অভিজ্ঞতা। চোখের সামনে দেখছি, উদ্যানের মাঝখানে একটু একটু করে এক বিরাট দিঘি খুঁড়ে ফেলা হল। এরপর তার মাঝখানে তৈরি হতে লাগল সিমেন্টের একখানা আস্ত জাহাজ। মাসের পর মাস ধরে কাজ চলছে। আর কয়েক সপ্তাহ পরে পরে উদ্যানের ভেতরে ঢুকে আমরা অগ্রগতির নতুন রূপ দেখে রোমাঞ্চিত হচ্ছি। জাহাজটা তৈরি হয়ে যাওয়ার আরও কয়েক মাস বাদে উদ্যানের প্রকৃত উদ্বোধন হয়েছিল। অপামর জনসাধারণ তারপর থেকে সেখানে ঢোকার

সুযোগ পায়। কিন্তু আমাদের কথা আলাদা! জাহাজের কাজ মিটে গেলেও মজুরদের চলাচলের রাস্তা তখনও বন্ধ করার কথা উদ্যান কর্তৃপক্ষের মাথায় খেলেনি। এই একটি ক্ষেত্রে তাই সরকারি দপ্তরের শ্লথতা আমাদের জন্য বেশ ভাল মতই সুবিধে করে দিয়েছিল। পরবর্তী কালে অবশ্য ওই উদ্যানের সব গেটেই তালা ঝুলে যায়। নির্দিষ্ট সময় ছাড়া সেখানে ঢোকারও ছাড়পত্র রীতিমত অমিল। রেগে মেগে আমরা বলতে শুরু করলাম, ওই দ্যাখো, গার্ডেন তো এখন সেলফিশ জায়েন্টের গার্ডেন হয়ে গেছে!

যাই হোক, সে সব তো অনেক পরে। বলছিলাম, উদ্যান উদ্বোধন হওয়ার আগের সময়টার কথা। সবার অগোচরে সে সময় আমরা ছেলেদের দল রোজ বিকেলে সিমেন্টের সেতু পেরিয়ে দিব্যি ওই জাহাজে গিয়ে চড়ে বসতাম। নীচে এবং ওপরে দু' খানা ডেক ছিল জাহাজটার। এবং দুটোর স্বাদ দুরকম! জীবনে ওই একবারই আমার জাহাজে চড়া... এবং নিখরচায়। যারা ভাবছেন পুকুরের মাঝে একটা অচল সিমেন্টের জাহাজে চড়ে কী সুখ? ...তাদের উদ্দেশে বলি, খামোখা নাক শিঁটকোবেন না। একদিন সন্ধের মুখে ওই জাহাজের ডেক-এ দাঁড়িয়েই এক প্রলয়ঙ্করী কালবৈশাখী ঝড়ের সাথে মোলাকাত হয়েছিল আমার। লাল আকাশ, কালো মেঘ, আর সেই আকাশ চেরা নীল নীল বিদ্যুৎ-এর অতি-নৈসর্গিক সেই পটভূমিতে সিমেন্টের জাহাজে এমন প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, যে তার সাক্ষী হিসেবে নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে... ওটাকেই বলে ওয়ান্স ইন আ লাইফটাইম এক্সপিরিয়েন্স।

কালবৈশাখীর প্রসঙ্গেই আবার ফিরে আসি, চলুন পাটুলির ফ্লোটিং মার্কেটে। তিস্তা উদ্যানের মতো এই মার্কেট-কেও, ন্যাড়া ঝিলে শাল খুঁটি পোঁতার সময় থেকে, তিল তিল করে গড়ে উঠতে দেখলাম। তবে তিস্তা উদ্যানের মতো বছর দুয়েক লাগেনি। এর বেলায় দেখলাম বছর ঘুরতে না ঘুরতেই কাজ খতম হয়ে বাজার চালু!

রাতের আলোকিত ম্যাজিকে জায়গাটা নিঃসন্দেহে অতীব নজরকাড়া। কিন্তু প্রকাশ্য দিবালোকে এখানে বাজার করা যে খুব একটা আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা হবে না, সেটা অবশ্য এখন থেকেই বোঝা যাচ্ছে! বাজার থেকে হাঁকপাঁক করতে করতে ব্যাগ হাতে বেরিয়ে আসছিলেন সেদিন দুই ভদ্রলোক। বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে কানে এল তাদের কথোপকথন।

ব্যাক্তি ১ —আরে বাপ রে। গ্রীষ্ম জাঁকিয়ে পড়লো না... এখনই তো খাবি খেয়ে যাচ্ছি মশাই! ব্যাক্তি ২ —সেটাই তো ভাবছি। খোলা আকাশের নীচে বাজার করা চাট্টিখানি কথা? তার ওপর আবার একটু ছায়ার নীচে দাঁড়াতে চাইলেও এখানে গোলকধাঁধার মতো আধামাইল ব্রিজ পেরোতে হবে। লোকে তো তার আগেই সানস্ট্রোক হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বে মশাই!

ব্যাক্তি ১ —হুম। যা মনে হচ্ছে শিগগিরিই এখানে অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস আর প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন অনিবার্য। ব্যাক্তি ২ —কিন্তু, স্থাপন করবেটা কে বলুন তো? এটা কি বাজারের দোকানিদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে?

এই একই প্রকৃতির আলোচনা যে জনতার মুখে মুখে ফিরছে, সেটা বোঝা গেল এরই দিনকয়েক পরে। অ্যাকশন থাকলেই তার রিয়্যাকশন হয়। সেই অনুযায়ী দেখা গেল, বাজারের ব্রিজগুলোর ওপর ব্যাঙের ছাতার মতো শত খানেক রং-বেরঙের গার্ডেন আমব্রেলা

“তিস্তা উদ্যানের মতো এই মার্কেট-কেও, ন্যাড়া ঝিলে শাল খুঁটি পোঁতার সময় থেকে, তিল তিল করে গড়ে উঠতে দেখলাম। তবে তিস্তা উদ্যানের মতো বছর দুয়েক লাগেনি। এর বেলায় দেখলাম বছর ঘুরতে না ঘুরতেই কাজ খতম হয়ে বাজার চালু!”

খাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। খাটনি এবং খরচ করে কাজটা যারাই করে থাকুন, তাদের ধন্যবাদ প্রাপ্য। এখন অন্তত, আর পুরোপুরি খোলা আকাশের নিচে বাজার করতে হবে না। কিন্তু এটা দেখার পরেও স্বস্তির বদলে আমার মনের ভেতর এক অন্য অস্বস্তির খচখচানি চালু হয়ে গেল। এই তো সামনে আসছে বৈশাখ মাস। সে সময়ের কালবৈশাখী তো আছেই, তার পর আবার বর্ষার সময়ে বেশ কয়েক দফা ঘনীভূত নিম্নচাপের ঝক্কিও সামলাতে হয় এই শহরকে। সেই সময় বড় বড় বিজ্ঞাপনের ফ্লেক্স হোর্ডিং পর্যন্ত ফাটিয়ে চৌচির করে দেয় যে দমকা হাওয়া, সে তো গার্ডেন আমব্রেলাগুলোকে নিয়ে বিরাট রকমের ছেলেখেলা করবে। রীতিমত চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকিয়ে উপড়ে ফেলে দিলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই! মনে মনে তাই ভাবলাম, ভগবান করুন, সেই রকম একটা ঝড়ের সময় ওই বাজারে ঝিলের মধ্যিখানে যেন না আটকে পড়ি! উড়ন্ত ছাতার খোঁচায় আহত বা নিহত হওয়া মোটেই কাজের কথা নয়।

মোটামুটি পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও বাজারে একটু কান পাতলেই শোনা যায়, কোনও না কোনও বিক্রেতা গলার শির তুলে হাঁকছেন... জলের দরে নিয়ে যান... জলের দাম, জলের দাম!

মধ্যবিত্ত মানুষের কানে সেই আওয়াজ নিছক আওয়াজ নয়। বরং একটি আশ্বাস, যে মাগ্যিগণ্ডার বাজারে, এইখানে অন্ততঃ গলা কাটা দাম হবে না বোধহয়। কিন্তু পাটুলি ফ্লোটিং মার্কেটে যতদূর দেখছি, এই অতি কমন ডায়লগটি হেঁকে ওঠার মতো মেজাজ কোনও দোকানিরই নেই। তারা সবাই হয় বিমর্ষ, নয় গুপ্তভাবে ক্ষিপ্ত! কারণ, মূলতঃ সান্ধ্য দর্শনার্থীদের বিরাট ভিড়ের সামনে, অন্যতম দ্রষ্টব্য হয়ে বসে থাকা ছাড়া এখন তাদের আর বিশেষ কাজ নেই। একদিকে যেমন বাসে বা অটোতে চেপে আসা দর্শনার্থী দলের ঢল, অন্যদিকে তেমন পালে পালে প্রাইভেট গাড়ি এসে বাইপাসের ধারে পার্ক হচ্ছে। যা থেকে নেমে অতি হাইফাই লোকেরা এসে ঢুকছে বাজারে। কিন্তু উভয়পক্ষই কিনছে বড় জোর অল্প একটু টম্যাটো বা ধনে পাতা। কারণ এই বাজারে তাদের আগমনের মূল হেতু, একটা ভাল পজিশনে দাঁড়িয়ে জম্পেশ করে সেলফি ছবি তোলা।

ধনী-গরীব বলে কোনও ভেদ নেই। প্রত্যেক মানুষের যেমন চোখ, কান, নাক, মুখ থাকবেই, তেমনি হাতে একটা ক্যামেরা ও ইন্টারনেট সমৃদ্ধ স্মার্টফোন আজকাল থাকবেই থাকবে। ফলে, হোয়াটস অ্যাপ আর ফেসবুকের পোকা আজ কে নয়? একদম সার্থক শ্রেণিহীন সমাজ তো একমাত্র এই সোশ্যাল মিডিয়াই! যার সুবাদে, আজ আমাদের সবার জীবনে নিত্য নতুন ইভেন্টের চাহিদা, আকাশছোঁয়া হয়ে পড়েছে। আর এ ব্যাপারে সবাইকে পর্যাপ্ত সমানাধিকার দিতে, এই ফ্লোটিং মার্কেটের মতো নয়া নয়া আকর্ষণগুলোই আজ চারিদিকে ভাইরাল।

ভাইরাল প্রসঙ্গেই মনে পড়ল... আমার কন্ট্যাক্টের এক হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপে ক'দিন আগে একটি পোস্ট এল যে মরণোত্তর কিডনি দান করতে চাইছেন একটি পরিবার। স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই এক্সিডেন্টের ফলে ব্রেন ডেড। সেই দু'জনের অঙ্গ দান করতে চান নিকটতম আত্মীয়রা। সেই হোয়াটস অ্যাপ পোস্টে একটি যোগাযোগ নম্বর দেয়া হয়েছে এবং পোস্ট-টি যত বেশি সম্ভব শেয়ার করতেও অনুরোধ করা হয়েছে।

কিন্তু এই পোস্টটি ছাড়ার আগে এটা ভেবে দেখা হয়নি যে কিডনি জোগাড় করার জন্য প্রায় প্রাণপাত করতে হয় আর একটি পোস্ট শেয়ার করার জন্য টাচস্ক্রিনে শুধু একটু আঙুল ছোঁয়ানোই যথেষ্ট। ফলে, প্রায় বিনা কষ্টে অসংখ্য মানুষ নিমেষের মধ্যে শেয়ার করে করে পোস্টটি ভাইরাল তো করে দিলেন। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়ায় কতো মানুষ যে ফোন করে করে হতাশ হলেন ও কষ্ট পেলেন, তার হিসেব কে রাখবে? কিডনি যে ছিল মোটে দু'খানা।

এবং সব চেয়ে নিষ্ঠুর ব্যাপার হল যে হোয়াটস অ্যাপ পোস্ট তার উৎপত্তির তারিখ বহন করে না। ফলে এক মাসের ওপর কেটে গেলেও, পোস্টটি এখনও রোজই কেউ না কেউ শেয়ার করছেন এবং নিজেদের অজান্তেই বিদ্রূপের মতো করে, মিথ্যে আশা জাগিয়ে চলেছেন। কেউ জানে না, আরও কতদিন এই মরীচিকা তরী ভেসেই চলতে থাকবে আমাদের এই অতি সক্রিয় ভারচুয়াল জগতে।

অভিজিৎ সরকার

(ক্রমশ)

ডুয়ার্সের চা বাগান চিনুন

ডুয়ার্সের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়েও বাকি পৃথিবী থেকে যেন আজ বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতোই রয়েছে ডুয়ার্সের চা জগৎ। খবরের কাগজে মাঝেমধ্যে চা-শ্রমিকের মৃত্যু সংবাদ, এ ছাড়া আর কেউ আজ জানতে পারে না সে জগতের খবর। বাইরের মানুষের কাছে, নতুন প্রজন্মের কাছে বিশাল এই চা-সাম্রাজ্যের ভূগোল নিয়ে কোনও ধারণাই নেই। 'এখন ডুয়ার্স' এর পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে পাঠককুলকে ডুয়ার্সের চা-বাগানগুলি ধরে ধরে পরিচিত করবার। প্রতিটি বাগান ঘুরে তার সাম্প্রতিকতম পরিচিতি লিপিবদ্ধ করছেন **ভীষ্মলোচন শর্মা**। এবারের পর্বে প্রতিবেদক ঘুরেছেন করলাভ্যালি ও ডেঙ্গুয়াঝাড় চা-বাগান। তুলে এনেছেন সেখানকার মানুষের সুখ-দুঃখের কথা।

ডেঙ্গুয়াঝাড় আর করলা ভ্যালির যুগলবন্দী

তিস্তা নদীর তীরে দেড়শ বছরের পুরনো শহর জলপাইগুড়ি। নদীর পার ঘেঁষা দীর্ঘ বাঁধ দিয়ে শহরকে সুরক্ষিত করা হয়েছে ১৯৬৮ সালের ভয়ংকর বন্যার পর। রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে শহরের খোলা জায়গা থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার হাতছানি, সবুজ চা-বাগানে ঘেরা মোহময় প্রান্তর, নারকেল-সুপুরি গাছে ঘেরা মফঃস্বল শহরটি বসবাসের জন্য আজও এতটাই শান্তিপূর্ণ যে অস্থায়ীভাবে শহরে এসে বসবাসকালে অনেকেই মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে পড়ে স্থায়ীভাবেই শহরে থেকে যান। ৬৮ সালের বন্যা শহরের অর্থনীতিতে একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনে। আর্দ্রতা বেশি, শীতও যথেষ্ট বেশি এবং বৃষ্টি অধ্যুষিত অঞ্চল জলপাইগুড়ি।

শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা চরমভাবাপন্ন বলে সমগ্র জেলা চা চাষের পক্ষে উর্বর মাটির জন্ম দিয়েছে। তাই ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ মিলে সবুজ চা-বাগিচার সুঘ্রাণ জেলার অর্থনীতিতে নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। তিস্তা নদী দ্বার পরিবেষ্টিত জলপাইগুড়ি শহর জলপাইগুড়ি জেলার সদর দফতর এবং উত্তরবঙ্গের বিভাগীয় সদর দফতর। তিস্তা নদীর পারে জুবিলি উদ্যান, তিস্তা শিশু উদ্যান, সরোজেন্দ্র দেব রায়কত কলাকেন্দ্র (যাকে আর্ট গ্যালারিও বলা হয়), টাউন ক্লাব স্টেডিয়াম, স্পোর্টস কমপ্লেক্স, আর্য নাট্য সমাজ, কিং সাহেবের ঘাট, করলা ভ্যালি-ডেঙ্গুয়াঝাড়-রায়পুর-জয়পুর চা-বাগান, রাজবাড়ি এবং হেরিটেজ গেট, নবাব বাড়ি, প্রস্তাবিত সার্কিট বেঞ্চ, দেবী চৌধুরানি মন্দির, ভ্রামরী দেবীর মন্দির, যোগমায়া কালীবাড়ি, লোকনাথ মন্দির, হুজুর সাহেবের মাজার, ব্যাপটিস্ট এবং রোমান ক্যাথলিক চার্চ, কালু সাহেবের মাজার, সাতকুড়ার ত্রিস্রোতা মহাপীঠ, শিকারপুরের ভবানী পাঠকের মন্দির, গজলডোবা, ইউরোপীয়ান ক্লাব সবার সঙ্গেই শহর তথা জেলার বহু পুরনো ইতিহাস জড়িত, যা আজও নস্টালজিক করে তোলে পুরনো মানুষগুলিকে।

ডেঙ্গুয়াঝাড়

জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ লাগোয়া ডেঙ্গুয়াঝাড় টি এস্টেট। সামনে বিস্তৃত উর্বর কৃষিজমি এবং সবুজ চা বাগিচার মাঝখান দিয়ে স্রোতস্বিনী করলা। দু'হাত বাড়িয়ে রৌদ্রোজ্জ্বল শীতের দিনে রংবেরঙের খেলায় সজ্জিত কাঞ্চনজঙ্ঘা যেন কাছে, আরও কাছে আসার আহ্বান জানায়। জাতীয় সড়কের উপর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং করলা নদীর পাশ দিয়েই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যাবার রাস্তা। একদিকে কলেজে যাওয়ার রাস্তা, অন্যদিকে গোশালা মোড়ের কালী মন্দির তথা দেবী চৌধুরানির মন্দির।

জলপাইগুড়ি সদর মহকুমার ডেঙ্গুয়াঝাড় টি গার্ডেনটির পরিচালক গোষ্ঠী গুডরিক গ্রুপ লিমিটেডকে পরিচালনগত সহায়তা প্রদান করে থাকে ডিবিআইটিএ। **বাগানের আয়তন ৯৬৩.৯ হেক্টর**। চাষযোগ্য আবাদীক্ষেত্র ৯৪০.২৫ হেক্টর। ড্রেন এবং সেচের সুবিধাযুক্ত অঞ্চল ৩২৪.২৫ হেক্টর। মোট চাষযোগ্য **উৎপাদনক্ষম আবাদীক্ষেত্র ৬৬৪.৩৩ হেক্টর**। প্রতি হেক্টর উৎপাদনযোগ্য এবং ড্রেন ও সেচযুক্ত 'প্ল্যান্টেশন এরিয়া' থেকে প্রতি হেক্টর জমি পিছু ২৩০৫ কেজি করে চা উৎপাদিত হয়। বাগানে শ্রমিক পরিবারের সংখ্যা ৯৫৫। মোট জনসংখ্যা ৭০৫৬। স্থায়ী শ্রমিক ১৪২৯ জন। **মোট কর্মরত শ্রমিক ১৭৫১ জন**। হাসপাতাল দেখলাম খানিক উন্নত। আলাদাভাবে পুরুষ/মহিলা/ আইসোলেশন ওয়ার্ডের ব্যবস্থা আছে। অপারেশন থিয়েটার,অ্যাম্বুলেন্স, ডাক্তার নার্স সবই আছে। ডেঙ্গুয়াঝাড় বাগানে ক্যান্টিন আছে। ক্রেশের সংখ্যা ৩টি। বাগিচা সংলগ্ন বিদ্যালয়ের নাম কালিয়াগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। শ্রমিক সন্তানদের বিদ্যালয়ে নেওয়ার জন্য একটি বাসের ব্যবস্থা আছে। ডেঙ্গুয়াঝাড় টি

গার্ডেনে বিগত অর্থবর্ষে গড়ে ১ কোটি ২৫ লাখ টাকা প্রভিডেন্ড ফান্ড খাতে জমা পড়েছে। মজুরি চুক্তি অনুযায়ী দেওয়া হয়। শ্রমিকদের বকেয়া নেই। তাদের জ্বালানি, চপ্পল, ছাতা, কম্বল নিয়মিত সরবরাহ করা হয়। শুনলাম কোম্পানি তার বাগিচার প্রতিটি কর্মীর চিকিৎসা সংক্রান্ত, শিক্ষা সংক্রান্ত এবং শ্রমিক উন্নয়নে যা যা করা প্রয়োজন সবকিছু ব্যবস্থা করে। পুরো বাগানটি চষে ফেললে সর্বত্র চোখে পড়বে এঁদের নিঁখুত পেশাদারিত্ব।

ভারতবর্ষের প্রথম তিনজন চা উৎপাদকের মধ্যে অন্যতম উৎপাদক গুডরিকস। অত্যন্ত উন্নতমানের চা উৎপাদন, চা সংক্রান্ত গবেষণা, চায়ের মান বাড়ানোর জন্য বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনার পাশাপাশি বিশ্ববাজারে দার্জিলিং এবং আসাম ব্র্যান্ডের চা-কে পরিচিত করানোর অন্যতম ব্র্যান্ড। ব্রিটেন, জার্মানি, জাপান, আমেরিকায়ও চায়ের ব্যবসায় নেমেছেন আগেই, এবার জানা গেল চিন, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশগুলির বাজারেও তৈরি চা নিয়ে হাজির হয়েছেন এঁরা, লক্ষ্য সার্বিকভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ওই চায়ের বাজার ধরা। সেই কথা মাথায় রেখেই উত্তরবঙ্গে লগ্নি করছে সংস্থা। এর ফলে কারখানাগুলির উৎপাদন ১০ থেকে ১৫ শতাংশ বাড়বে বলে দাবি কোম্পানির। আধুনিক চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রথাগত চায়ের পাশাপাশি প্যাকেটজাত চায়ের উৎপাদনেও নজর দিচ্ছে গুডরিকস এবং টার্গেট দু' বছরের মধ্যে এক কোটি কেজি প্যাকেট উৎপাদনের। ডুয়ার্সের ১২টি বাগানে প্রায় ১.৫ কোটি কেজি সিটিসি চা উৎপাদন করে গুডরিক। একই সঙ্গে ডুয়ার্সের একটি বাগানে ৫০০ টন অর্থোডক্স চা তৈরির পরিকল্পনা করেছে গুডরিকস। গ্রিন টি তৈরির জন্য ডুয়ার্সে একটি নতুন কারখানাও তৈরি করার কথা।

শিলিগুড়িতে চা নিলাম কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ার ফলে ধীরে ধীরে রপ্তানির বাজারে আধিপত্য নেয় আমাদের তরাই-ডুয়ার্সের চা। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে যাওয়ার পর এই ছবি অনেকটাই বদলায়, আধিপত্য বাড়ে দক্ষিণ ভারতীয় চায়ের। পাশাপাশি ওই সময়ে নানা কারণে ভারতীয় সিটিসি চায়ের গুণমান পড়তে থাকে এবং বাজার হারায় তরাই এবং ডুয়ার্সের চা-ও। বেশি দামের জন্য বাজার পড়তে থাকে ভারতীয় অর্থোডক্স চায়েরও। ক্রমে সেখানে শ্রীলঙ্কা এবং কেনিয়ার চা চায়ের বাজার দখল করে নেয়। এই পরিস্থিতিতে রাশিয়ার বাজারকে ফের পাখির চোখ করে এগনোর প্রয়াস নিয়েছে ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন, সঙ্গে অবশ্যই রাখছে গুডরিককে।

যেটা বলা হয় নি আগে, ডেঙ্গুয়াঝাড় বাগানে সেচ ব্যবস্থা যথেষ্টই কার্যকরী। খাল কেটে চা বাগিচার জল বের করে দেওয়া হয়, রহস্য করে বলা যেতেই পারে চা বাগিচারই জলে দুটো আস্ত নদীই তৈরি হয়ে গিয়েছে যাদের জন্ম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ক্যাম্পাসে। পলিটেকনিক এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মাঝখান দিয়ে বয়ে গিয়েছে দুই নদী ধরধরা এবং রুকরুকা, যেন মিস্টি দুই যমজ বোন। চা বাগানের বুক চিরে চলে গিয়েছে রেললাইন, বাকি ভারতের সঙ্গে নর্থ-ইস্টের যোগসূত্র স্থাপন করেছে। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে নর্দান ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের এই লাইন গিয়েছে নিউ কোচবিহার থেকে গুয়াহাটি পর্যন্ত। দূর থেকে আমাদের ঘরোয়া তিস্তা, কামরূপ তো আসেই, এ ছাড়াও বাকি সমস্ত উত্তর-পূর্বের ট্রেন যেমন ব্রহ্মপুত্র, অবধ অসম, গুয়াহাটি রাজধানী, সমস্তই এই পথ দিয়ে যায়। চা বাগানের বুক চিরে ডিজেল ইঞ্জিনের ধোঁয়া ছেড়ে ট্রেনগুলো বেরিয়ে যায়। বড় মায়াবী সে দৃশ্য। বড্ড গর্ব হয় মনে মনে, আরে এতো আমার মোহিনী ডুয়ার্স!

> শুধু চা-বাগানে কাজ করা নয়, এবার থেকে চা বাগিচায় রেশন ব্যবস্থাও চালাবেন মহিলা চা-শ্রমিকদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী। উত্তরবঙ্গের ৩০০টি বাগানেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে চালু হচ্ছে খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্প। 'যে রাঁধে, সে চুলও বাঁধে' এই প্রবাদবাক্য সত্যি হতে চলেছে জলপাইগুড়ির করলা ভ্যালি চা-বাগানে।

করলা ভ্যালি

জলপাইগুড়ি শহরের উপকণ্ঠে করলা ভ্যালি চা-বাগান। জায়গাটা দ্বীপের মতো। চা-বাগান থেকে নেমে করলা নদী পেরিয়ে কাকচক্ষু জলের নীচে বালির আলপনা আর রংবেরঙের পাথর দেখতে দেখতে জল ভেঙে ওপারে উঠলাম। একটা টিলা মতো জায়গায় লোটা দেবীর মন্দির, পাশে চা-বাগান। ঢেউ খেলানো বাগিচা, নয়নাভিরাম দৃশ্য। নামলাম। তখনই ভাললাগার তালটা কেটে গেল। দেখলাম প্রকাশ্য দিবালোকে করলা নদীর বুকে একটা দুটো নয়, একাধিক ট্রাক নেমে বালি তুলছে। বালি বোঝাই ট্রাক উঠে যাচ্ছে মোহিতনগরের দিকে বড় রাস্তায়। নদীর পার কেটে, বাঁধের বারোটা বাজিয়ে নদীর বুক থেকে রাস্তা পর্যন্ত ট্রাক উঠে যাওয়ার মসৃণ ও স্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়েছে। নদীর পারে অনেক মানুষ বসবাস করে, স্নান করতে, বাসন ধুতে, কাপড় কাচতে আসেন। সবাই দেখলাম স্থানুবৎ নীরব দর্শক, আগন্তুক শহুরে প্রাণীদের দেখছে খানিক জিজ্ঞাসু চোখে।

বাগানে ঢুকতে ঢুকতেই কী একটা দেখে যেন হঠাৎ মনে পড়ল গতবারও তারিখটা ছিল একই। এসেছিলাম বাগিচার লেবার লাইনে। তখন ডিমনিটাইজেশনের সময়কাল। নোটের গেরোয় আটকে হাসফাস করছে চা বাগানগুলি। বকেয়া টাকা না মেটানোয় মেয়ের রেজাল্ট পাচ্ছিলেন না করলা ভ্যালি চা বাগিচার শ্রমিক আশুতোষ মালো। তাঁর মেয়ে চন্দনা মালো স্থানীয় স্কুলে কেজি-তে পড়ে। বাবার সঙ্গে মেয়ে স্কুলে রেজাল্ট নিতে গেলে বকেয়া ১৪৬০ টাকা জমা দিতে না পারার জন্য স্কুল থেকে রেজাল্ট দিতে অস্বীকার করা হয়। রেজাল্ট না পেয়ে বাড়ি ফিরে এসে টাকার সমস্যার বিষয়টি চা-বাগানের তৎকালীন ম্যানেজার পারভেজ ত্রিপাঠীকে জানালে ম্যানেজার তখনই দু'হাজার টাকার নোট দিয়ে আশুতোষকে দিয়ে মেয়ের রেজাল্ট আনতে বলেন। ম্যানেজারের এমন উদ্যোগে হতবাক হয়ে যান আশুতোষ।পারভেজ ত্রিপাঠীকে যখন প্রশ্ন করেছিলাম একদিকে যেখানে চা শ্রমিকদের সঙ্গে ম্যানেজারদের নিত্য ঝামেলা, ঠিক সেই সময়ে ম্যানেজারই শ্রমিকদের ত্রাতার ভুমিকায়। সম্পর্কের রসায়নটা কী? ত্রিপাঠীজি নির্বিকার উত্তর দিয়েছিলেন, এটা এমন কিছু বড় ব্যাপার নয়। শ্রমিকরা ঠিকমতো মজুরি না পাওয়াতে টাকার একটা সমস্যা আছে ঠিকই। পাশাপাশি মানবিকতা বলেও একটা শব্দ তো অভিধানে আছে। সকালে যখন আমার বাগানের কর্মচারী এসে ওই কথাটি বলল তখনই আমার চোখের সামনে আমার সন্তানের মুখ ভেসে উঠল। এখনও তো শ্রমিকরা ২২ দিনের মজুরি পায়। কাজেই এই ঘটনার মধ্যে মহানুভবতার কিছুই নেই। সম্পর্কের এই রসায়ন নিয়েই চলছে শ্রমিক মালিক যৌথ উদ্যোগ। আশা জাগে মনে, এভাবেই তো বেঁচে থাকবে ডুয়ার্সের চা!

ম্যানেজার সাহেবের সৌজন্যে বাগানটি ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের শহর লাগোয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বাগান। **আয়তন ৩৩১.৮৪ হেক্টর**, চাষযোগ্য আবাদী ক্ষেত্রও সমপরিমাণ। আপরুটেড এবং নতুন বপনযোগ্য আবাদীক্ষেত্র ১০১.০৪ হেক্টর।ড্রেন এবং সেচের সুবিধাযুক্ত অঞ্চল ২২৪.৩ হেক্টর। **মোট চাষযোগ্য উৎপাদনক্ষম আবাদীক্ষেত্র ২২৪.০৩ হেক্টর**। বাগানে **শ্রমিক পরিবারের সংখ্যা ৫২০**। মোট জনসংখ্যা ২৫৩১। স্থায়ী শ্রমিক ৫৫২ জন। এরা দৈনিক নির্দিষ্ট পরিমাণ পাতা তোলার বিনিময়ে নির্দিষ্ট মজুরি পান। **মোট কর্মরত শ্রমিক ৬৬৫ জন**। করলা ভ্যালি চা-বাগিচার নিজস্ব উৎপাদিত চা ২০-২৫ লক্ষ কেজি এবং ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত মোট বিক্রয়যোগ্য চা ৪.৫ - ৫.৫ লাখ কেজি। **বহিরাগত বাগান থেকে সংগৃহীত এবং কেনা কাঁচা চা-পাতায় প্রস্তুত বিক্রয়যোগ্য চায়ের পরিমাণ ২ লাখ কেজি। ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত মোট বিক্রয়যোগ্য চায়ের পরিমাণ ৬.৫-৭.৫ লাখ কেজি।**

উৎপাদিত চায়ের প্রকৃতি অনুযায়ী এই বাগানে উন্নত কোয়ালিটির চা উৎপাদিত হয়। উৎপাদিত চা সিটিসি প্রকৃতির। করলা ভ্যালি বাগানটি চরিত্রগত দিক থেকে ইনঅরগ্যানিক। করলা ভ্যালি চা বাগান মেচপাড়া এবং জুরান্তি চা-বাগান মতই দার্জিলিং-ডুয়ার্স প্ল্যান্টেশন লিমিটেডের অন্তর্গত যারা অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে দীর্ঘদিন যাবৎ চা শিল্পের সঙ্গে জড়িত। করলা ভ্যালি টি এস্টেটে বিগত অর্থবর্ষে ৪০ লক্ষ টাকা প্রভিডেন্ড ফান্ড খাতে জমা পড়েছে। বকেয়া প্রভিডেন্ড ফান্ডের মোট অর্থ বাকি নেই। অর্থাৎ বোঝা গেল, প্রডাকশনের দিক থেকে বাগানের অবস্থা মন্দ নয়!

এ ভাবেই শৈশব কাটছে করলা ভ্যালি চা-বাগানের শিশুদের

করলা ভ্যালি চা বাগিচায় হাসপাতালের সংখ্যা একটিই। ডিসপেনসারির সহ যেন একটাই হলঘর। আলাদাভাবে পুরুষ বা মহিলা আইসোলেশন ওয়ার্ডের ব্যবস্থা নেই,মেটারনিটি ওয়ার্ড নেই, অপারেশন থিয়েটারও নেই। তবে ডাক্তার আছেন, অ্যাম্বুলেন্স আছে, কিছু না পারুন বাইরে চিকিৎসা জরুরি মনে করলে অন্তত সঠিক রেফার করে দিতে পারেন। বছরে গড়ে তিন হাজার অসুস্থ শ্রমিককে রেফার করা হয় বলে তথ্য মিলল। বাগানে ক্যান্টিন আছে। মোবাইল ক্রেশের সংখ্যা একটি। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। বাগিচা সংলগ্ন ইংরাজি মিডিয়াম উচ্চ বিদ্যালয় হোলি চাইল্ড এবং বাংলা মাধ্যমের স্কুল মোহিতনগর। বাগানে বিনোদনমূলক ক্লাব আছে, খেলার মাঠও আছে।

বাগানে প্রথম খবরটা পেয়েই মন ভালো হয়ে গেল। কেবল পাতা তোলা বা ঝাড়াই-বাছাই নয়, এবার থেকে বাগানের রেশন ব্যবস্থাও চালাবেন মহিলা চা-শ্রমিকদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী। শুধুমাত্র রাজ্যে নয়, সারা দেশের চা বলয়েই এই ধরনের উদ্যোগ প্রথম। উত্তরবঙ্গের ৩০০টি বাগানেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে চালু হচ্ছে খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্প। ভাবলাম 'যে রাঁধে, সে চুলও বাঁধে' এই প্রবাদবাক্য তাহলে সত্যি হতে চলেছে। এতদিন চা বাগিচার গণবন্টন ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্বে থাকতেন বাগানের ম্যানেজাররা। কিন্তু হঠাৎ করে বাগান বন্ধ হয়ে গেলে বা অচলাবস্থা তৈরি হলে ভেঙে পড়ত চা বাগিচার গণবন্টন ব্যবস্থা। একদিকে বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মজুরি মিলতো না, আবার সরকারি রেশনও কম দামে পেতেন না চা-শ্রমিকেরা। তার জেরে চরম দুর্দশয়া পড়তে হত চা-শ্রমিক ও তাদের পরিবারের লোকজনকে। এই সমস্যার কথা মাথায় রেখেই বাগানে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি করে রেশন ব্যবস্থা পরিচালনার পরিকল্পনা নেয় রাজ্য সরকার। প্রতিটি বাগানের জমিতেই সরকারি টাকায় তৈরি করা হচ্ছে রেশন দোকান এবং রেশন মজুত রাখার গুদাম। করলা ভ্যালি চা-বাগান দিয়েই এর সূচনা পর্ব হল বলা। থ্রি চিয়ার্স ফর করলা ভ্যালি।

বাগান থেকে ফিরে আসার পথে জলপাইগুড়ি অসম মোড় সংলগ্ন এলাকায় করলা নদীর পাশে করলা ভ্যালি চা-বাগানের গায়েই লোটাদেবী মায়ের মন্দির এবং মন্দিরের সামনেই রয়েছে একটি পুকুর। এই পুকুর ঘিরেই রয়েছে লোটাদেবী মন্দিরের প্রায় শতবর্ষ পুরনো বিভিন্ন রহস্য। মন্দিরের ভক্ত এবং স্থানীয় মানুষদের বিশ্বাস, লোটাদেবী মায়ের কাছে কেউ কিছু মানত করে রাতে কিছু চাইলে পরের দিন সকালেই তা পুকুরের জলে ভেসে থাকত। একই সঙ্গে ভেসে থাকত একটি করে লোটা। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে জানা গেল এমন ঘটনা নাকি অনেকবারই ঘটেছে। সেই থেকে এই মন্দিরের নাম হয়েছে লোটাদেবী মন্দির। মন্দিরে এসে সুতো দিয়ে দুটো পাথরের ঢিল বেঁধে দেওয়ার রেওয়াজ রয়েছে এখানে, এতে নাকি পুণ্য মেলে। কমিটি গড়ে ৬০ বছর ধরে বিশাল পুজোর আয়োজন করা হচ্ছে, মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষে লোটাদেবী কালী পুজোকে ঘিরে জমজমাট চেহারা নেয় জলপাইগুড়ির অসম মোড় এলাকা। লোটাদেবীর পুজো উপলক্ষে করলা নদীর ধারে বসে বিরাট মেলা। পুজো দেখার জন্য ভিড় করেন হাজারো মানুষ। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের ভক্তরাও চলে আসেন মায়ের মন্দিরে। পুজো উপলক্ষে চন্দননগরের আলোকমালায় সাজিয়ে তোলা হয় মন্দির চত্বর। এই পুজো ঘিরে প্রতিবছরই লক্ষাধিক মানুষের জনসমাগম হয়।

ফেরার পথে আর এক একবার প্যান করলাম মন-ক্যামেরা। চওড়া ক্যানভাস জুড়ে এক সত্যিকারের ইকো পর্যটনের পোস্টার!

PACKAGE TOUR 2018

Silk Route Tour
(Siliguri to Siliguri)

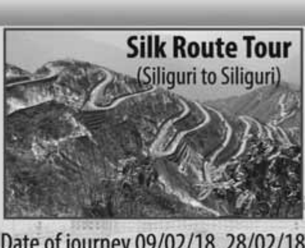

Date of journey 09/02/18, 28/02/18, 30/03/18, 13/04/18, 28/04/18, 04/05/18
2 Nights 3 Days
Rs 5200/- per head

Andamans Package Tour
(Port Blair to Port blair)

Date of journey 19/05/2018
7 Nights 8 Days
Rs. 18950/- (per head)

Kerala with Kanyakumari
(NJP to NJP)

Date of journey 17/10/ 2018
14 Nights 15 Days
Rs.23600/-(per head adults)

HOLIDAYAAR
Siliguri Office: Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri 734001 Ph: 0353-2527028, +91 9002772928
Jalpaiguri Off: Addaghar, Mukta Bhaban, Merchant Rd. Jalpaiguri 735101 Ph: 03561-222117, 9434442866
Cooch-Behar Office: Ph: +91 9434042969

EKHON DUARS, Vol-5, Issue-1 WBBEN/2014/56733, Rs. 20 Only

ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস

চিত্রকথা 'ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস'। পর্ব-২০। এই চিত্রকথা কোনওভাবেই ছোটদের জন্য নয়। আর কাহিনির সঙ্গে বাস্তবের মিল খুঁজতে যাওয়া অনভিপ্রেত।

কাহিনি : বৈকুণ্ঠ মল্লিক, ছবি : দেবরাজ কর

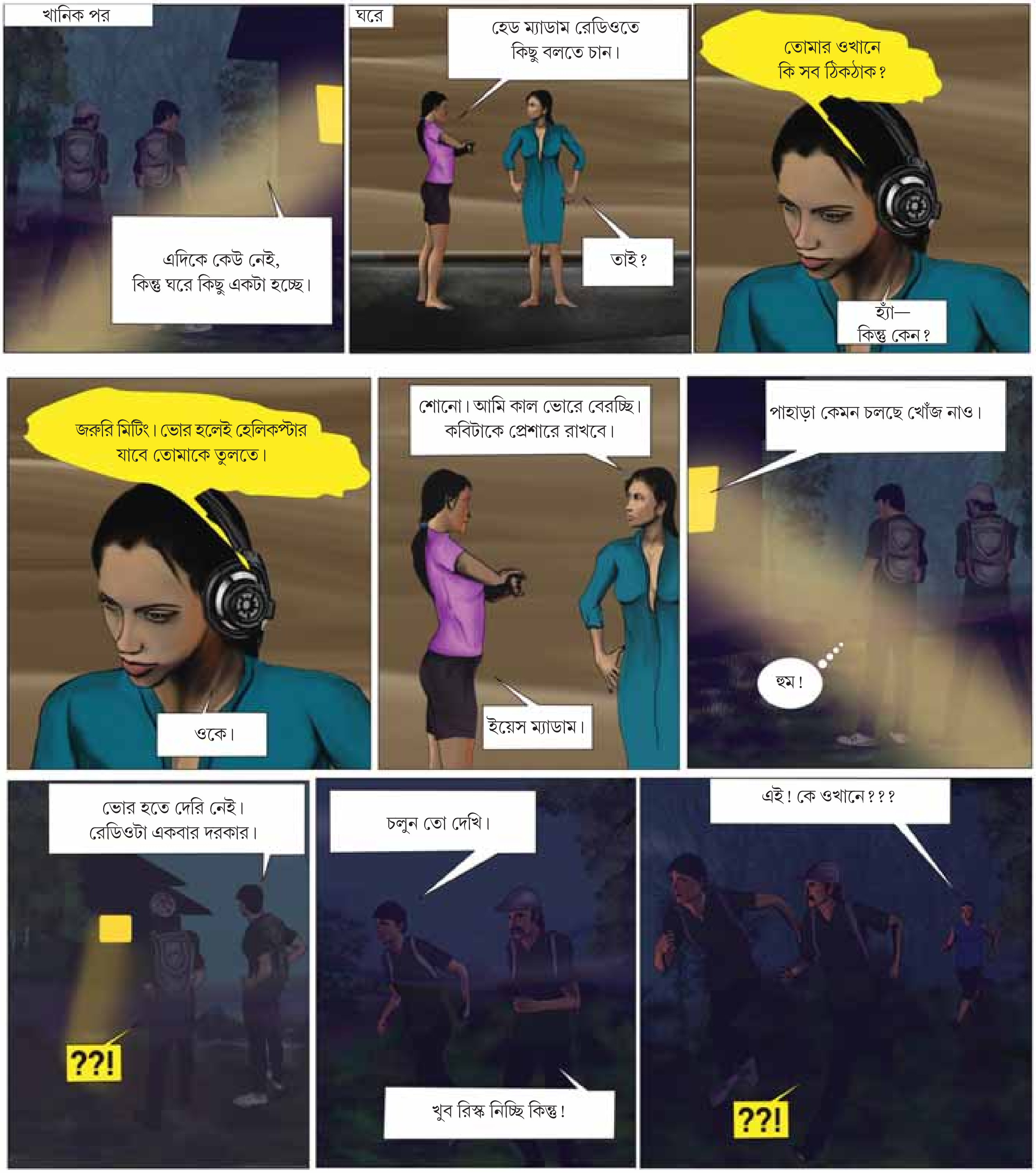

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.